REGISTERED NO. C. 262.

ভক্তি

ধৰ্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

(১৬শ বর্ষ)

(১৩২৪ ভাদ্র হইতে ১৩২৫ শ্রাবণ পর্য্যন্ত।)

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

সম্পাদক

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি।

ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ আঃ—আন্দুল-মৌড়ী, জেলা—হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন" হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভক্তির নিয়মাবলী।

১। ভক্তি, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। প্রতি বাংলা মাসের প্রথমে যথা নিয়মে প্রকাশ হয়। প্রত্যেক ভাদ্র মাস হইতে ভক্তির বর্ষ আরম্ভ হয় এবং শ্রাবণ মাসে শেষ হয়। বর্ষের যে কোন সময়েই কেহ গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে ভাদ্র হইতেই পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। ভক্তির বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ সর্ব্বত্র ১॥৹ দেড় টাকা, প্রতি খণ্ড ৵৹ তিন আনা। ভিঃ পিতে ১॥৵৹ একটাকা নয় আনা মাত্র।

৩। ভক্তিতে রাজনৈতিক কোনও প্রবন্ধ প্রকাশ হয় না। ভক্তির উপযোগী ধর্ম্ম-ভাবমূলক প্রবন্ধ, সম্পাদক ও পরিদর্শক পণ্ডিতগণের আদেশানুসারে প্রয়োজন হইলে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কেহ অনুরোধ করিবেন না। ক্রমশঃ প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধের সমগ্র পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইলে তবে প্রকাশ আরম্ভ হয়।

৪। প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়ম নাই, প্রবন্ধ লেখকগণ নকল রাখিয়া দিবেন।

৫। কোনও বিষয়ের উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট পাঠাইতে হয়। পুরাতন গ্রাহকগণের প্রত্যেক পত্রেই গ্রাহক নম্বর থাকা উচিত। নম্বর বিহীন পত্রের কোন কার্য্যই হয় না।

৬। ভক্তিতে বিজ্ঞাপন দিবার সাধারণ নিয়ম—মাসে প্রতি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১৷৹ আনা। এতৎভিন্ন অন্যান্য বন্দোবস্ত পত্র লিখিয়া বা সাক্ষাৎ করিয়া করিতে হয়। বেশী দিন স্থায়ী অথবা বিজ্ঞাপনের পরিমাণ বেশী হইলে কিম্বা কভারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

৭। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময় আমাদিগকে না জানাইলে পত্রিকা না পাইবার জন্য আমরা দায়ী নহে। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে তাহার পর মাস পাওয়া মাত্র জানাইলে বিনামূল্যে দেওয়া হয়, নতুবা পৃথক মূল্য (প্রতি খণ্ড তিন আনা) দিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

৮। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, প্রবন্ধ এবং বিনিময় ও সমালোচনার্থ পুস্তক পত্রিকাদি সমস্তই নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

ঠিকানা—

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি।

ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া।

হাওড়া,—সালিখা, দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীসুবোধ চন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

"ভক্তি।"

(১৬শ বর্ষের সূচীপত্র, ১৩২৪ ভাদ্র হইতে ১৩২৫ শ্রাবণ পর্য্যন্ত)

"ভক্তি"

(১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র মাস, ১৩২৪।)

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভুক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী।

—:০:—

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি, ঘন অন্ধকার,
সূচীভেদ্য অন্ধকার দৃষ্টি নাহি ধায়,
ঘন ঘোর ধূমযোনি, বিদ্যুৎ আধার
কালমেঘে বজ্রনাদ ব্রহ্মাণ্ড ফাটায়।
প্রকৃতির এই লীলা বিকট ভীষণ
আবির্ভূত যুগপৎ বাহিরে অন্তরে,
এই মেঘ ঝঞ্চাবাত বজ্রাগ্নি দীপন
ফুটিয়াছে তমোজাল দিগ্‌দিগন্তরে;
প্রলয় আঁধার মগ্ন আসুরী নিশায়
ধরণীর প্রেমবক্ষে অসুর গর্জ্জন—
সহিতে না পারি হরি, গলি করুণায়
আবির্ভূত আজি, দেবদেব জনার্দ্দন।
কোটী সূর্য্য কান্তি যবে পাইল প্রকাশ
অবিদ্যা আঁধার নাশ বিশ্বের বিকাশ!

শ্রীযোগীন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী।

প্রার্থনা।

—:০:—

(আমি) চাহিনা প্রতিষ্ঠা চাহিনা সম্মান চাহিনা রাজার সাজ।
চাহিগো সতত শ্রীচরণ ছায়া শান্তি যা' এমরু মাঝ॥
(আমি) চাহিনাহে তর্কে বুঝিতে তোমায় অথবা বিজ্ঞান বলে।
(শুধু) অহৈতুকী-ভক্তি দাও দীননাথ। প্রাণে যাহে শ [illegible] [illegible]॥
প্রাণের আবেগ গোমুখীস [illegible] [illegible]রে।
মিশে [illegible] [illegible] কৃপা-পারাবারে পাপ-পঙ্ক ধৌত ক'রে॥
(আমি) সংসার মাঝারে কর্ম্মনাশা নদী নাহি শান্তি জল বিন্দু।
(শুধু) আশ্রিত, দুর্দ্দম কাম-কুম্ভীরাদি অনন্ত কলুষ-সিন্ধু॥
নদ-নদী গাহে যিছু গুণ সদা শ্রান্তি হ'য়ে শান্তি জলে॥
এনদীর গান পরার্থ লুণ্ঠন সদা যাহে হৃদি জ্বলে।
কাল সনে নদী ধায় নিরবধি অনন্ত সাগর পানে।
মরুভূমি প্রায় শেষ রাখি যায় তোমার করুণা বিনে॥
জলের স্বভাব জ্বালা নিবারণ এজল জ্বালায় শুধু।
ব্যবহারে ইহা বাড়েগো পিপাসা অপেয় সদা বিস্বাদু॥
নির্ম্মলী ফলের সহযোগে হেরি ত্যজে জল মল যত।
ও নাম-নির্ম্মাল্যে এ "কর্ম্মনাশার" শুদ্ধ কর সেই মত॥

দীন—শ্রী :—

মন্তব্য।

গত শ্রাবণ মাসের বিজ্ঞাপনে সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, ভাদ্র মাসের পত্রিকা গ্রাহকগণের নিকট ভিঃ পি করা হইবে। সেই ভিঃপির টাকা আমাদিগের নিকট পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হয় আর সকলের টাকা না পাইলে পত্রিকা পাঠাইবারও বিশেষ অসুবিধা হয়, তারপর ৺দুর্গা পূজার ছুটীতে অনেকেই নানাস্থানে গমনাগমন করেন, কাজেই ছুটীর মধ্যে পত্রিকা গেলে তাঁহাদের অনেকেরই হস্তগত হয় না। এই সকল কারণে আমরা আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুই মাসের পত্রিকা একত্রে ৺দুর্গা পূজার পর গ্রাহকগণকে পাঠাইব। যথাসময় আশ্বিনের পত্রিকা না পাইয়া কেহ চিন্তিত হইবেন না।

(ভক্তি কার্য্যাধ্যক্ষ।)

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভঙ্গী।

—:০:—

"যারে উদ্ধারিবে প্রভু আছে তাঁর মনে।"

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরভগবান কোন্ সময় যে কাহাকে কোন্ সূত্র ধরিয়া উদ্ধার করিবেন —কোন্ সময় যে কাহাকে স্বীয় কৃপামৃত দানে অমরত্ব লাভের অধিকারী করিয়া লইবেন,—অশান্তির উৎপাদক অনিত্য সংসারের আবর্জ্জনা রাশি দূরে সরাইয়া রাখিয়া চিরশান্তি প্রদান করিবেন, এবং কোন্ সময় যে কাহাকে কাম রাজ্য হইতে প্রেম রাজ্যে,—নিরানন্দ হইতে পূর্ণানন্দে টানিয়া লইবেন, তাহা তিনিই জানেন। মোট কথা এই বিপুল বিশ্বের কেহই তাঁহার কৃপাদৃষ্টির অন্তরালে নহে। একদিন না একদিন জীব-জগতের সকলেই তাঁহার কৃপাকর্ষণে সুখ-দুঃখময় এই সংসার কারাগার হইতে চিরমুক্তি লাভ করিবে। অবিদ্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন মোহ কুটীর হইতে পরাবিদ্যার আলোক পূর্ণ আনন্দধাম নদীয়ায় আসিতে পারিবে। একদিন না একদিন সকলেই তাঁহার দাসত্ব লাভে কৃতার্থ হইয়া জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়ার পথ বন্ধ করিতে পারিবে।

তুমি পতিত হও, পাষণ্ড হও,—অথবা নাস্তিক নরাধম যেই হও,—অবশ্য একদিন না একদিন প্রভু তোমাকে আপন সন্তান জ্ঞানে ধুলা মাটী ঝাড়িয়া লইয়া কোলে করিবেন। তুমিও তাঁহার সুরাসুর-সেব্য শ্রীপাদপদ্মের মত্ত-মধুকর হইয়া দিবানিশি গুণ্ গুণ্ স্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিবে। প্রভুই তোমার জীবনের গতি তাঁহার দিকে ফিরাইয়া লইবেন।

এই গৌরাবতারের করুণা-কিরণ প্রাণী মাত্রেরই প্রাণের পরতে পরতে প্রবেশ করিবে। সকলেই দিব্যালোকে আলোকিত প্রাণ লইয়া আনন্দ-কীর্ত্তন করিবে। কেহই আর কোনরূপ অন্ধকারে থাকিবে না।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর শ্রীগৌরচন্দ্র একদিন না একদিন সকলকেই তাঁহার প্রেম-মন্দাকিনীর পবিত্র জলে ধুইয়া লইবেন। দয়ানিধি বিধি ভাব্য ভগবান

কোন একটী প্রাণীকেও ভুলিয়া থাকিবেন না। তাঁহার বড় দয়া! বড় স্নেহ !! বড় ভক্ত-বৎসলতা !!!

বল্লভভট্ট প্রভুর নিজ জন হইলেও অবিদ্যাজনিত বিদ্যা-গৌরবের প্রতি বদ্ধতায় তিনি আর একবার গৌরগত প্রাণ শুদ্ধ ভক্ত হইতে পারিতেছেন না, কিম্বা গৌর সর্ব্বস্ব হইয়া গৌর-রসাস্বাদ করিতে পারিতেছেন না। প্রভু অন্তর্য্যামী ;—বল্লভ যে বিদ্যা বুদ্ধির অভিমানে এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা তাঁহার (প্রভুর) কোমল প্রাণে সহিল না। ' প্রভু অভিমানাক্রান্ত ভ্রান্ত বল্লভের দিকে কঠাক্ষপাত করিলেন।

যখন বর্ষান্তরে গৌড় দেশীয় ভক্তগণ নীলাচলে, গৌর কল্পবৃক্ষের পাদমূলে সমবেত, ঠিক্ সেই সময় বল্লভ তাঁহার অজ্ঞাত কোন কৃপা শক্তির আকর্ষণে, নীলাচলে পতিত পাবন প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"হেন কালে বল্লভভট্ট মিলিলা আসিয়া।"

বল্লভ আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভুও ভাগবত বুদ্ধে বল্লভকে আলিঙ্গন দানে ধন্য করিলেন। এবং অতিশয় আদরের সহিত তাঁহাকে আপনার এক পার্শ্বে বসিতে দিলেন।

প্রভু বল্লভভট্টের উপর ভাগবত বুদ্ধি করিলেন কেন? একথায় বোধ হয়, পাঠকের অন্তঃকরণে আলোড়ন উপস্থিত হইতে পারে। বাস্তবিক বল্লভ ভক্তি রসের পাত্র। কেবল মাত্র বিদ্যাভিমানে গর্ব্বিত হইয়া একটুকু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। দয়ার ঠাকুর দয়া করিয়া বল্লভের এই অজ্ঞানতাটুকু সারিয়া লইবার জন্যই, আজ তাঁহার এইরূপ কৃপা ভঙ্গী।

বল্লভের অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে আজ গৌর শশী উদিত হইয়া যে কৃপা-কিরণ বিস্তার করিবেন,—আঁধার তাড়াইয়া আলোকে আনিবেন—বল্লভ এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

বল্লভভট্ট অতিশয় দৈন্য বিনয় সহকারে প্রভুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কথাগুলি নিরেট সত্য হইলেও ভট্ট যেন এই স্তুতি বাক্য গুলি ঠিক প্রাণের সহিত বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

বল্লভভট্ট মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "বহুদিন হইতে আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল, অদ্য জগন্নাথ আমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। যে ভাগ্যবান ব্যক্তি

আপনার দর্শন প্রাপ্ত হয়, সে ধন্য! আমি আপনাকে সাক্ষাৎ ভগবানের ন্যায় দেখিতেছি। যে আপনাকে স্মরণ করে, সেই যখন পবিত্র হয়, তখন আপনার শুভ দর্শন লাভে যে পবিত্র হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?"

"বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিল তোমারে॥
তোমার দর্শন যেই পায় সেই পুণ্যবান।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান॥
তোমাকে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হয়, ইতে কি বিচিত্র? (শ্রীচরিতামৃত।)

কেবল মাত্র এই পর্য্যন্ত বলিয়াই যে বক্তা বিরত হইলেন, এমন নহে। তিনি আরও বলিলেন,—

"কলির যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন।

কৃষ্ণ শক্তি ব্যতীত এই নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইতে পারেনা। আপনি তাহা প্রবর্ত্তন করিয়া, আপনি যে কৃষ্ণ-শক্তিধর, ইহা পরিস্কার রূপে তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রভো! আপনি জগতে কৃষ্ণ প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন;— আপনাকে যে দর্শন করে সে-ই কৃষ্ণ প্রেমে ভাসিয়া যায়। কৃষ্ণ শক্তি ভিন্ন প্রেম প্রকাশিত হইতে পারেনা। জগতে একমাত্র কৃষ্ণই প্রেম দাতা।"

"কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইতো প্রমাণ।
কৃষ্ণ-শক্তিধর তুমি ইতে নাহি আন॥
জগতে করিলে তুমি কৃষ্ণ প্রেম পরকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে॥
প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণ শক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেম দাতা শাস্ত্রের প্রমাণে॥" (চরিতামৃত।)

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র প্রেম দাতা, বল্লভভট্ট তাঁহার এই বাক্যের পোষকতায় লঘু ভাগবতামৃতের একটী শ্লোক বলিলেন যথা,—

"সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥"

পঙ্কজনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাংশে মঙ্গল দায়ক অনেক অবতার থাকিলেও ভক্ত দিগকে তিনি ভিন্ন আর কে প্রেম দান করিতে পারেন?

সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু বল্লভের মুখে এই প্রকার প্রশংসা বোদ শ্রবণে বুঝিতে পারিলেন যে, বল্লভ এখনও অভিমানের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই, এখনও আত্মগৌরব ব্যাধির ভোগ হইতে মনকে নিরাময় করিয়া লইতে পারে নাই।

প্রভু এই সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বল্লভের গর্ব্ব খর্ব্ব করণানন্তর তাঁহাকে খাঁটি ভক্ত করিয়া লইবার মানসে ভঙ্গী করিয়া কিছু কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "বল্লভ! তুমি না বুঝিয়া আমাকে এত কথা বলিতেছ কেন? আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, প্রেম-ভক্তি লাভের আমার কি অধিকার? শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাঁহারই সঙ্গগুণে আমার মন কথঞ্চিত নির্ম্মল হইয়াছে। সমস্ত শাস্ত্রে এবং কৃষ্ণ ভক্তিতে তাঁহার তুল্য আর কেহই নাই বলিয়া নাম 'অদ্বৈত।' যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছেরও কৃষ্ণ ভক্তি জন্মে, তাঁহার বৈষ্ণবতা শক্তির কথা কে বলিতে পারে?"

"প্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি॥

অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাই সাক্ষাত ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল॥

সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ ভক্ত্যে নহে যাঁর সম।
অতএব অদ্বৈত আচার্য্য তাঁর নাম॥

যাঁহার কৃপায় ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণ ভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা শক্তি॥" (চরিতামৃত)

এইরূপে প্রভু অদ্বৈত গুণ কীর্ত্তন করিয়াই নিরস্ত হইলেন না,—ক্রমে নিত্যানন্দ—সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, দামোদর, হরিদাস, আচার্য্যরত্ন, আচার্য্য নিধি, গদাধর পণ্ডিত, স্বরূপ, শঙ্কর, জগদানন্দ, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব,

মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদবর্গের ভক্তি ও ভজনপ্রতিভা শত মুখে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

প্রভু অকিঞ্চন ভক্ত জনোচিত দৈন্য বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—' অবধূত নিত্যানন্দও সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্র। ষড়দর্শন-বেত্তা জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপানুগ্রহে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, "কৃষ্ণ ভক্তিযোগই সার।" কৃষ্ণরসের নিধান শ্রীল রামানন্দরায় আমাকে রাগমার্গের ভজন ও সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। ব্রজের রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব ও গোপী ভাবের মহিমা আমি তাঁহার নিকট হইতেই কিঞ্চিন্মাত্র শিক্ষা করিয়াছি।

এসব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধ ভাব অন্ত॥ (চরিতামৃত।)

প্রেম রসের মূর্ত্তিমানাবতার শ্রীল স্বরূপ দামোদর হইতে আমি ব্রজের মধুর রস জানিয়াছি। নাম সম্পত্তির মহা সম্রাট শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় শ্রীনাম মহিমা অবগত হইয়াছি।

"নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাই শিখিল।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥" (চরিতামৃত।)

আরো বহু কৃষ্ণ ভক্ত আমাকে কৃপা করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপা গুণেই আমার যাহা কিছু কৃষ্ণ ভক্তি।"

চতুর শিরোমণি প্রভু ভট্টের অভিমান চূর্ণ করিবার অভিলাষে ভঙ্গী করিয়া নিজে একেবার অজ্ঞ সাজিয়া কেবল ভক্ত গুণই গান করিলেন।

"ভট্টের অন্তরে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী॥" (চরিতামৃত।)

ভট্টের মনে অভিমান ছিল, "আমি একজন বৈষ্ণব, ভক্তি সিদ্ধান্ত সকলই আমার জানা আছে। ভাগবতের অর্থ আমিই উত্তম ব্যাখ্যা করি" ইত্যাদি।

"আমি সে বৈষ্ণব ভক্তি সিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি॥" (চরিতামৃত।)

ভট্টের মনে এইরূপ অভিমান ছিল বটে,— কিন্তু প্রভুর বাক্য শ্রবণে তাহা কোথায় চূর্ণ হইয়া গেল।

"ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি হইল সে খর্ব্ব॥" চরিতামৃত।)

প্রভুর মুখে বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবতা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ভট্টের মনে কৌতুহল জন্মিল। ভট্ট কহিল,—"প্রভো! এই সকল বৈষ্ণব মহাত্মারা কোথায় আছেন! আমি কেমন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিব।

"ভট্ট কহে এ সব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে?
কোন প্রকারে পাইব ইঁহা সবার দর্শনে? (চরিতামৃত।)

প্রভু কহিলেন, কেহ এখানে ও কেহ গঙ্গাতীরে আছেন। অর্থাৎ কেহ গঙ্গাতীরবাসী আর কেহ এখানকারই অধিবাসী। কিন্তু, রথ যাত্রা দেখিবার জন্য সকলেই এখানে সমবেত হইয়াছেন। সকলকেই তুমি এখানে দেখিতে পাইবে।

ক্রমশঃ—

"একা।"

—:০:—

একদা দিবসের নিয়মিত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সমাধান করিয়া প্রবাস কুটীরে একা বসিয়া আছি। দেহ কর্ম্মক্লান্ত—মনও অতি উদাস। নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট হইতেছে না। দুই একখানি মাসিক পত্রিকা লইয়া নাড়া চাড়া করিলাম। কিন্তু কিছুতেই অস্থির চিত্ত সুস্থির হইল না। অবশেষে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া গঙ্গার ধারে ছুটিলাম। ভাবিলাম—শ্রান্তিহরা জাহ্নবী তীরে বন্ধুবান্ধব অথবা সজ্জন-সহবাসে আজিকার উদাসীনতা অপগত হইবে। কিন্তু একি দেখি? ভাগীরথীর সেই সুপ্রশস্ত অবতরণিকায় আজ কেহই নাই।—যেন নীরব নিস্তব্ধভাবে তটতীর্থ কোন্ গভীর সাধনায় সমাধিস্থ। কেবল তটপ্রান্তে—জাহ্নবী জীবন-রেখায় এক দ্বিজ অনন্যমনে ভগবানের আরাধনায় একা বসিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণবরের সন্ধ্যোপাসনা সাঙ্গ হইল;—তিনিও ধীর পদ বিক্ষেপে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তখন

দেখিলাম, সুরধুনীর সেই বিশাল তটে আমি একা। বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল মন আরও অস্থির হইয়া উঠিল। পুনঃ পুনঃ ভাবিতেছি—আমি কি একা? এমন সময়ে গঙ্গার প্রবাহে চাহিয়া দেখি—একগাছি তৃণ তব্ তব্ করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া আছি—একখানি ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া একটা লোক চলিয়া গেল—তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিতে নাচিতে অনেক দূরে চলিয়া গেল।—আর দেখা গেল না। দেখা গেল—দূরে পরপারে দ্বাদশ মন্দিরের পুরোভাগে একটী ক্ষীণ আলোক-রশ্মি, যেন সে রশ্মি আপনার পবিত্র উজ্জ্বলতা দিগ্‌দিগন্তে বিকীরিত করিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখি—অনন্ত নীল আকাশে একটী তারা সুবর্ণ দেউটীর ন্যায় একাই বিশাল বিশ্বরাজ্যে আপনার ক্ষীণ জ্যোতিঃ ছড়াইতেছে! যুগপৎ ঊর্দ্ধে ও নিম্নে যাহা কিছু দৃষ্টিপথে পতিত হইল—সকলেই একা! একাই সকলে আপন আপন কর্ত্তব্য পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। একা বলিয়া কাহারও দুঃখ নাই, ক্লেশ নাই, চিন্তা নাই, কর্ম্মে বিরতি নাই, উদাসীনতা নাই, অবসাদ নাই—অকাতরভাবে নীরবে সকলেই আপন আপন জীবন স্রোতে নিরন্তর ভাসিয়া চলিয়াছে। তবে আজি আমি একা বলিয়া এত দুঃখ করি কেন? এত উদাসীনতা কেন? জগতে ত সকলেই একা। যে দিন এই মাটীর দেহ লইয়া এ মরধামে প্রথম পদার্পণ করি, সে দিন ত একাই আসিয়াছি। আবার যে দিন ইহ জীবনের মত এই নশ্বর জগৎ ছাড়িয়া যাইব—কিংবা যে দিন এই মাটীর দেহ মাটীতেই মিশিয়া যাইবে—সে দিনও একাই যাইব। যদিও সেই প্রথম দিনে, সেই পবিত্র সুতিকাগারে—অনন্ত স্নেহময়ী জননীর একমাত্র নাড়ী-বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও সংসারের স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসার শত সহস্র লক্ষ কোটী বন্ধনে বিজড়িত হইয়াছি; তথাপি আমি একা। শুধু আমি কি একা—সকলেই একা। যিনি এই অখিল বিশ্বরাজ্যের নায়ক, যাঁহার একমাত্র ইঙ্গিতে সৃজন, পালন ও ধ্বংশের বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং যাঁহার আদেশে নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, সেই অনাদি অক্ষয়, অব্যয়, অবাঙ্‌মনসোগোচর সচ্চিদানন্দ পুরুষ, তিনিও একা। তাই ঋষিগণ "একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই সত্য জগতে গাহিয়াছেন। বাস্তবিক কি সকলেই একা? কিন্তু তা'ত নয়। একা ত কেহ কখন কিছু করিতে পারে না। এ কি দেখি? ইহাতে কি কোন গুরুতর

রহস্য নির্লিপ্ত রহিয়াছে? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আকুল মনে ভাগী-রথীর তরল প্রবাহে চাহিয়া আছি—দূরে এক জলজন্তু কিঞ্চিৎ জল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পুনরায় জলে ডুবিয়া গেল, দেখিলাম, উৎক্ষিপ্ত বিন্দু বিন্দু সলিল কণা সাগরগামী স্রোতে মিশিয়া এক হইয়া গেল তখন জাহ্নবীর কুলু কুলু লহরী যেন আমার কাণে কাণে বলিয়া দিল—জগতে কেহই একা নহে এক অপূর্ব্ব অদৃশ্য মধুর মিলনে সকলেই ওত প্রোত ভাবে সংমিশ্রিত।

ভাল, যদি বিশ্বরাজ্যের প্রতি বস্তুতে একত্ব বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে একতার বন্ধন কেন? ও বুঝিয়াছি, তাঁহারই—সেই মহান্ একমেবা দ্বিতীয়মের ইঙ্গিতে এই একতার বন্ধন—এই স্নেহ মমতার নিগড়। নতুবা বিশ্বরাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে। এই যে জাহ্নবীর প্রবল প্রবাহ ইহাও এক একটী বারি বিন্দুর সম্মিলনে উৎপন্ন। ভারত-সীমান্তে যে অভ্রভেদী বিশাল হিমাদ্রি তাহাও এক একটী ধূলি কণার সমবায়ে গঠিত। আমাদের এই নশ্বর ভৌতিক দেহও পঞ্চ ভূতের মিলনে সৃষ্ট। পুণ্যময়ী আর্য্যভূমি ভারতের বেদ মন্ত্রের প্রথম "ওঁ"কার শব্দটীও একতার সম্বন্ধ। সুতরাং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জগতের প্রতি কার্য্যই একতায় সম্পাদিত একতা ভিন্ন কিছুই সিদ্ধি হয় না। আবার এই একতার অভাবেই প্রলয় বা ধ্বংশ। হে প্রেমময় ভগবন্! যখন তোমার অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই একতার সাগরে মিশিয়া গিয়াছে, তখন আমি একা বলিয়া এত ক্ষুব্ধ হই কেন? বৃথা দুশ্চিন্তার সমুদ্র মন্থন করিয়া হলাহল তুলি কেন? আমিও কেন বিশ্বের একতার প্রবাহে মিশিয়া যাইনা! ওই জাহ্নবীর জ্যোৎস্নাধবল, শীতল প্রাবৃট প্রবাহের ন্যায় কুল কুল করিতে করিতে সেই একমেবা দ্বিতীয়ম্ প্রেমময় শান্তিময় প্রাণেশের অকূল প্রেমপারাবারের অনন্ত-সলিলে মিশিয়া যাইনা? উঃ কি দুরাকাঙ্ক্ষা?

ভগবন্! আমার এ উচ্চ আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হইবে? আমার আমিত্ব দর্প কি বিচূর্ণ হইবে? তোমাতে মিশিয়া কি এক হইতে পারিব? দাও, ইচ্ছাময়, আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে বল দাও—যেন এ দুরাকাঙ্ক্ষা সফল করিতে পারি? আমার জ্বালাময় বিষময় বিশাল সংসারের একপ্রান্তে একা ফেলিয়া যাইও না। দাও, তোমার ঐ জ্যোতির্ম্ময় বিবেকের আলো একবার এ অন্ধতম হৃদয়ে জ্বালিয়া দাও। যে আলো একবার সেই প্রথম জগৎ দর্শনের

দিনে, চপলার মত দেখাইয়াছিলে! এতদিন আমি ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক দর্শনে পথভ্রান্ত পথিকের মত ভ্রান্ত হইয়া সংসারারণ্যে একাই বিচরণ করিতেছি। একণে নয়নে আর সে ধাঁ ধাঁ নাই, কিন্তু চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। আর একটীবার তোমার শান্তির কিরণ মালা এ নিরাশ প্রাণে ঢালিয়া দাও। হে সত্য সুন্দর, মঙ্গল! তোমার ও সুন্দর রূপমাধুরী দেখিতে দেখিতে যেন তোমার শান্তিপ্রদ কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ি—তাহা হইলে তোমাতে মিশিয়া এক হইয়া যাইব, আর একা থাকিব না।

ওরে ভ্রান্ত মোহান্ধ মন। আর কতদিন এই সান্দ্রনৈশ তমসায় বিচরণ করিবি?—মমতা মোহের জালে জড়িত হইয়া রহিবি? ভবিষ্যৎ সুখান্বেষণের পথ তমসাচ্ছন্ন বলিয়া কি আপাতরম্য ক্ষণিক সুখে মাতোয়ারা হইবি! আর না, উর্দ্ধাকাশের ওই দীপ্ত তাড়িতালোকে মোহ মমতার বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেল, এবং একতার নিদান, একমাত্র নিরাপদ স্থল, শ্রীভগবানের অমল কমল চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর। আর ভক্ত প্রেমিকগণে জগতের প্রতি বস্তুতে যে মঙ্গলময় হস্তের বিচিত্র শিল্প-কলা দেখিতে দেখিতে আপনাহারা হইয়া বিশ্বপ্রেমের অনন্ত প্রবাহে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। এস, এই নীরব নিস্তব্ধ সন্ধ্যালোকে—পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পুণ্যময় বিশাল তটে বসিয়া নীরবে নিরালায় একবার মধুর মহিমা-মাখা—

"——প্রেম মুখ দেখরে তাঁহার।
শুভ্র সত্য স্বরূপ-সুন্দর, নাহিক উপমা তাঁর,
যায় শোক, যায় তাপ, যায়রে হৃদয় ভার;
সর্ব্ব সম্পদ তাহে, মিলে, যখন থাকি তাঁর সাথ।

দীন—শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দাস।

শ্রীগরুড় ও শ্রীভুষণ্ডি।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস পাঠক।)

—:০:—

গরুড় মহাশয় শ্রীভুষণ্ডিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। হে আর্য্য বলি পুষ্ট ! (বায়স) বিষয় তৃষ্ণা বিরহিত ভক্ত সাধুমুখ বিনির্গত বাক্য যথার্থই ভ্রমরূপ ভেকের পক্ষে কাল ভুজঙ্গিনী সদৃশ। সন্দেহ, মোহ ও ভ্রম প্রমাদাদিহরণ কারিণী ভবদীয় উপদেশ শ্রবণে আমি প্রভূত আনন্দ পাইয়াছি। এক্ষণে জ্ঞান ও ভক্তি এতদুভয়ের বিশেষ ভেদ কি তাহা দয়া করিয়া আমাকে বলুন।

গরুড়ের শ্রবণাগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া ভুষণ্ডি কহিলেন। হে গরুড় ! জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই যে ভবদুঃখ বিনাস করিতে সক্ষম তাহা পূর্ব্বে তোমার নিকট বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে এ সম্বন্ধে অন্য বিশেষ কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। তবে সর্ব্বদাই মনে রাখিও জ্ঞান পুরুষ আর ভক্তি স্ত্রী।

হে খগপতি ! ভগবৎ প্রসাদে যদি কাহারও হৃদয়ে সাত্বিকী শ্রদ্ধারূপা ধেনুর উদয় হয় এবং যদি সেই ভাগ্যবান পুরুষ বেদবিহিত জপ, তপ, যম, নিয়মাদিরূপ শ্যামলতৃণ সেই শ্রদ্ধাগাভিকে খাইতে দেয় তাহা হইলে অচিরেই ভাবরূপ বৎস্য লাভ হইয়া থাকে। তারপর বিষয় গন্ধ বিবর্জ্জিত আত্ম বসিভূত মনে দ্বারা ব্রহ্ম বিলাস রূপ সুপবিত্র পাত্রে ধর্ম্মরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া নিস্কামরূপ বহ্নিতে তাহা আবর্ত্তন করিয়া পরে সন্তোষ সমীরণে ঐ আবর্ত্তন করা গরম দুগ্ধকে শীতল করিয়া ধৃতিরূপ অম্লযোগে দধি প্রস্তুত করিয়া বহিরিন্দ্রিয় সংযমরূপ আধারে উক্তদধিকে স্থাপন পূর্ব্বক তত্ত্বমসি বিচাররূপ মন্থনদণ্ডে সুবচনরূপ রজ্জু দ্বারা মন্থন করিয়া বিরাগরূপ অতি নির্ম্মল সুপবিত্র এবং অতি মধুর নবনীত প্রস্তুত করে। তারপর প্রজ্জলিত যোগানলে সঞ্চিত কর্ম্মরূপ ইন্ধন সাহায্যে ঐ নবনীত হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া হৃদয়রূপ দীপাধারে সর্ব্বজীবে সমভাবরূপ প্রদীপ স্থাপন করিয়া উক্তঘৃতে তাহা পরিপূর্ণ করে। এবং জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুসুপ্তি এই অবস্থাত্রয়রূপ ত্রিগুণিত পলিতা দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়া

মদাদি পতঙ্গ সকলকে ভস্মিভূত করে। তারপর অহং ব্রহ্ম হই শুদ্ধ অখণ্ড বিজ্ঞানরূপ দীপালোকে সাধকের বাহ্যাভ্যন্তর যখন আলোকিত হয় তখন অবিদ্যা কল্পিত মোহাদি সহজেই প্রত্যক্ষিভূত হয় এবং সংসার বন্ধনের মূল যে ভেদজ্ঞান তাহা নষ্ট হইয়া সাধক আত্মানন্দ লাভে কৃতার্থ হয়।

কিন্তু এইভাবে সাধক যখন উক্তদীপালোকেদ্বারা দৃশ্যমান হৃদয় গ্রন্থি সমূহ ছিন্ন করিতে প্রস্তুত হয়েন তখন প্রদীপটী নির্ব্বাপনের জন্য মায়া নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। প্রথমতঃ সাধকের নিকট অষ্টসিদ্ধি দান করিয়া সাধককে প্রলুব্ধ করিতে চায়। কিন্তু সাধক যদি তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া স্বকার্য্য সাধনে বিরত হয়েন তবে সুরবৃন্দ নানাবিধ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে থাকেন।

হে খগেন্দ্র! দেববৃন্দ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, রূপরসাদি বিষয়ানিল যখন ইন্দ্রিয় দ্বাররূপ বাতায়ন পথে ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয় তখনই তাঁহারা দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেন, এই সময় প্রবল বাত্যার আঘাতে মুহূর্ত্ত মধ্যেই হৃদিস্থিত বিজ্ঞান প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায় ও পুনরপি জীব জন্মমৃত্যুর ভীষন ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। অশেষ গুণনিলয় পরম পুরুষ রমেশের মায়ার বর্ণনা করা অসম্ভব একমাত্র সাধক কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারেন মাত্র।

হে খগপতি! জ্ঞানপথ, সুতীক্ষ্ণ খুরধারোপম। পদস্খলনে মহাবিপদ অনিবার্য্য। যদি কোনও ভাগ্যবান সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারেন তবে তিনি আগম নিগম প্রশংসিত সাধুগণের চির বাঞ্ছিত এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও প্রার্থিত যে পরম কৈবল্য পদ তাহা লাভ করিতে পারেন। তাই বলি, হে গরুড! জ্ঞানের সাধন বড়ই কঠিন। কিন্তু হে বিনতানন্দন! রামের একান্ত ভক্ত যাঁহারা প্রাণান্তেও তাঁহারা মুক্তি প্রার্থনা করেন না, পরন্তু মুক্তি আপনি আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়।

স্থল ভিন্ন জলের অবস্থান যেমন অসম্ভব। অনন্ত জল রাশীর তল দেশেও যেমন স্থলের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে তদ্রূপ অপার অসীম ব্রহ্মানন্দের অভ্যন্তরস্থ চিদানন্দময়ী ভক্তির অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু উভয়ই সাধারণ লোক-লোচনের অদৃশ্য কেবল ভাববিভাবিত নয়নে প্রত্যক্ষিভূত।

অতএব সুচতুর জন মোক্ষকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তি লাভের জন্যই বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন কেননা ভক্তি-ধর্ম্ম-মর্ত্ত লোকের জীবগণকে অমরত্ব প্রদান

করে ইহাতে ঈর্ষা দ্বেষ ভয় বা অসন্তোষ কিছুই থাকেনা ইহাই জীবের স্বরূপ-সম্পত্তি লাভ। সুতরাং হে গরুড়! রমাপতির প্রতি ভক্তিমান নর অনায়াসে জন্মমৃত্যুর যন্ত্রনা হইতে নিষ্কৃতি পায়। জগতে এমন মূঢ় কে আছে যাহার নিকট এ সম্ভূত সুখদ অথচ সুগম মার্গ প্রীতিপ্রদ না হয়। অসীম অন্তরের চরণ প্রান্তে একান্ত আশ্রয় ভিন্ন অসীম শান্তজীবনের কৃতান্তভয় নিবারণের আর উপায়ান্তর কি? অতএব হে খগপতি! তুমি স্থির জানিবে যে, সেব্য সেবক ভাবই সর্বোত্তম এই সেব্য সেবক ভাবই অনন্ত সংসার ভোগ বিনাশ করিয়া শান্তকে অনন্তের চরণ প্রান্তে উপনীত করে। তাই বলি, যে রামপাদপদ্ম জড়কে চেতন করিতে পারে এবম্ভূত পাদপদ্ম-লোলুপ ভক্ত ভৃঙ্গই ধন্য।

হে গরুড়! এক্ষণে ভক্তির বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহাতে অত্যুষ্ণ তাপকারী জ্ঞান প্রদীপের মত জ্বালা যন্ত্রনা নাই। "ভক্তি চিন্তামণি" পরম ভাস্কর অথচ সুশীতল স্বতঃতই প্রকাশমান যাহার হৃদয়ে অবস্থান করে তাহার আর ঘৃত বাতির আবশ্যক হয় না। আর রূপরসাদি বিষয় সমীকরণ তাহাকে নির্বান করিতে পারে না অথচ ইহার তেজ পুঞ্জ প্রভাবে অবিদ্যাতম, আপনা হইতেই অন্তর্হিত হয়। কলুষরূপ উলুক চয় পলাইয়া যায় এবং বিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যা পরিকর কামাদি সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হে আশিবিষমর্দ্দন। এই ভক্তিমণি যাঁর হৃদয়ে প্রকাশ হয় তাহার নিকট বিষ অমৃত এবং শত্রু মিত্র হয়। তাই বলি এ মণি ভিন্ন প্রকৃত সুখ প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই মনোব্যাধি বিনাশ করিতে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধী। কিন্তু যদিও সকল জীব হৃদয়েই এই ভক্তি রহিয়াছে, তথাপি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীহরির কৃপা ভিন্ন ইহার উদয় বা অনুভব অসম্ভব। কেননা জীব হৃদয়ে মায়া আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। বেদাদি শাস্ত্ররূপ মহী গহ্বরে যেন মণি লুক্কায়িত।

সুতরাং যে সুচতুর সাধক সাধু গুরুর উপদেশানুসারে বৈরাগ্য রূপকনত্রের সাহায্যে দাস্যাদি যে কোনও ভাবের সহিত সুমতিরূপ অস্ত্র দ্বারা শাস্ত্ররূপ ধরণীকে খনন করিতে পারেন তিনিই সর্ব্বসুখ নিকেতন এই ভক্তিরত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। তাদৃশী স্বেচ্ছাময়ী সুনির্ম্মলা চিন্ময়ী ভগবদ্ভক্তি জীবের

পক্ষে সুদুর্ল্লভা. তাই বলিতেছি যে, হে গরুড়! শ্রীরামকে প্রিয়তম বোধ না হইলে সুরক্ষিতা অভ্ররূপা মোহমায়ার মহা আকর্ষণ হইতে এবং নিখিল সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্তি বা পরম পুরুষার্থ লাভ কথনই হইতে পারে না। তাই ভক্তির জয় ঘোষনা করিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিনী।
ভক্তিরানন্দ রূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

বিরহিনী রাধার উক্তি।

(বৃন্দার প্রতি)

—:০:—

শুন বৃন্দে সহচরী,
বলি তোর করে ধরি,
না হেরিয়া বংশীধারী,
চিতেনা ধৈরযধরে।
পুরুষ পাষাণ কায়া,
শরীরেতে নাহি মায়া,
রমনীর প্রতি দয়া,
কভু তারা নাহি করে॥
তা' হলেকি সহচরী,
মন প্রাণ চুরি করি,
যায় কি গো বংশীধারী,
ছাড়ি অবলা রাধারে।
ক্ষণ কাল যার মুখ,
না দেখিলে ফাটে বুক,
সে পাইয়া কিবা সুখ,
ভুলে র'ল মধুপুরে॥

পুরুষ ভৃঙ্গের ন্যায়,
নানা ফুলে মধু খায়,
মধু ফুরাইলে হায়,
প্রসূনেনা সমাদরে।
সেইরূপ কাল শশি,
পাতিয়া প্রেমের ফাঁসি,
যৌবন ও রূপ রাশি,
লয়ে গেল চুরি করে॥
তবু সে চোরের তরে,
দিবা নিশি প্রাণ পোড়ে,
থাকিতে না পারি ঘরে,
কি উপায় করি সই।
শাশুরী-স্বামি, ননদী
গালি দেয় নিরবধি
এত দুঃখ দিল বিধি,
এ যাতনা কারে কই॥

নয়ন মুদিয়া থাকি,
হৃদয় কমল আঁখি,
তোমার মুরতি দেখি,
কাটাই দিন যামিনী।

দাসীর অন্যে বাসনা,
পুরাও হে কেলে সোনা,
সহেনা আর এ যাতনা,
কহে দীন তারিনী।

জীবাধম—শ্রীতারিনী চরণ হালদার ভক্তিভূষণ।

সান্ত্বনা।

—:o:—

শ্যাম নাই—তাই বুঝি
ফুরায়ে গিয়াছে গান॥
কুলু কুলু কুলু রবে
এখনো যমুনা যায়।
মিশিবার তরে অই
দূর নতোনীলিমায়॥
এখনো বরষাগমে
শিহরে কদম্ব বন।
এখনো প্রভাত হ'লে
গোঠে চলে গাভীগণ॥
এখনো গাগরী কাঁখে
ব্রজের নাগরী বধূ।
উদাস আঁখিতে চায়—
কোথা শ্যাম,—কোথা বধু॥
কোথা শ্যাম, কোথা কালা
—ব্রজে সে ত নাহি হায়।
আঁধার আঁধার ব্রজ
—শ্যাম যে গো মথুরায়॥

রাধা রাধা রাধা নামে
কাঁপাইয়া নিধুবন।
বাঁশের বাঁশরী তাঁর
বাজে না ত অনুক্ষণ॥
বাজে না বাঁশরী আর
—শ্যাম নাই বৃন্দাবনে।
কি কাজ কালিন্দীকূলে
কেলিকুঞ্জে নিধুবনে॥
শ্যামহীন ব্রজপুরে
জীবনে কি প্রয়োজন।
চল সখি যমুনায়
প্রাণ দিই বিসর্জ্জন॥
বাজে না বাঁশরী আর,
থেমে গেছে মধুতান।
আশা কয় কানে কানে—
মরণ তো সোজা নয়।
শ্যামেরে একলা ফেলে
মরণ কেমনে হয়॥

সে ত ছেড়ে যায় নাই
ব্রজের গোপিনীকুলে।
ব্রজে তার প্রাণ বাঁধা
কেমনে রবে গো ভুলে॥
নিঃশেষে সবার মাঝে
বিকায়েছে বিনামূলে।
অঙ্গের লাবণি দেহে
কালিন্দীর কালো জলে॥
অই শোন্ কান দিয়া
উথলে যমুনাবারি।
শোন্ শোন্ প্রতিধ্বনি—
বাঁশরীর ধ্বনি তারি॥

শ্যামের পীরিতি ধারা
বহে বৃন্দাবন ময়।
শ্যামময় বৃন্দাবন—
শ্যামছাড়া নয় নয়॥
শ্যাম আছে, শ্যাম আছে,
আছে বাঁশরীর তান।
থামে নাই, থামে নাই,
ফুরায়নি তাঁর গান॥
প্রতিদিন প্রতিকাজে
কত সুর সাহানার।
বাজে বাঁশরীর তানে
হৃদিতন্ত্রে গোপিকার॥

শ্রীহরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ।

আঁখি-জলে মায়ের পূজা।

(গীতিকা)

—:০:—

আর কিছু ভাল লাগে না।
দিবানিশি জ্বলি, শোকের অনলে, পেতেছি দারুণ যাতনা॥
গগনেতে উঠে চন্দ্রমা তপন
উজলে মধুরে ছড়ায় কিরণ;
আঁধারে আবৃত মোর হিয়া মন,—
সে আলোক তাহে ফুটে না।
সরোবর-নীরে হেরিয়ে কমল,
আর ত পরাণ হয় না শীতল,

বেড়ে যায় শুধু স্মৃতির অনল,—
অসীম মরম বেদনা।

যদি কভু যাই ভ্রমিতে কাননে,
পাছু হ'তে মোরে কে যেন কে টানে,
বলে—"বন ফুল, করিবে আকুল,
এখনো কি ভুল ভাঙ্গে না।'

যাই যদি কভু তটিনীর তীরে,
দিনান্তে প্রাণের ক্লান্তি নাশিবারে ;
শান্তি প্রদায়িনী হায়, সে তটিনী,—
আর ত রহে না, রহে না।

শরৎ-কালের পূর্ণিমার নিশি,
ভাল ত লাগে না উৎসবের হাসি,
ঢাক্-ঢোল-ধ্বনি, এবে যেন শুনি'—
বিষাদেরি উন্মাদনা।

কর্ম্ম ক্ষেত্র মাঝে বহু আড়ম্বর,
লাগে যেন মোরে বিষের নির্ঝর,
উগরে গরল শত ফণাধর,—
বাঁশী নয়, অসির ঝঞ্ঝনা।

ভাল ত না লাগে বসন-ভূষণ,
ভাল ত না লাগে কুসুম চন্দন্,
তপ্ত আঁখি জল, ফেলিতে কেবল,
হ'তেছে আমার বাসনা।

পাষাণী আমারে দিয়াছেন যে সাজা,
অশ্রুজলে আজ্ কর্ব্ব তাঁর পূজা,
শ্বাসে শ্বাসে আর, উঠিবে হুঙ্কার,
সেই ত পূজার বাজনা।

জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল শাণিত কৃপাণে,
"অহং"—ছাগ্ বলি দিব মা'র স্থানে,
বরাঙ্গ সাজাবে, দীনতা-ভূষণে,—
দেখিব মায়ের করুণা।
দেখ্‌বো পাই কি না মায়ের করুণা ?
দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

আনন্দ-নগর।*

(১৪শ বর্ষ ৪২ পৃষ্ঠার পর হইতে প্রকাশিত।)

(লেখক—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত উকিল।)

—:০:—

ভক্তি সুন্দরী—সর্ব্বদা সহাস্য বদন। সুমধুর মিষ্টান্ন আস্বাদন করিতে যেমন মনুষ্যের রুচি উৎপন্ন হয় আবার মিষ্টান্নের আস্বাদন করিতে না পারিলে রুচির সার্থকতা সাধিত হইল না জানিয়া লোকে যেমন ক্ষুন্নমন হয়, ভগবানের নামে ও ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে ভক্তি সুন্দরীর তেমনি রুচি জন্মিয়াছিল। ভগবানের কথা প্রসঙ্গ বা ভগবানের নাম গ্রহণ সম্বন্ধে কোনরূপ অন্তরায় ঘটিলে সাতিশয় দুঃখিতা হইতেন। রুচি থাকিলে যে কোন খাদ্য দ্রব্য হউক না কেন তাহা যেমন আনন্দের সহিত আস্বাদিত হয় ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে বা ভগবানের নামে তাহার রুচি থাকায় সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে তিনি তাহাতে আনন্দ লাভ করিতেন। এই রুচি ভক্তি সুন্দরীর মধ্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে ছিল। প্রত্যেক জীবে তিনি ভগবানের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতেন এবং ভগবান্ বিবেচনায় প্রত্যেক জীবকে তিনি ভক্তি করিতেন। ভগবান্ মহান্ অদ্বিতীয় প্রভৃতি বহুবিধ গুণরাশির আশ্রয়স্থান ইহা বুঝিয়া ভগবানের সহিত একরূপ

---

* এতদিন পর্য্যন্ত আমরা নানাবিধ কারণে আনন্দ নগর প্রকাশ করিতে পারি নাই, বর্ত্তমান মাস হইতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। পাঠকগণ একান্ত চিত্তে পাঠ করুণ ! এক্ষণে শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের ইচ্ছা। (ভঃ সঃ)।

পার্থক্য ভাব তিনি আপন হৃদয়ে বরাবর পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি বড়ই শান্তশীলা ও বিনয়ের আদর্শ আমি লঘু অপর সকলে গুরু এই জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে বিজড়িত। অনুরাগ চন্দ্র গম্ভীর প্রকৃতি সম্পন্ন। ভগবদ্‌ভক্তি তাঁহার অন্তরের ধন। তিনি মনে মনে নিরবধি সেই ভক্তি সুধা পান করিতেছেন। বাহ্য দর্শনে তাঁহার অন্তরের ব্যাপার সাধারণের বুঝিবার বড় সামর্থ ছিল না। তাঁহার গুণ রাশি তাঁহার পত্নীর অনুরূপ ছিল। তাহাদের উভয়ের ভাব ও কার্য্য একরূপ ছিল। সতত পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ কামনা করিতেন, কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়িতে পারিতেননা। তাঁহারা সকল কার্য্য এক মন ও এক প্রাণ হইয়া সম্পাদন করিতেন।

এদিকে প্রীতি সুন্দরীর গর্ব্ভে ভাব সুন্দরের এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভাব সুন্দর পুত্রটীর নাম প্রণয়চন্দ্র রাখিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে প্রণয় চন্দ্রের রূপ ও গুণ সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ভগবানকে ভাল বাসিতেন এবং তাহার সহিত মিশামিশি করিতে তাঁহার একান্ত বাসনা। প্রত্যেক জীবে ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিয়া তিনি তাহাকে আপনার বস্তু বলিয়া ভালবাসিতেন এবং প্রত্যেক জীবের মঙ্গলে আপনাকে সুখী বিবেচনা করিতেন। বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যেরূপ ভালবাসা সেইরূপ ভালবাসার সহিত প্রণয় চন্দ্র ভগবান্‌কেও দেখিতেন। প্রণয় চন্দ্রের ভালবাসার গুণে ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিতেন এবং অনুরূপ ভালবাসায় তাঁহাকে সুখী করিতেন। ভগবান তাঁহার স্বামী তাঁহার হৃদয়ের ধন এই জ্ঞানে প্রণয় চন্দ্র ভগবানকে আরাধনা করিতেন। কাল ক্রমে প্রণয় চন্দ্র বিবাহ যোগ্য হইয়া উঠিলেন। কীর্ত্তন চন্দ্রের কন্যা আনন্দ কুমারী রূপে গুণে প্রণয় চন্দ্রের অনুরূপা। ভাব সুন্দর আনন্দ কুমারীর সহিত যথাবিধানে প্রণয় চন্দ্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। আনন্দ কুমারীর অপর নাম প্রফুল্লতা বা উল্লাসিনী। ভগবানের নামে ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে আনন্দ কুমারী পরমানন্দ লাভ করিতেন। বাল্যকালে আনন্দ কুমারী পরিচিত অপরিচিত বলিয়া কোন ইতর বিশেষ জানিতেন না। যিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইতে ইচ্ছা করিতেন তিনি তাঁহার ক্রোড়েই যাইতেন। তাহার সুকোমল অঙ্গ স্পর্শে সেই ব্যক্তি পরম সুখ লাভ করিতেন। বিবাহের পর প্রাণ পতিকে সুখী করিতে আনন্দ কুমারী কিছুমাত্র

ত্রুটী করিতেন না প্রণয় চন্দ্র ও আনন্দ কুমারী এক মন এক প্রাণ হইয়া আপনাদের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়িতে অনুমাত্র বাসনা করিতেন না ভগবদানন্দের হিল্লোল উভয়ের অন্তঃকরণে অনুক্ষণ উঠিয়া নানা ভাবে তাহাদিকে মাতোয়ারা করিতে লাগিল।

কাল ক্রমে আনন্দ কুমারীর গর্ব্ভে প্রণয় চন্দ্রের এক সুকুমার পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ঐ পুত্রের জন্মগ্রহণ কালে চতুর্দ্দিক প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ধূলি বিহীন সুশীতল সমীরণ সুধীরে প্রবাহিত হইয়াছিল। তৎকালে জীব সকল প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছিলেন কতিপয় প্রেমিক সাধু স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এক দিব্য জ্যোতিঃ উর্দ্ধ হইতে আসিয়া পুত্রটীর শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। পুত্রটীর শরীর মধ্যে মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণ পরিদৃশ্যমান ছিল। পুর-নারীগণের শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে সেই সময় চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল। প্রণয় চন্দ্র ও আনন্দ কুমারী পুত্র মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। পুরবাসীগণ তাঁহাদের সুখে পরমানন্দিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রেমভরে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। নামের বিরাম ছিলনা, তাহাদের আনন্দেরও অবধি ছিল না। সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা। তাঁহারা বহুক্ষণ এইরূপে হরিনাম সংকীর্ত্তনে সেইস্থান পবিত্র করিয়াছিলেন।

পুত্রটীর নাম করণ ও অন্নপ্রাশন এক সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল। জনক জননী নাম করণ কালে পুত্রটীর নাম প্রেমচন্দ্র রাখিয়াছিলেন। পুত্রটী অতীত বিনয়ী ও প্রিয় দর্শন ছিলেন। যে কোন ব্যক্তি হউন না কেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার অপ্রিয় ছিলেন না বা তিনি কাহারো অপ্রিয় ছিলেন না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার দেব চরিত্র সকলের নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত হইয়াছিল। তাঁহাতে সকল গুণের সমবায় দেখিয়া লোক সকল তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে প্রণয় চন্দ্র তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত জনৈক সুশিক্ষিত ভগবদ্ভক্ত চরিত্রবান্ গুরু মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। কালক্রমে তিনি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শি হইয়া ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়নে বিশিষ্ট মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ ভক্তি গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভক্তি শাস্ত্রের যাবতীয় রহস্য ও মর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়াছিলেন।

এদিকে ভক্তি সুন্দরীর গর্ব্ভে অনুরাগ চন্দ্রের সেবা সুন্দরী নামে এক পরম রূপবতী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কন্যার জন্ম গ্রহণ কাল অতীব শুভ ছিল। সেই সময়ে চতুর্দ্দিকে নানাবিধ শুভ লক্ষণ লোক সকল দেখিতে পাইয়াছিলেন। পিতা মাতার যত্নে কন্যাটী যতই উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিলেন অতুলনীয় গুণরাশি ক্রমশঃ তাহাতে প্রকাশমান হইতে লাগিল। সেবা সুন্দরীর দেহ মন পর সেবায় নিয়ত নিরত। প্রভুত্ত সেবা কার্য্যে তিনি যেমন সুনিপুনা ও যেমন প্রাণ মন দেহ ঢালিয়া দিতে পারিতেন এরূপ কখন কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

প্রেমচন্দ্র বিবিধ বিদ্যায় বিশেষতঃ ভক্তি শাস্ত্রে যেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপ পারদর্শিতা লাভ কাহারো ভাগ্যে কখন ঘটে নাই। ক্রমে তিনি বিবাহ যোগ্য হইলে প্রণয় চন্দ্র তাঁহার জন্য অনুরূপ কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেবাসুন্দরী প্রেমচন্দ্রের সহধর্ম্মিনী হইবার একমাত্র উপযুক্তা। সেবাসুন্দরীর সহিত প্রেমচন্দ্রের বিবাহ সর্ব্বজ্ঞান বাঞ্ছিত। সেবা-সুন্দরীর রূপ লাবণ্য যিনি দর্শন করিতে পাইতেন তিনিই তাহাতে মোহিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার রূপ অপেক্ষা গুণ অধিকতর মনোমোহিত কর ও জীবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধায়ক। যত্ন ভক্তি শ্রদ্ধা বিনয় ও শিষ্টাচারের তিনি আদর্শ ছিলেন। তিনি যেন সকলের পদানতা। তিনি জীব সেবায় পরমানন্দ লাভ করিতেন জীব তাঁহার সেবায় সুখ লাভ করিয়াছেন কিনা জানিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে যোড় হস্তে দণ্ডায়মানা থাকিতেন। জীব কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন সেই জন্য সদাই শঙ্কমানা হইতেন। যদি জীব তাঁহার সেবায় সুখী হইয়াছেন জানিতে পারিলেন অমনি মহানন্দে প্রফুল্লিতা হইতেন। জীবকে সুখী করিতে পারিলে তিনি আপনাকে সুখিনী বিবেচনা করিতেন। যিনি ক্ষুধার্ত্ত তাঁহাকে যিনি অতি যত্নের ও শ্রদ্ধার সহিত অন্নাদি দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। যিনি পিপাসিত তাঁহাকে সুশীতল জল দিয়া সেবা করিতে একান্ত যত্নশীলা। জীবের অভাবানুযায়িনী সেবা করিতে তিনি সদাই উন্মুখিনী। তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন, এবং দীন দরিদ্রের জননী স্বরূপা। উৎকট বা সংক্রামক রোগগ্রস্ত হউন বা অন্য যে কোন প্রকারের রোগী হউন সেবা সুন্দরী আপন জীবনের মায়া সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া পরম শ্রদ্ধা ও যত্ন

সহকারে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্তা হইতেন। বলা বাহুল্য এই অলোক সামান্যা দেব প্রকৃতি কন্যার সেবাকার্য্যে ভূতভাবন ভগবান্ পরম প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহারই সুখার্থে তাহাদের আরোগ্য বিধান করিতেন। এই অসামান্যা কন্যার গুণ রাশি দেবনগরে সর্ব্বজন বিদিত ছিল। সকলেই মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ধর্ম্মভাব সেবাসুন্দরীর স্বভাব সিদ্ধ। তিনি ভগবান্‌কে যে ভাবে ভালবাসিতেন সে ভাবের ভালবাসায় প্রেম ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ ছিল। ভগবৎ কথাই তাঁহার প্রিয়বন্ধু ছিল এবং তাঁহার নাম কীর্ত্তন মহানন্দের উৎস ছিল।

প্রেমচন্দ্র প্রেমে মাখা। ভগবৎ প্রেম তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিজড়িত। তাঁহার চিন্তায় প্রেম তাঁহার কার্য্যে প্রেম পরিব্যক্ত হইত। তিনি যে ভাবে ভগবান্‌কে ভালবাসিতেন তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর ছিল। শ্রীরাধা শ্রীভগবান্‌কে যেরূপ নিষ্কামভাবে প্রেম করিতেন সেই নিষ্কাম প্রেমই তাঁহার প্রেমের আদর্শ ছিল। শ্রীভগবানের আনন্দময় মূর্ত্তি তাঁহার চিত্ত ক্ষেত্রে সদাই বিরাজমান। তাঁহার মন বুদ্ধি প্রাণ শ্রীরাধারূপে সেই আনন্দ ময়ের সেবা করিতেন। কিরূপ ভাবে সেবা করিলে সেই আনন্দময়ের আনন্দের উৎপাদন হইবে। সেই চেষ্টা তার মন বুদ্ধি নিরন্তর করিত আনন্দময় তাহার অকৃত্রিম ভালবাসায় সুখলাভ করিলে তিনি আপনাকেসুখী বিবেচনা করিতেন। তাঁহার মন বুদ্ধি ভগবান্‌কে সুখী করিবার জন্য কিরূপ চিন্তা সাগরে যে ভাসমান হইত তাহা বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য, নিজ সুখের ইচ্ছা বলবতী থাকিলে পূর্ণরূপে ভগবানের সুখোৎপাদন করিতে পারা যায় না। ভগবান্ মহা বিরাগী মহাজ্ঞানী। পার্থিব সুখের বস্তুতে পার্থিব জীব সুখী হইতে পারেন। তিনি সকল বস্তুর মূল অধিকারী। ভাল ভাল পার্থিব বস্তু তাহাকে অর্পণ করিলে লোক তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবে না। তিনি নিষ্কাম ভালবাসা চান। প্রেমচন্দ্র অনন্য কর্ম্ম অনন্যমনা অনন্য প্রাণ অনন্য বুদ্ধি হইয়া পূর্ণ মাত্রায় নিষ্কামভাবে নিত্য নূতন নূতন ভাবে সুখানুভব করিতেন। শ্রীরাধার ভালবাসা এইরূপ, নিত্য নূতন ভাব, নিত্য নূতন সুখ। ভাবের বিরাম নাই সুখের ও শেষ নাই। শ্রীরাধার ভালবাসায় ভগবান্ যেরূপ সুখলাভ করিতেন সেরূপ আর কখন কোথায় পান নাই বা আর কোথায়ও পাইবার আশা নাই। ভগবান্ আপনার সম্বল যাবতীয় ঐশ্বর্য্য শ্রীরাধাকে দিতে প্রয়াসী ছিলেন, তুচ্ছ সামগ্রী জ্ঞানে ঐ সকল ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। যিনি স্ত্রীজাতির সর্ব্বস্বধন লজ্জা ধর্ম্ম সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতে কোনরূপে বাধা না থাকিয়া ও পূর্ণ মাত্রায়

নিষ্কামভাবে তাহাকে ভালবাসিয়া সুখী করিলেন শ্রীকৃষ্ণ সেই নিষ্কাম ভাল বাসার প্রতিশোধ দিতে কিছুই পাইলেন না। এক্ষণে ভগবান্ কৃষ্ণের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন তিনি সেই মহা প্রেমময়ী শ্রীরাধার নিকট কাঙ্গাল, দাস, ঋণী। এই ভাবের প্রেম প্রেমচন্দ্রের চিত্তে দেখা দিল। ভগবান্ সেই প্রেমচন্দ্রকে কিশোরীর স্বরূপ জানিলেন তিনি প্রেমচন্দ্রের প্রেমে ঋণী।

প্রেমচন্দ্র বিবাহ যোগ্য হইলে প্রেমচন্দ্রের পিতা তাহার সহিত অনুরাগচন্দ্রের কন্যা সেবাসুন্দরীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। অনুরাগচন্দ্র প্রেমচন্দ্রের বিদ্যা বুদ্ধি গুণ ও অসীম ভগবৎ প্রেমের বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। সেবাসুন্দরী তাঁহার পরম আদরের কন্যা; তাঁহাকে অনুরূপ পাত্রে সম্প্রদান করিবার জন্য তিনি বিশিষ্টরূপ যত্নশীল ছিলেন। সেবাসুন্দরীর সহিত প্রেম চন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব যেমন হইল অনুরাগ চন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল। অনুরাগ চন্দ্র কন্যার বিবাহে দেবনগর বাসী সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন শ্রদ্ধারত্ন কীর্ত্তন চন্দ্র ও অন্যান্য বহুতর আত্মীয় কুটুম্বাদি লইয়া প্রণয় চন্দ্র অনুরাগ চন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অনুরাগ চন্দ্র বরের উপবেশন জন্য এক মহার্ঘ সুকোমল ও অতি সুশোভন শয্যা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। প্রেমচন্দ্র সেই শয্যার উপবেশন করিলেন। বর স্বাভাবিক শোভায় শোভিত। অন্য বর ভূষণের তাঁহার আবশ্যক ছিল না। ক্রমে নিমন্ত্রিত গণে অনুরাগ চন্দ্রের বাটী পরিপূর্ণ হইল। বহুতর পুরনারী একত্রে শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শঙ্খনিনাদ ও মধ্যে মধ্যে আনন্দসূচক মঙ্গল ধ্বনি চতুর্দ্দিকে শব্দায়মান করিয়া তুলিল। দেবনগর নিবাসী কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি বালক সকলেই এই বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই মহানন্দে উৎফুল্ল। তদনন্তর অনুরাগ চন্দ্র প্রেমচন্দ্রের হস্তে প্রিয়তম কন্যা সেবা সুন্দরীকে সম্প্রদান করিলেন। প্রথা অনুসারে প্রেমচন্দ্র ও সেবা সুন্দরী আপন আপন পরিহিত মাল্য পরস্পর বিনিময় করিলেন। বরপক্ষের পুরোহিত সৌভাগ্য সুন্দর এবং কন্যা পক্ষের পুরোহিত বিনয় চন্দ্র মহানন্দে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। অনন্তর অনুরাগচন্দ্র যত্ন পূর্ব্বক বর কন্যা উভয়কে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন। প্রেমচন্দ্রের কথায় পুরনারীগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। আহ্লাদিনী প্রমোদিনী প্রভৃতি বহুতর পুরনারী সমস্ত রজনী বর কন্যা লইয়া আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। এদিকে নিমন্ত্রিত বর্গ পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া অনুরাগ চন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর দিন বর কন্যা প্রণয় চন্দ্রের বাটীতে গমন করিলেন।

ক্রমশঃ

"আলো-দর্শনে।"

(লেখক।—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

কোথা আছ তুমি ব'লে দাও নাথ দেখিতে না পাই কভু।
মনে হয় সদা অন্তরে বাহিরে বিরাজিত তুমি প্রভু॥
আছ তুমি কাছে ভাবি মনে মনে মাঝে মাঝে হয় জ্ঞান।
পড়িলে বিপদে এস তুমি ত্বরা করিতে শান্তি-বিধান॥
(যদি) সৎপথে থেকে ডাকিলে তোমায় বিপদ নাশগো তুমি।
(তবে) শিখাও আমারে কেমনে তোমায় ডাকিতে পারি হে আমি॥
বৃথা রঙ্গরসে অনিত্যের কাজে যায় যদি গণা দিন।
তা'হলে কিহবে এখেলাবাখেলে কাটিবে গো কতদিন॥
কিবা তবরূপ দেখিনি কখন কল্পনায় ভাবি তোমা।
তুমি অপরূপ এই জ্ঞান হয় বেদ শাস্ত্রে আছে শোণা॥
মনে হয় কভু সাকারে পূজিলে পাব বুঝি তোমা ধনে।
মন মত ক'রে সাজায়ে তোমায় আরাধিব এক মনে॥
(জানি) তুমি নির্ব্বিকার নাহিক আকার তুমিই জগৎপিতা।
তুমি কল্পতরু দীন দয়াময় জগতের মুক্তি দাতা॥
তুমি বিশ্বব্যাপি জগত কল্যাণ তুমিই অনাথ প্রভু।
তোমার মহিমা আঁকা চারিদিকে চরণে প্রণমি বিভু॥
তুমি সনাতন মঙ্গল নিদান সার্থক জনম মোর।
হৃদি মাঝে এসে দীনে দেখা দিয়ে কাটাও আঁধার ঘোর॥

আত্ম-সমর্পণ।

—:*:—

আমার সকল বিধি সকল শাস্ত্র
তোমার মুখের বাণী।
আমার সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম
তোমার আদেশ মানি॥
আমার সকল তন্ত্র, সকল মন্ত্র
তোমার কথা কওয়া।
আমার সকল আসন ভূত শুদ্ধি
তোমার নাম গাওয়া॥
আমার সকল ভক্তি, সকল মুক্তি,
তোমার স্মরণ মনন।
আমার সকল আশা, সব ভরসা
তোমার অভয় চরণ॥
আমার সকল "আমার," সকল "তোমার"
"তোমার" ক'রে দেওয়া।
আমার সকল প্রেমের চরম ব্যক্তি
তোমার কোলে যাওয়া॥

শ্রী—

সম্পাদকীয় :—"ভক্তি" গত ভাদ্র মাস ১ম সংখ্যা গ্রাহকগণের নিকট ভিঃ পি করিয়াছিলাম, যে সকল মহোদয় গ্রাহকগণ ভিঃ পি গ্রহণ করিয়াছেন আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আর যাঁহারা পূর্ব্বে বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত করান সত্বেও আমাদিগকে ভিঃ পি করিতে নিষেধ না করিয়া শেষে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া অনর্থক আমাদিগের ক্ষতি করাইলেন, তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ দিতেছি, গ্রাহকগণের এইরূপ আচরণে পত্রিকা প্রকাশকেরা অনেক সময় বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকেন, যাহা হউক শ্রীশ্রীগৌর ভগবান সকলেরই মঙ্গল বিধান করুন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভঙ্গী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য।)

—:•:—

আর একদিন করুণাময় ভগবান শ্রীগৌরহরি, ভট্টকে সকল বৈষ্ণবের সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন। বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের তেজ দর্শনে ভট্ট চমৎকৃত হইয়া পড়িলেন। এই বৈষ্ণব সভায় তিনি তাঁহাকে (নিজকে) খদ্যোতের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ভট্টের সুদিন উপস্থিত। বৈষ্ণব দর্শনে এবং প্রভুর কৃপায় মনের মালিন্য প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। তিনি (ভট্ট) বহু মহাপ্রসাদ আনাইয়া প্রভু সহ সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলীকে সাদরে ভোজন করাইলেন। প্রসাদ পাওয়ার শেষে ভট্ট সকলকেই মালা, চন্দন ও তাম্বুল প্রদান করিলেন। এইরূপে বৈষ্ণব পূজা করিয়া ভট্ট অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

"সভার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল।"

শ্রীশ্রীরথ যাত্রার দিন আসিল, মহাপ্রভু পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক করিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু-আজ্ঞায়, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর, শ্রীবাস, রাঘব পণ্ডিত, গদাধর এই সাতজন সাত সম্প্রদায় নর্ত্তক নিযুক্ত হইলেন। সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দটী খোল বাজিয়া উঠিল। করতালের সংখ্যা করে কে? প্রভু "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া সকল সম্প্রদায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের মধুর নিনাদে স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল বিকম্পিত। নর্ত্তকদিগের প্রেমে ভুবন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার কীর্ত্তনানন্দ দর্শনে বল্লভ ভট্ট চমৎকার বোধ করিলেন।

"দেখি বল্লভ ভট্টের হৈল চমৎকার।" (চরিতামৃত।)

বল্লভ বোধ হয় ইহ জীবনে আর কখনও এমন অগাধ প্রেম-জলধির আনন্দ-তরঙ্গ অবলোকন করেন নাই।

প্রভু কিছুকাল পরে নর্ত্তকদিগকে বিশ্রাম করিতে দিয়া, স্বয়ং কীর্ত্তনস্থ হইয়া নাচিতে লাগিলেন। ভুবন মোহনের নৃত্যে জগৎ মাতিয়া গেল !! এখানে একটুকু ঐশ্বর্য্যের বিকাশও হইল। অর্থাৎ সাত সম্প্রদায়ের ভক্তগণ সকলেই দেখিতেছে, "প্রভু আমাদের সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন।"

প্রভুর ঐশ্বর্য্য ও প্রেমোদয় দর্শনে ভট্ট নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলেন, "ইনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।"

"এই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ভট্টের হইল নিশ্চয়।"

এইবার বল্লভ ভট্টের সৌভাগ্যের সীমা এই পর্য্যন্তই শেষ। এতটা দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহার অন্তরের অভিমান দূর হয় নাই।

বারান্তরে ভট্ট আসিয়া প্রভুর নিকট নিবেদন করিল ;—"প্রভো! আমি ভাগবতের টীকা লিখিয়াছি, আপনি যদি কৃপা করিয়া শ্রবণ করেন, তবে আমার লেখার সার্থকতা রক্ষা পায়।"

প্রভু কহিলেন, "আমি ভাগবত শ্রবণের অধিকারী নহে, কেবল মাত্র কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করি। ইহাতেও আমার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাম অহর্নিশি জপ করিয়া পূর্ণ করিতে পারি না।"

বল্লভ কহিলেন,—"আমিও কৃষ্ণ নামের অর্থ ব্যাখ্যা বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।"

প্রভু কহিলেন.—"কৃষ্ণ নামের অর্থ আমি মানি না। কেবল শ্যাম-সুন্দর যশোদা নন্দন মাত্রই জানি।"

প্রভু যখন বল্লভের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে নারাজ হইলেন, বল্লভ তখন বিমনা হইয়া গৃহে আসিলেন। যখন স্বয়ং প্রভুই ভট্টের টীকা ব্যাখ্যা উপেক্ষা করিলেন,—তখন আর কে শুনিবে? নীলাচলবাসী কোন বৈষ্ণবেই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেন না।

ভট্ট নিতান্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং অতিশয় দৈন্য বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার চরণে শরণ লইয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া মৎকৃত ভাগবতের টীকা ও কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন তবে আমার লজ্জা নিবারণ হয়।"

পণ্ডিত বড় বিপদে পড়িলেন। তিনি শুনিতে ইচ্ছা না করিলেও ভট্ট যাইয়া বল করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। বিচারে পণ্ডিতের দোষ না থাকিলেও, প্রভুর মন তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বল্লভ প্রত্যহই প্রভুর দরবারে আসিয়া আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্ম নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করিয়া দেন। কিন্তু প্রভুর প্রখর বুদ্ধিমান্ স্বগণ-বর্গের সহিত বিচারে বল্লভ আটিয়া উঠিতে পারেন না। নিত্যই তাঁহার পরাজয় হয়।

একদিন ভট্ট আচার্য্যকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আচার্য্য! জীব প্রকৃতি কৃষ্ণকে পতি করিয়া মানে,—পতিব্রতা পতির নাম করিতে পারে না, আপনারা কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করেন ইহাতে কোন্ ধর্ম্ম হয়?"

বুদ্ধিমান আচার্য্য ভট্টের কুতর্কের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"সম্মুখে পূর্ণ ধর্ম্মের অবতার বসিয়া আছেন,—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তো হয়।" এই বলিয়া আচার্য্য মহাপ্রভুকে দেখাইয়া দিলেন। প্রভু কহিলেন,—"স্বামীর আজ্ঞা পালনই পতিব্রতার ধর্ম্ম। পত্নীদিগের প্রতি পতির আজ্ঞা, সর্ব্বদা তাঁহার নাম গ্রহণ করিতে। পতি-আজ্ঞা পতিব্রতা লঙ্ঘন করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা দিবানিশি কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম সঞ্জাত হয়।"

প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনিয়া ভট্ট বড় বিমনা হইয়া গেলেন। দুঃখিতান্তঃকরণে ঘরে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "একদিনও আমার কথা উপরে উঠে না। সভাতে বড় পক্ষপাত হয়।"

আর একদিন ভট্ট প্রভুকে নমস্কার করিয়া সভায় উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, "ভাগবতে শ্রীধর স্বামীর টীকা খণ্ডন করিয়াছি। স্বামীর টীকাতে এক বাক্যতা নাই, এই জন্ম আমি স্বামীকে মানিনা।"

প্রভু হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন,—"যে স্বামীকে না মানে, তাহাকে বেশ্যার মধ্যে গণনা করি।

"প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যে জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥" (চরিতামৃত।)

এই বলিয়া ভগবান গৌরহরি মৌনাবলম্বন করিলেন। ভট্ট ঘরে আসিয়া রাত্রিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন।—"পূর্ব্বে প্রয়াগে প্রভু আমাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়াছিলেন। এখন আমার প্রতি তাঁহার মন এমন ফিরিয়া গেল কেন? ইহা আমারই দোষ। প্রভুর কোন দোষ নাই। আমি জয়লাভ করি, এই গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্যই প্রভুর এই ভাব। আমার মানাভিমান চূর্ণ করিয়া চিত্ত শোধন পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিবার নিমিত্তই প্রভুর এই প্রয়াস ইহা অবশ্যই প্রভুর কৃপা। আমি বড় অপরাধী। কুমতির বশীভূত হইয়া আমি প্রভুর চরণ ছায়া হইতে যতই সরিয়া পড়িতেছি,—কৃপাময় প্রভু কৌশলে আমার চিত্ত শোধন পূর্ব্বক ততই টানিয়া তাঁহার চরণেরদিকে লইতেছেন।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া সারারাত্রি আত্মগ্লানির তুষানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া পর দিন প্রাতঃকালে প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

"প্রভু আমি অজ্ঞ জীব,—অভিমানে মত্ত অজ্ঞানের মত কার্য্য করিয়াছি। আমি মূর্খ আপনার সম্মুখে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া জয়লাভের প্রয়াস পাইয়াছি। আপনি ঈশ্বর, এ জীবাধমের প্রতি ঈশ্বরোচিত কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক অপমান করতঃ সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে শ্রীচরণের দাস করুন।"

প্রভু কহিলেন,—"যদি নিজের অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া থাক, যদি স্বীয় অজ্ঞান-জনিতাপরাধের জন্য আত্মগ্লানি হইয়া থাকে, তবে মনের সকল ময়লা মাটী খুটী নাটী ছাড়িয়া কেবল কৃষ্ণ নাম গ্রহণ কর, কৃষ্ণভজনের ফলে অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে দাস্য ভক্তিলাভ করিতে পারিবে।"

ভট্ট নয়ন জলে বুক ভাসাইয়া অতি করুণ ভাবে আপনার প্রার্থনা জানাইলেন।'—

"প্রভো! যদি এ দীন দাসের প্রতি এত কৃপাই করিলেন,—তবে অনুগ্রহ করিয়া আপনার দেব-সেব্য শ্রীপাদপদ্মখানি নরাধমের মস্তকে অর্পণ করুন।"

প্রভু কহিলেন,—"তুমি গর্ব্ব শূন্য হইয়া এখন মহা ভাগবত তুল্য, তোমার সকল অপরাধ ক্ষালন হইল। এখন হইতে তুমি আমার নিজ জন হইলে। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপাশ্রিত থাকিয়া শ্রীনাম সাধন করিতে থাক।"

ভট্ট কহিলেন, "যদি দাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আর একদিন তবে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

শ্রীশ্রীগৌরভগবান ভট্টের নিমন্ত্রণ মানিয়া তাঁহাকে মোহময় সংসার হইতে উদ্ধার করিলেন, পতিতপাবন নামের সার্থকতা দেখাইলেন।

"দেবী-আগমনে।"

(লেখক—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

—:•:—

সারাটী বরষ উদাস আননে
চাহিয়া রহিনু ধরণী পর;
বাসনা কেবল বাসনা রূপিনী
রাতুল চরণ হেরিতে তোর।
(তাই) বরষ পরে আসিয়াছ মাগো
আলো করি দিতে হৃদয় মোর;
ছিলনা মা আশা (আবার) হেরিব নয়নে
নুপুর শোভিত শ্রীপদ তোর।
এসেছ মা দীন কুটীরে যখন
লও মা মোদের এই বিল্বদল;
কাঙ্গাল আমরা কি আছে মোদের
সাজাতে জননী ও পদযুগল।
তুমি আমাদের কত আদরের
চির আরাধনার ধন তুমি;
তোমারে হেরিয়া গরবে ভরিবে
মোদের সোনার জনম ভূমি।
স্বাগত জননী স্বাগত তোমায়
মোদের আনন্দ ভবন মাঝে;

তোমার আগমনে নূতন জীবনে
ধাইতেছি মোরা যে যার কাজে।
শুনেছি যে দিন আসিবে গো তুমি
সে দিন হইতে ভুলেছি ঘুম;
জাগিছে যে প্রাণে "পাইব হেরিতে"
মোদের দুঃখিনী জনমভূম্।
গৃহ দ্বারে দাও মঙ্গল কলসী
বাজাও শঙ্খ আনন্দ ভরে;
মা এসেছেন আজ মোদের গৃহে
ঘোষিতে মহিমা জগৎ জুড়ে।
বঙ্গ গৃহে গৃহে (আজ) তোমার বিরাজে
আনন্দে মাতিছে আকাশ ব্যোম্;
ছেলে বুড়া সব অঞ্জলি ঢালিছে
বলি ত্বংহি দুর্গে ত্রাহি মাম্।
বরষ বরষ এইরূপে মাগো
আসিস্ এ দীন কুটীর মাঝে;
সপ্তমী হইতে নবমী যামিনী
সদা যেন মম নয়নে রাজে।
আসিছ এবার সিংহবাহনে
করিয়ে শস্য পূর্ণ বসুন্ধরা;
"অবাংমনসগোচর" মা দুর্গে
নমঃ নমঃ নমঃ ত্রিতাপ হরা।
ধরায় মানব অমর হয় মা
তোমার অপার করুণা বলে;
তাই গো ওপায়ে লুটাই আমরা
লওমা "শান্তিময়ী" কোলে তুলে।

পরমা-প্রকৃতি।

(লেখক—শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে।)

——:০:——

[সকাম, মায়িক জগতে হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ কিছুতেই হইবে না, "পাগল মানুষের" এই কথা অবলম্বনে লিখিত।]

পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনী শকতি, বাহিরে প্রকাশ হবে না, হবে না।
ব্যর্থ প্রয়াস, মিছে অভিলাষ, হৃদয় নিবুঝে হের না, হের না॥

এ যে লীলা, শুধু ভাবের গোচর,
ভাব-জগতের মহারত্ন সার,
বাক্য যাহারে, বর্ণিতে না পারে,—
চিত্রে ফুটাইতে পারে না, পারে না।

হেন কারিকর নাহি এ জগতে,
গঠন করিতে পারে কোন মতে,
এ বাহ্য ধরায় উপাদান নাহি,
হৃদে গড়িতে না পারে কল্পনা।

যার যতটুকু আছে ভাব সাধ্য,
তার ততটুকু হৃদয়ে আরাধ্য,
সিদ্ধ পুরুষের সিদ্ধ হৃদয়—
বিনা, পুণ্য রস খেলে না, খেলে না,

মাটীর জগতে কোথা পাবে বল?
ভক্তের হৃদয়ে [illegible] স্থল,
কমনীয় কান্তি করে ঝল মল,—
পাগলের ভাবে ভাব না, ভাব না।

বেদ গুহ্য ছবি হেরেছে যে জন,
সে রাখে অন্তরে, অন্তরের ধন;

কাহারো বা জাগে, ক্ষীণ স্মৃতি টুকু,—
সে যে সুদূর অতীতের ঘটনা।
আত্ম-সুখ ত্যাগে, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে,--
রসিকের কথা, রসিকেই জানে;
অপ্রাকৃত রস, যাহে কৃষ্ণ বশ,
প্রাকৃত ধরায় মিলে না, মিলে না।
রস-তত্ত্ব কথা, পাগলের মুখে,—
কানে শুনে যেন, অন্তরেতে থাকে,
"অপরাধ শূন্য নাম সংকীর্ত্তন"—
ইহাই প্রকাশ কর না, কর না।
অধিকার ভেদে, না হ'লে প্রচার,
উপধর্ম্ম সৃষ্টি হয় অনিবার,
অপরাধ আসে বিবিধ প্রকার,
সে পথ কখনো ধ'রনা, ধ'রনা।
হ্লাদিনীর সেবা পূজা চাও যদি,
ঢাক্, ঢোল, কোলাহলে নহে বিধি,
আ'ত্ম-নিবেদন-নৈবেদ্যের নিধি—
দিয়ে, সেবা-ব্রতী হওনা, হওনা।

হৃদয়-সমাধি।

(লেখক—শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে।)

—:০:—

['মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করিলেই তাঁহার প্রকৃত স্মৃতি রক্ষা করা হয়"—এই নিগূঢ় ভাব অবলম্বনে এই কবিতাটী লিখিত।]

তাঁহার পবিত্র-শব, মৃত্তিকা প্রোথিত—
করি, পরিতৃপ্ত চিত্ত, নহে ত আমার।
করিলাম স্মৃতি স্তম্ভ ইষ্টক নির্ম্মিত,—
তবু না হইল মোর তৃপ্তি বাসনায়।

আমি চাই, তারে প্রাণে প্রাণে রাখিবারে,
সে যে মোর অন্তরের অমূল্য রতন।
আমি চাই, পুজিবারে হৃদি রত্নাগারে,—
সে যে মোর আকাঙ্ক্ষার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন॥
তাঁর দেহ, ভাব-দেহ বিশুদ্ধ চিন্ময়,
প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও আনন্দ আধার।
সুভাবের মধু গন্ধ সদা কাছে রয়,
সে কি "আমি" আছে, সে যে "তুমি"ময়॥
বাহিরেতে রাখিবার নহে সেই নিধি।
তাই গড়ি, তার তরে হৃদয়-সমাধি॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসিন্ধু।

(লেখক—শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী।)

—:০:—

শ্রীচৈতন্য-লীলা হয় অমৃতের সিন্ধু।
জগত ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু॥ চৈঃ, চঃ।

উপরি উক্ত শ্লোকটি পাঠ করিয়া আমার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হয়। এক বিন্দু অমৃতে কি করিয়া জগত ভাসাইতে পারে? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর কলমের লেখা ত মিথ্যা হইবার নহে। যে এক বিন্দুতে জগত ভাসাইতে পারে, সে বিন্দু কত বড়। সেই এক বিন্দুই ত একটী অমৃতের সিন্ধু। তবে তাহাকে বিন্দু বলা হইল কেন? পদার্থ লইয়া বিচার করিলে বিন্দুতে জগত ভাসান যায় এ কথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গৌর-লীলায় যাহা অসম্ভব তাহাও সম্ভব হইয়াছিল। এই বিষয়টি লইয়া চিন্তা করিতে করিতে আমার মনে যে ভাবটি উদয় হইল তাহা ইষ্টগোষ্ঠীতে গৌর-ভক্তদিগের নিকট নিবেদন করিলাম। ইহা লইয়া তাহারাও বিচার করিয়া দেখিলেন এবং অবশেষে

বলিলেন ভাবটি উত্তম উত্তম। বস্তু পাইলেই আমি আমার প্রিয়তম গৌরগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া থাকি। তাহারাও ইহার আস্বাদন করিয়া ভাল বলিবেন তবে আমার সুখ হইবে।

আমার ভাবটি কি তাহা বলি। এক বিন্দু অমৃতে কি করিয়া জগত ভাসান যায়, এই বিষয়টি লইয়া বিচার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে সেই অমৃত বিন্দুটি কি তাহা জানা আবশ্যক। সেটী আমার জনৈক বন্ধু পণ্ডিত পাইন প্রথম। তাহা শ্রীশ্রীনবগৌরচন্দ্রের লীলাসিন্ধুর বিন্দু। গৌরলীলা-সমুদ্র তটে বসিয়া নীরে কৌতুকে গৌরভক্তবৃন্দ লীলা-তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গী দেখিতেছেন, আর দেখিতেছেন সমুদ্রের জলরাশি যেন উত্তাল তরঙ্গ নিচয়ের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যে মধুর খেলা করিতেছে নয়ন ভরিয়া তাহা দর্শন করিতেছেন। আর মনে মনে ভাবিতেছেন এই লীলা সমুদ্রের অসীম জলরাশি জগৎ ডুবাইতে অনায়াসে পারে, কিন্তু ইহার এক বিন্দুতে কি করিয়া জগত ভাসাইতে পারে তাই লইয়া বিচার করিতেছেন।

গৌর লীলা সমুদ্র স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌর ভগবান। তাহার জল রাশি তাঁহার অগণন ভক্তবৃন্দ। তরঙ্গাবলী তাঁহার অন্তরঙ্গ মহাজন ও আচার্য্যগণ। উপস্থিত জলবিন্দু সকল সেই সকল মহাজন ও আচার্য্যগণের কৃপাশ্রিত শিষ্য অনুশিষ্যবৃন্দ। ইহাদিগের দ্বারাই জগতে গৌর লীলা বিতরিত হইয়াছে ও হইতেছে। কি রূপে এই লীলা সমুদ্রের একবিন্দু জলে জগত ভাসাইতে পারে একক্ষণে বিশেষ বলিতেছি।

একজন গৌর ভক্ত লীলা-সমুদ্রের একবিন্দু জল। এক একজন গৌর ভক্ত এক একটী ধ্রুব প্রহ্লাদ। তাঁহারা জগত তারণের শক্তি ধারণ করেন। এক জন গৌরভক্ত বা একজন শক্তিশালী গৌর ভক্তানুগ্রহ ভিখারী দ্বারা প্রভুর লীলা জগতে বিস্তার হইতেছে। প্রভু সন্তান, আচার্য্য সন্তান, গৌরভক্ত-বৃন্দ যে দিকে শুভ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, যাহার সঙ্গে একটী গৌর কথা কহিতেছেন, সেদিক, বা সেদিকের লোক সমুদয় গৌরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৌর-লীলা-সমুদ্রে ডুবিতেছেন। আবার যে ভাগ্যবান জীব গৌরাঙ্গ দাসের কৃপা কণা প্রাপ্ত হইলেন তিনিও অসীম শক্তিশালী হইলেন। তাঁহার দর্শনে, তাঁহার একটী মুখের কথায় গৌর-লীলা তত্ত্ব অন্তরে অমৃত ধারা প্রতিভাত

করিতে লাগিল। সেই মধুর লীলা-তরঙ্গের উচ্ছ্বাসময় জলবিন্দু যাহার অঙ্গস্পর্শ করিল, তাহারও অসীম শক্তি হইল। এইরূপ শক্তি সঞ্চারণ প্রক্রিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে প্রধাবিত হইল এবং এই অলৌকিক ক্রিয়ার ফলে গৌর-লীলাসিন্ধুর এক বিন্দুতে সমস্ত জগত ভাসিল। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ঃ—

"জগত ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু।"

এ কথা ধ্রুব সত্য। ইহা মহাজনগণের কল্পনা প্রসূত নহে। গৌর-লীলা-সমুদ্রের শত শত ধার দেশ বিদেশে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার অমৃত প্রবাহে কোটি কোটি জীবের শুষ্ক পাষান হৃদয় স্নিগ্ধ হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা অমৃতের সার।
এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার॥

প্রভুর এক একটী লীলার প্রবাহ শত ধারে প্রবাহিত হইয়া শত শত ভাবে কলিহত জীবের হৃদয় শীতল করে। তাহার এক বিন্দুতে জগত কি করিয়া ভাসিতে পারে তাহা যাহা বুঝিলাম তাহাই লিখিয়া আত্মশোধন করিলাম।

প্রাবৃট নিশীথ চিন্তায়।

(লেখক—প্রভুপাদ শ্রীল নিত্যানন্দ গোস্বামী।)

—:०:—

বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হইতেছে। সমস্ত আকাশ একখানি স্থূল কৃষ্ণবর্ণের আচ্ছাদন-বস্ত্রে আচ্ছাদিত।

সেই ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশে মধ্যে মধ্যে ভ্রূকুটি-কুটিলভাব-ব্যঞ্জক চিকুড় বিকাশ, এবং তদুপরি বিরত বিরামে গুরু গুরু জীমূত মন্দ্র। আমি, স্তম্ভিত ব্যাকুলভাবে উপবিষ্ট

স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল প্রকম্পক এরূপ ভীম গর্জ্জন ইতিপূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করি নাই। জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতে একে একে সমস্ত জীবনের সমস্ত ঘটনা

গুলি চিন্তা করিতে লাগিলাম, কৈ এরূপ স্তম্ভিত, ব্যাকুল ভাব ত কখনই অনুভব করি নাই !!

প্রাণ কি যেন এক অজানা আশায় কোন্ অজানা প্রতীক্ষার দারুণ স্তব্ধ-ভার-পীড়নে নিপীড়িত। প্রতিক্ষণই যেন মনে হইতেছে—"এইবার—এইবার।" কিন্তু, সে যে কি, তাহা ত' বুঝিতেছি না। তাই স্তম্ভিত। এই যে প্রতীক্ষার অবস্থান, ইহাতে যেন কি এক মদিরামাখা ভাব আছে, ইহাতে যেন কষ্টের সহিত কি এক ক্ষীণ সুখজ্যোতি মিশান আছে। ব্যাকুল, স্তব্ধ ভাবে আমি তাহা অনুভব করিতেছি।

যেন হটাৎ উচ্চ হইতে উচ্চ শব্দে মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দিক্ হইতে দিক অন্ত পর্য্যন্ত প্রোজ্জ্বল করিয়া নয়নে ধাঁধা লাগাইয়া এক জ্যোতির বিকাশ হইল। সে কি চপলা? সে কি বিদ্যুৎ?

শত সহস্র রবি কিরণ এক সঙ্গে এক ভাবে নয়নে লাগিল, সে তেজ দর্শনের ক্ষমতা চক্ষুর নাই—সে ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল।

যখন চাহিলাম—দেখিলাম, নির্ব্বাক, নিস্পন্দভাবে এক মহাযোগী, জাহ্নবীর তীরে ধ্যানে নিমগ্ন। সম্মুখে জানিনা সে কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পিত গঙ্গোদক শিক্ত রাশি রাশি তুলসী পত্র। মনে হইল যেন সে গঙ্গোদক আর কিছু নহে, সে ভক্তের সারধন ভক্তি-অশ্রু। মনে হইল সে তুলসী দলও আর কিছু নহে, সে পরম ভাগবৎগণের হৃদয় তুলসী।

আর যেন সেই যোগী ঐ সমস্ত ভাগবতগণের হৃদয়-তুলসীদলগুলি লইয়া তাঁদের ক্রন্দনে সুর মিলাইয়া যেন তাঁদের প্রতিনিধি স্বরূপে নীরবে জানাইতেছেন –

"এস মোল প্রভু! আসি কর অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার।"

দেখিলাম—সেই পুজা, সেই দৃশ্য, যেন গ্রহ, উপগ্রহ, দেব, দানব, যক্ষ। রক্ষ সকলে দূরে অন্তরীক্ষে থাকিয়া, নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ ভাবে অবলোকন করিতেছেন। মনে হইল যেন ক্ষণকালের জন্য জাহ্নবী কুলু কুলু তান ভুলিয়া নীরব নীথর হইলেন। অনন্ত তারকা তাহাদের মিটি মিটি চাহনী ভুলিয়া এক লক্ষ্যে দেখিতে লাগিল। বায়ু নিশ্চল স্থির। ব্রহ্মাণ্ড স্তব্ধ।

সেই সূচী ভেদ্য স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় এক ধ্বনি উঠিল "যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে।" সেই ধ্যানী মহাযোগী আসন ত্যাগ করিলেন। বলিলেন --

"শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস। শুক্লাম্বর,
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া,
বুঝাইব কৃষ্ণ ভক্তি তোমা' সভা লৈয়া।

* * *

তবে কৃষ্ণ মোর প্রভু! মুঞি তাঁর দাস!

আবাহন যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান শেষ হ'ল। দেখিলাম সুরধুনীর জল কল্লোল আবার আনন্দ সুরে তান ধরিয়া নাচিয়া ছুটিল। আবার বসন্তের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দক্ষিণা হাওয়ায় সমস্ত জগত যেন আনন্দ হিল্লোল সৃষ্টি করিল। হরি ধ্বনি সহ নর নারী জানাইল—"ঐ দেখ চির বাঞ্ছিত চির দয়িত॥"

চমক কাটিল। চাহিলাম। বুঝিলাম সে সুখ দৃশ্য, সে সুখ স্রোত কোথায় কোন্ অতীতে লীন হইয়া গিয়াছে। যা' আছে, তাহা কেবল অশ্রু বারি বর্ষণ, ক্ষুব্ধ হৃদয়ের রুদ্ধ শ্বাস, এবং দারুণ, প্রতীক্ষার যন্ত্রণা।

হা দীনবন্ধু! কত দীনহীনের, আর কতদিনের, ক্রন্দনে তোমার পূত ভবিষ্য বাণীর কার্য্য আরম্ভ হইবে, শুধু ব'লে দাও প্রভু! সে কত দিন, তাহা হইলেও কত কত নিরাশ ভগ্ন, কাতর প্রাণ প্রতীক্ষার যন্ত্রণাকে সুখের আশায় পরিণত করিতে পারে। নচেৎ, হে—

"আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম পালৌ

তাহারা—সেই দীনের—সেই অতি কাতর ক্ষুদ্রগণ যে চিরদিনই অন্ধকারে নিয়ত অশ্রুবারি বর্ষণ করিবে? বল প্রভু সে আর কতদিন?

ভক্তের ভগবান।

(লেখক।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ।)

—:•:—

কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ওগো! তুমি ভেবেছ কি, শুধু গালে হাত দিয়ে ব'সে ভাবলে কি ছেলের অসুখ সেরে যাবে?

"আমায় কি ক'রতে বল?"

"একজন ডাক্তার যদি এনে দেখাও আর কি ক'রবে। আজ আটদিন বাছার অসুখ হ'য়েছে, একপলা ওষুধও বাছার পেটে গেল না। আমার যেমন কপাল, তাই তোমার মত লোকের হাতে পড়ে ছিলাম।"

"সামান্য জ্বর হ'য়েছে এর জন্য আর ভাবনা কি! শ্রীভগবানকে স্মরণ ক'রে তুলসী তলার মাটী এনে খাওয়াও ভাল হ'য়ে যাবে। তিনি ভিন্ন আমাদের আর কি উপায় আছে। আর যার নাম নিলে ভবরোগ সেরে যায়, এ সামান্য রোগ সারবেনা!"

"তুমি ভগবান ভগবান করেই গেলে। যদি তোমার হরিনাম করলেই অসুখ ভাল হ'ত তা'হলে ডাক্তার বদ্দিগুলা কি করতে হ'য়েছে।"

"যাদের ভগবানে বিশ্বাস নাই—নাম ব্রহ্মে আস্থা নাই—মনের বল নাই, তাদেরই বেশী রোগ হয় ও তারাই ডাক্তার বদ্দি দেখায়। এই যে সে দিন আমাদের জমীদারের বড় ছেলেটী মারা গেল, এত ডাক্তার বদ্দি এনে চিকিৎসা করালে কই তবুত রক্ষা পেলেনা। তুমি জাননা কামিনী, মানুষ যদি কাহারও কল্যাণ কামনা করিয়া শ্রীভগবানকে কিয়ৎকাল স্থির চিত্তে চিন্তা করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই শত সহস্র বিপদের মধ্য হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়; মানুষ চিন্তাশক্তি দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে!"

"তার বাপ মা'র মনেত আর আপশোষ রহিল না। সাধ্যমত চিকিৎসা করাইলে যদি না বাঁচে আর কি করবে।"

*"চিন্তামণি-তত্ত্ব" প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিষদ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

"ওবেই বুঝে দেখনা কেন ডাক্তার বদ্দির কোন সাধ্য নাই, সকলই সেই ভগবানের ইচ্ছা' তাই কথায় বলে, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?"

'তোমার ও পাগলামী ছাড়, এখন ছেলেটকে ডাক্তার দেখাবে কিনা বল?"

"জানত এখন আমার হাতে একটি পয়সাও নাই। [illegible] দশবাড়ী মাধুকরী [illegible] এক বাড়ীতে এক মুষ্টি চাল পাওয়া যায়, একেবারে [illegible] পয়সা থাকবে? ডাক্তার ত আর অমনি আসবেনা, বিশেষতঃ কালী ডাক্তার কি আমাদের বাড়ী আসবে। যে বৈষ্ণব ভিখারী দেখলে চাবুক মারতে [illegible] দেয়, সে কি কখনও বৈষ্ণবের বাড়ী আসে।"

'থালা ঘটি বন্ধক দিয়ে টাকার যোগাড় কর। আমার তারক বেঁচে থাকলে অনেক থালা ঘটী হবে। কিন্তু বাছা ত আমার ফিরবেনা। আর কালী ডাক্তার পয়সা পেলে আসবেনা কেন? তার পয়সা নিয়ে কথা, পয়সা পেলে অবশ্যই আসবে। কালী ডাক্তার মানুষ ত বটে। যে মানুষ, মানুষের বিপদে সাহায্য না করে সেত' সয়তান!"

"কামিনী তুমি জাননা কালী ডাক্তার সয়তানেরও অধম। তার দয়া নাই মায়া নাই অনুগ্রহ নাই কৃপা নাই এমন কি ধর্ম্ম ভয় পর্য্যন্ত নাই। যে দৃশ্য দেখলে অতি বড় পাষণ্ডেরও চক্ষে জল আইসে তাহা দেখিয়া কালী ডাক্তারের পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয় না। এই সে দিন বিষ্ণু কামারের ছেলের ওলাউঠা হ'তে কালী ডাক্তারকে এনেছিল, ডাক্তার বাড়ীতে যেমন পা দিলেন, অমনি ছেলেটী মারা গেল কিন্তু ব্যাটা এমনি পাষণ্ড যে ভিজিটের টাকা না নিয়ে গেল না! শুধু তাই কি! চার আনা পয়সা কম হ'য়েছিল, দিতে গেল ছুড়ে ফেলে দিলে! তারপর বিষ্ণু যখন কাঁদতে কাঁদতে বল্লে যে, "ছেলের গতি ক'রে ফিরে আস্‌বার সময় আপনার চার আনা পয়সা দিয়ে আসব!" তখন সাত সিকা নিয়ে তবে গেল। অমন লোকের মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তুমি বল, আমি যাচ্ছি; কিন্তু সে আসবেনা।"

"তা ব'লে আমার ছেলেটী কি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে? আমি থালা ঘটী কাঁসা দিয়ে টাকার যোগাড় করি তুমি ডাক্তার আনতে যাও আর [illegible] [illegible] ছেলে [illegible] দেখে [illegible] যাও।"

হরিশ আর কোন কথা কহিল না শ্রীভগবানের চরণ স্মরণ পূর্ব্বক ডাক্তার আনিতে গমন করিল।

(২)

"ও তারকের মা! আমায় ডাকতে পাঠিয়েছিলে কেন মা?"

"খুড়ি মা! আমার তারকের বড় ব্যায়রাম?"

"ডাক্তার দেখাচ্ছিস্‌ত?"

"আর বল কেন খুড়ি মা! মিন্সের রকম ত জান। তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি একে বারে লোপ পেয়েছে। বলে কিনা তুলসী তলার মাটী খাওয়ালে রোগ সেরে যাবে! আমি কত ব'লে ক'য়ে তবে ডাক্তার আন্‌তে পাঠিয়েছি।" কিন্তু খুড়িমা! ঘরে যে একটী পয়সা নাই! পাঁচটী টাকা ধার না দিলে ত এ যাত্রা বুঝি আর আমার তারক রক্ষা পায় না। কামিনী কাঁদিতে লাগিল।

"তাইত মা! আমার কাছে ত এখন একটী পয়সাও নাই। থাক্‌লে তোমায় ধার দিব না এও কি একটা কথা! আর তুমি কিছু খালি হাতেও নিচ্ছ না যে পালিয়ে যাবে। থাক্‌লে এখুনি দিতাম, তুমি কি আমার পর!"

"তবে কি হবে খুড়ি মা! দুখানা থালা আর ঐ ঘড়াটী রেখে পাঁচটী টাকা না দিলে বাছাকে আমার ডাক্তার দেখাতে যে পারবনা হায়! হায়! বাছা আমার বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে।

"তা—তা, তুমি যখন এত করে ব'লছ তখন না হয় বিন্দু দিদির কাছে থেকে এনে দিচ্ছি কিন্তু মা, সে দু'আনা সুদের কম দেবেনা।"

"তার জন্য আর কি ক'রব খুড়ি মা! এখন যে যা চাইবে তাই দিতে হবে।"

"আচ্ছা তবে ঘড়াটা আর থালা দু'খানা দে, একবার বিন্দু দিদির কাছে যাই।"

কামিনী তাড়াতাড়ি থাল দু'খানি ও ঘড়াটী বাহির করিয়া দিল। ভুলুর মা ওরফে খুড়িমা সে গুলি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ভুলুর মা বালবিধবা তাঁহার পুত্র কলত্রাদি কিছুই নাই। তবে কেন যে তিনি 'ভুলুর মা' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তিনি ভুলুর মা নামেই পরিচিত। ভুলুর মার বয়স ত্রিংশ বৎসরের অধিক নহে। তিনি সংসারে একাকীই বাস করেন, তাঁহার আর অন্য অভিভাবক নাই।

একমাত্র অভিভাবিকা বৃদ্ধা জননী তিনি জামাতার শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং ভুলুর মা সংসারে একা। তেজারতি ব্যবসা দ্বারা ভুলুর মার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। তবে বালবিধবা ভুলুর মা চরিত্র খাঁটি রাখিতে পারেন নাই, এইরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। ভুলুর মা সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসেন, এ জন্য তিনি দেশী কালাপাড় সাড়ী ভিন্ন অন্য বসন পছন্দ করেন না। তাঁহার পাতলা পাতলা ঠোঁট দু'খানি সর্ব্বদা তাম্বুল রাগ রঞ্জিত, অলকা দাম সুবিন্যস্ত। অন্যে যাহাই বলুক না কেন তাঁহার বিশ্বাস যে তাঁহার যৌবন নদীতে এখনও ভাটা পড়ে নাই, বোধ হয় এই জন্যই মুখপোড়া লোকে তাঁহার মিথ্যা অপবাদ দিয়া থাকে। যাহা হউক ভুলুর মা পরোপকারী সুতরাং এই সামান্য অপরাধ কখনই গণ্য হইতে পারে না। যাহা হউক ও কথায় আর আমার কাজ নাই।' প্রিয় পাঠক পাঠিকে! আপনারা ইহার সুবিচার করিবেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভুলুর মা ফিরিয়া আসিয়া কামিনীর হস্তে পাঁচটী টাকা দিয়া কহিলেন, ঐ জিনিস রেখে পাঁচ টাকা কি দিতে চায়, আমি বাই মেয়ে— তাই এনেছি! ভুলুর মা প্রস্থান করিল। কিন্তু আমরা জানি ভুলুর মা ঐ টাকা নিজ হইতে দিয়াছিলেন।

(৩)

হরিশ ডাক্তারবাবুর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিল, ডাক্তার বাবু বাড়ী আছেন।

ডাক্তার বাবু তখন বাটীতে ছিলেন না রোগী দেখিতে গিয়াছেন। তাঁহার ভৃত্য বিশু বাহিরে আসিয়া, হরিশকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, কিগো বোষ্টম ঠাকুর! কি মনে ক'রে?

হরিশ বলিল, আমার ছেলের বড় ব্যায়রাম তাই ডাক্তার বাবুকে ডাকৃতে এসেছি।

বিশু আর কোন কথা না বলিয়া হরিশকে বসিতে বলিয়া আপনার কক্ষে গেল।

হরিশ বাহিরে বসিয়া আপনার অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। নাজানি আজ পাষণ্ড ডাক্তারের হস্তে কত না লাঞ্ছিত হইতে হইবে। কারণ

কালী ডাক্তার ঘোর তান্ত্রিক। বৈষ্ণবকে অপমান করা সে গৌরব বলিয়া বিবেচনা করে। এমন কি সে বহুদিন বহু বৈষ্ণবকে জোর করিয়া সুরাপান পর্য্যন্ত করাইয়া তবে ছাড়িয়াছে। কিন্তু উপায় নাই। হরিশ মনে মনে সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নামজপ করিতে লাগিল ও ডাক্তারের সুমতির জন্য তাঁহার চরণতলে কাতর প্রার্থনা জানাইল।

এমন সময়ে ডাক্তার বাবু আসিলেন এবং সম্মুখে দীর্ঘ শিখাধারী হরিশকে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

হরিশ অষ্টমী পূজার ছাগশিশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে জোড় হাতে বলিল, ডাক্তার বাবু। আমার ছেলের বড় ব্যারাম আপনি যদি দয়া ক'রে পায়ের ধুলা না দেন তা'হলে আমার তারক আর এ যাত্রা রক্ষা পায়না।

কালী ডাক্তার [illegible] মদিরোন্মত্ত রক্তচক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া কহিল, হারামজাদ। তোর এত বড় স্পর্দ্ধা যে তোর বাড়ী আমায় যেতে বলিস। কে কথায় আছিস, ব্যাটার টিকি থামের সঙ্গে বেঁধে চটাপট জুতা লাগাও। ব্যাটারা, কালী ঠাকুর দেখলে বলা হয় 'বাপরে কি বিকট চেহারা' এইবার দেখি তোদের সেই কোমর ভাঙ্গা কালা ঠাকুর কেমন করে রক্ষা করে, বলিয়াই পাষণ্ড নির্দ্দয় কালী ডাক্তার হরিশের [illegible] পদাঘাত করিল। হরিশ দাঁড়াইয়া ছিল পড়িয়া গিয়া তাহার দেহের [illegible] কাটিয়া গেল। তথাপি হরিশ ধীরে ধীরে উঠিয়া আস্তে [illegible], কহিল আপনি অনর্থক আমার উপর রাগ করছেন কেন, দেবতা [illegible] যারা [illegible] তারা মহাপাপী। পাষণ্ড কালী [illegible] বলিল ডাক্তার বাবু আপনার [illegible] আপনার [illegible] বলিয়াই হরিশ সাশ্রুনেত্রে গাহিতে লাগিল

ভজরে কালা বরণে।

ভবেনা কালের ভয় কালায়ে করিলে মনে।

(মোর) কাল অঘহারী, কালান্তক ধারী সদা কাল হেরি হারে

[illegible] সেই কালো শ্যাম কানু [illegible] ক'রোনারে

লীলার কারণে কখন শ্মশানে, কভু শবোপরে কভু রণাঙ্গনে,
কভু বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনা সনে, যমুনা পুলিনে।

মহাপাপী কালী ডাক্তার দ্বিগুণ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, ব্যাটা আমায় ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন। নৃশংস কালী ডাক্তার পুনরায় হরিশের শিখা ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত করিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। বিষম প্রহারের ফলে হরিশের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত হইল। বিশু দূরে দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু যখন হরিশের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন আর বিশু স্থির থাকিতে পারিল না পাপাত্মা কালী ডাক্তারের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু এত অত্যাচারেও হরিশ ডাক্তারের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিল না। অশ্রুজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। হরিশ ধীরে ধীরে বাড়ী অভিমুখে প্রস্থান করিল। হায়রে অপত্যস্নেহ!

(৪)

হরিশ বিষন্নমনে বাটী আসিয়া দেখিল এক বৃদ্ধ বৈদ্য তাহার পুত্রের নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন ও কামিনী নিকটে বসিয়া পুত্রের পীড়ার কথা বলিতেছে।

হরিশ ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইল, তখনও হরিশের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিত পাত হইতেছে।

কামিনী হরিশকে এতদবস্থায় দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং নৃশংস কালী ডাক্তার যে তাহার স্বামীর দুর্দ্দশার কারণ তাহা আর কামিনীর বুঝিতে বাকী রহিল না। কামিনী স্বামীর দুরবস্থা দেখিয়া "ওগো তোমার এমন দশা কে কর্‌লে গো" বলিয়া স্বামীর পদতলে আছ্‌ড়াইয়া পড়িল।

হরিশ তাহাকে ধম্‌কাইয়া বলিল, মর্‌ মাগী! আবার কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন? এই ত বৈদ্যরাজ এসেছেন।

কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল ওগো আমি সে জন্য কি কাঁদ্‌ছি, ওগো তোমার এমন দশা কে ক'র্‌লে?

হরিশ হাসিতে হাসিতে বলিল কৈ আমারত কিছু কষ্ট হ'চ্ছে না। আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি যে, কালী ডাক্তার আমার ভালর জন্যই আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার ক'রেছে। আমি গরীব মানুষ পয়সা কোথায় পাব জেনে

আমায় তাড়িয়ে দিয়ে আবার নিজেই কবিরাজ মহাশয়কে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে কি কাঁদিস্‌নি, ভগবান যা করেন ভালর জন্যই ক'রে থাকেন। যা কবিরাজ মহাশয়ের কাছে যা, তিনি যা জিজ্ঞাসা করেন সব কথা ভাল করে বল'গে।

কামিনী উঠিয়া বসিল ও ধীরে ধীরে পুত্রের নিকট গমন করিল কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তারক উঠিয়া বসিয়া আছে। কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন!

হরিশ চারিদিকে অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কবিরাজ মহাশয় কোন পথে বাহিরে গেলেন কেহই বুঝিতে পারিল না। কারণ বাহিরে যাইতে হইলে হরিশ যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল সে স্থান দিয়াই যাইতে হইবে আর অন্য পথ নাই এবং কিছু পূর্ব্বে যে তারক অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল সে এক্ষণে কি প্রকারে উঠিয়া বসিয়া খেলা করিতে সক্ষম হইল। তখন কবিরাজ যে কে তাহা আর হরিশের অবিদিত রহিল না। হরিশ ও কামিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তখন আর তাহারা পুত্রের দিকে তাকাইয়াও দেখিল না। তাহারা আজ যে অমূল্য নিধি নিকটে পাইয়া ও চিনিতে পারিল না তজ্জন্য বহু প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিল।

পরদিন হরিশ সংবাদ পাইল যে কালী ডাক্তার মদ খাইতে খাইতে দম আট্‌কাইয়া হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হরিশ, ডাক্তারের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে বড়ই দুঃখিত হইল। ডাক্তার যে তাহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল সে কথা একবারও তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। হরিশ, ডাক্তারের পরলোকগত আত্মার সদ্গতির জন্য শ্রীভগবানের চরণতলে বহু প্রার্থনা করিল। ভক্তের এই কাতর প্রার্থনা শ্রীভগবানের চরণতলে পৌছিয়া মহাপাপী কালী ডাক্তারের পরলোকগত আত্মাকে ভীষন নরক যন্ত্রনায় হস্ত হইতে নিস্কৃতি প্রদানে সক্ষম হইয়াছিল কিনা বলিতে পারিনা।

কিসে সুখ।

(লেখক।—শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর।)

—:o:—

হে পুষ্পলাব (ফুলমালী), তুমি অতি প্রত্যুষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া লোহিত নয়নে ডালা হস্তে এদিক্ ওদিক্ বনে বনে, বাগানে বাগানে ঘুরিয়া নব নব বিকসিত, সুবাসিত, শিশির শীকর সম্পৃক্ত, কুসুম চয়নে নিরত আছ। উদরে ভানুদেবের জানু ভাঙ্গিয়া জয়লাভ করিয়াছ। কুহা-বাসে শীতকে ভেদ করিয়া পদদলে দলিত করিয়া শিশিরাঙ্গে আঙ্গাল করিয়া কত কত জঙ্গল অতিক্রম করিতেছ। আহা, তোমার মন ফুলসঙ্গে রঙ্গে বংশীরবোন্মত্ত কুরঙ্গ সদৃশ নৃত্য করিতেছে। কারণ, যদি আনন্দের অভাব থাকিবে, তবে কাহার মহিমাবলে অম্লানবদনে পদযানে কণ্টক বণ্টন করিয়া কমল বনে করীর ন্যায় কানন দলন করিতেছ? আহা, মানুষের মন মায়ারূপী ছায়াপট! হৃদয় কাননে যখন যে ফুলটী ফুটিয়া হাসে, ও যখন যে কণ্টকটী ফুটিয়ে কাঁদে, ঈষদসচ্ছবদন সরোবরে তাহার আভাস ভাসমান্ বা বিম্বিত হয়। অথবা স্বচ্ছভাভেদে কণ্টকে কুসুম কুসুমে কণ্টক বিপরীত ভাবে প্রতিফলিত ভাবে প্রতিফলিত হইয়া মুকুর ও মুখের সাদৃশ্য সম্পাদন করে। প্রভাশালী অংশুমালী উদয়াচলে চলিত হইয়া অংশুময় নয়ন উন্মীলিত করিয়া পাংশুতমঃ দূরীকৃত করিলে, তাহার উদয় সম্বন্ধে সংশয় সম্ভবে কি? বিকচাকমল কবে শিলীমুখ মুখরুচি সম্পাদন না করিয়া কুমারী জীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে? বদন হৃদয়ের ছায়াভূমি কে অস্বীকার করিবেন? কিন্তু ছায়ার মায়া ও পরিলক্ষিত হয়। লোহিতাম্বর রবি পশ্চিমাম্বরে আশ্রয়াবলম্বন করিলে যেমন ছায়া বিপরীত ভাব ধারণ করে, মুখেও তদ্রূপ কপটতারূপ পশ্চিমাকাশাবলম্বনে মায়াময়ী ছায়া অঙ্কিত হইয়া বন্ধুবান্ধবকে শঙ্কিত করে। যাহা হউক্, তোমার প্রতি অপবাদরূপ প্রমাদপাত করিতে সাহসী হই না। তুমি যথার্থই পুষ্পকানন রূপ সুখকাননে পদচারণ করিতেছ। কণ্টকঘায়ে কত বিক্ষত লোহিত হইয়াও

তৎপ্রতি তোমার দৃক্‌পাত নাই, অশ্রুপাত নাই। পথে পথে শত শত ক্লেশ গিরিসম স্তূপীকৃত, তথাচ তাহা অবলীলাক্রমে অতিক্রম পূর্ব্বক আনন্দের লীলাময়ী ভূমিতে দেবতার ন্যায় অমৃত পূরিত ডালা করে ক্রীড়াময় উৎসাহের মূর্ত্তি স্বরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া বিস্তারিত নয়নে পুলকিত বদনে কিবা অপূর্ব্ব খেলাইনা খেলাইতেছ! দুঃখে বিন্দুমাত্র ক্লেশের আভাস নাই। হে পুষ্পলাব! পুষ্পলাভ তোমার উদ্দেশ্য; প্রসূন প্রাপ্তি তোমায় আনন্দ-শয়ন স্থাপিত। নিদ্রিতের পীড়িত হইলেও পীড়াবোধ বিলুপ্ত হয়। তবে তুমি কি সুখী?—না!

হে পাখিকুল! তপ্ত কাঞ্চন কান্তি ঊষার নবভূষা দর্শন ও তাহার রূপচ্ছটা-ধারে ধীরে ধীরে অবগাহন করতঃ তরুডালে আনন্দ ঢলে ঢলিয়া কল কল রবে কত না গীতি মাধুরী অজস্রধারে ঢালিয়া দিতেছ। ভাল বল দেখি, তোমরা কি সুখী? তোমরা সুখ সুধাপানে আত্ম চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছ কি?—না।

হে চকোর মিথুন! ঐ যে পূর্ণ শশধর বিবিধমণি মাণিক্য খচিত নীলকান্ত মণিময় গগনাসনে আসীন হইয়া সুশীতল কৌমুদী-কল্যাণ সুধা বর্ষণ করিতেছে। আর তোমরা প্রণয়-হেমময়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে সুধাপানে ক্ষুধানাশ করতঃ পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছ। বল দেখি তোমরা সুখের বার্ত্তা জান কি না?—না।

হে অলিগণ! তোমরা গুন্ গুন্ স্বনে কমলাসনে উপবিষ্ট হইয়া মহানন্দে মকরন্দে পান করতঃ তৃষা ক্ষুধা করিতেছ। একবার আমার প্রতি শ্রুতি অর্পণ কর, আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান পূর্ব্বক আমার চিত্ত শ্মশান প্রদীপ্ত হুতাশ শিখা নির্ব্বাপিত কর এবং পরোপকাররূপ মহাব্রত পালন দ্বারা আত্ম কর্ত্তব্যতা সাধন জনিত আত্মপ্রসাদ উপভোগ কর, যাহা কমল মধু হইতে লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ। যাহা স্বর্গীয় অনুপম সামগ্রী—অমরত্ব যাহার ফল,—যাহার কলঙ্ক নাই, বিনাশ নাই,—যাহার তুলনা নাই—যাহা পার্থিব বিষয় সম্ভোগে দুর্ল্লভ! —যাহা এরূপ কার্য্যেই সুলভ! আমার প্রশ্ন এই—তোমরা সুখী কিনা?—না।

আহা! কি আশ্চর্য্য! তোমরা সুখমদে মত্ত হইয়া ক্লেশ তমসে উপেক্ষা করিয়াও ব্রহ্মানন্দ জ্যোতিতে দ্বিদাম্পতিকে পরাস্ত করিতেছ। অথচ আবার

সুখকে স্বপ্নের সামগ্রী বলিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছ! এতদ্বারা কি প্রতীয়মান হয় না যে তোমরা সুখে থাকিয়াও সুখ চিননা অথবা সুখী হইয়াও নিজকে সুখী মনে করনা বা সুখী হইলে সুখী হওনা। জলে ডুবিলাম, অঙ্গে ভিজিলাম না, উদর ভরিয়া ভোজন করিলাম ক্ষুধা গেলনা। এতদধিক আশ্চর্য্য আর কি সম্ভবে?

' হে পুষ্পলাব! হে পাখিকুল! হে চকোর চকোরী! হে ভ্রমর ভ্রমরী! আমার শত শত অনুরোধ তোমরা যথার্থ উত্তরদানে অশান্তির শান্তি সাধন কর। আমার বিশ্বাস তোমরা সুখী। ভোক্তৃভোগ্যের মিলনই সুখ। হে চকোর! তোমার ক্ষুধার সহিত সুধার মিলন হইয়াছে, তাতেও সুখ নাই। তবে কিসে সুখ? সুধার আঁধারে পশিলে কি তোমার সুখ হইবে? তবে তুমি এই কথা বলিতে পার যে সে মিলন ক্ষণস্থায়ী; বটে বটে, সে মিলন ক্ষণস্থায়ী; উহার পরিণাম দুঃখ; সুতরাং এসুখ অনিত্য। স্বীকার করি, কিন্তু তোমারও ভ্রান্তি দেখা যায়। যে হেতু, প্রতিরজনীতে রজনীকান্তের পূর্ণবিকাশ নাই বলিয়াই পূর্ণিমার সুধাকর-সুধাপানে তুমি এত সুখী যে আমার চকোর হইতে বাসনা। ক্ষুধার বৃদ্ধিতে সুধার মিষ্টি, স্বীকার করিও। ক্ষুধা আর বিরহ এক 'কথা। বিরহকে দুঃখময় মনে করিয়াই আমরা সুখেও সুখী হই না। কিন্তু উহাই যে সুখের নিদান তা ভাবিয়া দেখিনা। প্রদীপ্তানলে বারিধারা পতনের নাম সুখ। সে অনল যতই প্রবল হইবে, ততই নির্ব্বাণ জনিত সুখের মাধুর্য্য বাড়িবে। কিন্তু যদি অনুদিন দুঃখ সন্তাপে মলিন হইতে হয়, একটী মাত্র সলিলবিন্দুর সম্বন্ধ না থাকে তবে বল দেখি এতাধিক দুঃখ আর কি আছে?

হে ভ্রমর! সরোজ নিরীক্ষণ করিয়া তোমার হৃদয় সরোজ সমুদ্ভাসিত হইতেছে, সরসী সলিল সদৃশ উদ্বেলিত হইতেছে, আনন্দানিল পরশে লীলা-তরঙ্গে পরিপূর্ণ হইতেছে। আহা, তবু তুমি অসুখী! ক্ষণেকের তরেও শান্তি-দল মধুরিম হৃদয় রক্ষা করিতে অসমর্থ; কারণ অভাব-আলেয়া অদূরে প্রজ্বলিত হইয়া সুখের সময়েও শশাঙ্ক কলঙ্ক সদৃশ ভীতিরেখা উৎপাদন করিতেছে। আহা, জীবন শৃঙ্খলে সুখদুঃখ পর্ব্বস্বরূপ। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। কেবল পরবর্ত্তিত্ব সম্বন্ধ বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। দুঃখের কারণ সুখ,

সুখের কারণ দুঃখ এই রূপ বলাই সঙ্গত। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ এস্থলে স্পষ্টীকৃত। তবে পরিবর্ত্তন সুখের নিদান, ইহা স্বীকার্য্য।

হে বিহঙ্গমগণ। আঁধারে পরিবৃত ছিলে, তাই উষার প্রভাময় হাস্যমুখ নিরীক্ষণে তোমাদের এত আনন্দ, এত সুখ। আহা। কি সুন্দর সম্মিলন! বা পরিবর্ত্তন। আহা। তবে কে সুখী?—যাহার জীবনে পরিবর্ত্তন।

হে মানব! সতত পরিবর্ত্তন পিপাসু হইয়া আছে। নূতন পুরাণ হইয়া যায়। পরিবর্ত্তন চাহি, অর্থাৎ তুমি নবীনত্বের পিপাসু। কিন্তু নূতন যে নূতন থাকেনা। নূতন পুরাণ হয়। এখন উপায়? পরিবর্ত্তের সন্ধিস্থলে তোমার কত বা কৃতার্থতা। বর্ত্তমানাবস্থায় বেশী দিন তৃপ্ত থাকিতে পারনা। দারুণ রোগ এটি। অথবা দেখি প্রয়োগের মূল কোথায়।—কোথা হে সে নৈসর্গিক সম্মিলন? কোথা হে সে সর্ব্বসুখ মণিখনি পরিবর্ত্তন? দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, শীতান্তে নিদাঘ, নীদাঘান্তে শীত সংসার চক্রে ঘুরিয়া বহুল অনুসন্ধানেও আমার ভাগ্যদেশে ভাগ্যদোষে পরিবর্ত্তন বিকর্ত্তনালোক সম্পাত সন্দর্শন করিলাম না। হে বিভিন্ন দেশবাসীন্। আরাধ্য পরিবর্ত্তদেব তুমি কোথায়? একবার সকরুণ হৃদয়ে এদাসের এ দেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া জনমের তরে না হয় আনন্দের ছায়ামাত্র প্রদর্শন করিয়াও অন্তর্হিত হও। তা'হ'লেও লালসা থাকিবে, মনস্কাম পূর্ণ হইবে।—এ কিরূপ পরিবর্ত্তন?—ঘোর পরিবর্ত্তন বা বিপ্লব। যে পরিবর্ত্তনে চিরনবীন বস্তুর আবির্ভাব যাহা পুরাণ সুতরাং পুরাণ হয়না, নিত্য নবীন যাহার নবীনত্ব অবিনাশী, সুতরাং পরিবর্ত্তনের পিপাসা মিটিয়া যায়।

জীবের পিপাসার লক্ষ্য সেইটী, কেবল পথে পথে উদ্ভ্রান্ত হইয়া জীব যা পায় তাই পান করে, মনে করে এতে বুঝি পিপাসা ঘুচিবে। যখন ঘুচে না তখন দ্রব্যান্তরের আশ্রয় লয়। তাতেও তাদৃশ ফল। এইতো জীবের দশা কিছুতেই পিপাসা মিটেনা। দুধের পিপাসা কি জলে ঘুচে? চাতক যে, মেঘের বারি বিনা পিপাসা মজিবে কেন? সংসার মাটির বারি দিয়া যত প্রকার পার মধুর সরবৎ প্রস্তুত করিয়া পাণ কর তাতে কি হইবে? চাই আকাশবারি। চাই মেঘমধুর শ্যাম সুন্দরের রূপবারি। চাই ব্রজক্ষীরোদোত্থিত মাখন ঘনশ্যাম মাধুর্য্য। এখানেই রোগের মূল নিহিত, এখানেই রোগের ঔষধ নিহিত।

এখন সে বিপ্লব কিরূপ দেখা যাউক্, হে নয়ন, ইন্দু, সিন্ধু, নদ, নদী, গিরি, দরী, সুন্দরী, সাম্বু, জানু অনুদিন দেখিয়াও তোমার পিপাসা যেন অপর কিছুর জন্যে। হে শ্রবণ, নবমেঘগর্জ্জন, ভ্রমরার গুঞ্জন, কোকিলার কলস্বন, বেণু বীণাবাদন অনেক শুনিলে, তবু তোমার ঝোঁক যেন আর কিছু শুনিতে। হে নাসিকে, আতর পোমেটাম্ ল্যাভেণ্ডার ফুলদাম, তোমার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে নাই, তুমি আর কিছুর জন্যে একান্ত লালায়িত। হে রসনে, লাড়ু, মণ্ডা, মেওয়া, মধু, পায়স, পিষ্টক খাদ্য পর্ব্বত প্রমাণ তোমার সেবায় গিয়াছে, তবু বল দেখি, তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন কি হ'য়েছে? তোমার লালাপ্রবাহ কি থামিয়াছে তোমার বাঞ্ছিত যা তা এখনো ঘটে নাই বলিয়া কি চৈতন্য জন্মে নাই? হে অঙ্গ, কোমল শিরীষ কমল মৃণাল অবলা পরশে কি তাপ বিদূরিত হইয়াছে? তাপ জুড়ান বস্তু এখনও ঘটে নাই বলিয়া কি তোমার পিপাসা র'য়েছে না? ইন্দ্রিয়গণ, তোমরা বুঝিয়াছ তোমাদের সাধের বস্তু, তোমাদের যথার্থ লক্ষ্য অস্ফুট বলিয়াই প্রাকৃত দ্রব্যনিচয়ে মজিয়াছিলে। হে মন, এই সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলির তৃপ্তির জন্যে তোমাকে কি করিতে হইবে তা জান? তা না করিলে তোমার নিস্তার কোথায়? তোমাকে একটা কাণ্ড ঘটাইতে হইবে। পরামর্শ শুন;—

প্রাকৃতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্ব্বক অপ্রাকৃতের উদয়ে অভ্যর্থনা কর। ইন্দ্রিয়গতি উল্টাপাকে ফিরাইয়া দাও—নয়ন যাউক্ তোমার সৌন্দর্য্য সিন্ধু কৃষ্ণেন্দুর রূপ-সুধাপানে, শ্রবণ যাউক্ তোমার নিখিল ভ্রমর কোকিলার বীজভূত কৃষ্ণাধরবাণী শ্রবণে, নাসা যাউক্ তোমার সর্ব্বসুগন্ধ-নিদান কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-মৃগমদগন্ধ সম্ভোগে, রসনা যাউক্ তোমার সর্ব্বমিষ্টির সৃষ্টিনিদান কৃষ্ণনাম গুণগানে, তোমার অঙ্গ মাতিয়া থাকুক্ কৃষ্ণের পরমভক্তের শ্রীঅঙ্গের পরশলোভে। সমগ্র বৃত্তি গুলি যদি কৃষ্ণলাগি একান্ত লুব্ধ হইয়া পড়ে, তখন জীব নিশ্চয় বুঝিতে পারে কিসে সুখ। জীব, নির্গুণ গুণাবদ্ধ না হইলে আর সুখ নাই। সুখ কি?—নির্গুণ সঙ্গ। প্রভুগো, কবে হেন অঘটন ঘটাইবে, প্রতীক্ষায় আছি!

"পাগল রাধামাধব" সমালোচনার আলোচনা।*

(লেখক।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেশব লাল সেন।)

——:•:——

ভক্ত কবি শ্রীযুক্ত কালীহর বসু দাদা মহাশয়ের "পাগল রাধামাধব সমালোচনা" প্রসঙ্গে এ অধমের প্রাণে কয়েকটী কথা জাগিয়াছে, তাহারই আলোচনা করিব। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

কালীহর দাদা পাগল রাধামাধবের ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহার সমালোচনা পাঠে মনে হয় কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি সন্দেহের কথা তুলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, পাগলের কথা শাস্ত্রের সূত্রের মত স্বল্প কিন্তু পবিত্র। সে ভাব বুঝিবার আমাদের শক্তি না থাকিতে পারে বা ভাষ্যকার রসিক দাদার ত্রুটী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পবিত্রতা সম্বন্ধে ন্যূনতা হইতে পারে না।

সমালোচনা প্রসঙ্গে কালীহর দাদা একস্থানে লিখিয়াছেন—"রসিক এবং অপর দুই চারিজন বৈ ও দেশে কি এমন মানুষ নাই যাহারা রাধামাধবকে অসাধারণ প্রতিভাবান প্রেমিক ভক্ত মনে করিতেছে।" বলি জগতে হাত পা ওয়ালা মানুষের ত অভাব নাই, কিন্তু পরমহংসদেবের ভাষায় বলিতে হয় "মন

---

* এই যুক্তিস্বাপুষ্ট প্রবন্ধটী, ভক্ত ভাই কেশব লাল, আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন; আমার অনুরোধে, দীনেশ দাদা, উহা প্রকাশিত করিলেন; প্রবন্ধে, কোন দোষ থাকিলে, আমিই তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। পূজ্যবর কালীহর দাদার সমালোচনা পাঠ করিতে করিতে, আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, ভাই কেশব লালের মনেও দেখিলাম সেই সেই ভাবের উদ্রেক হইয়াছে। "পাগল রাধামাধব" সমালোচনা লিখিতে, শক্তিশালী সুলেখক, কালীহর দাদা, যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এ দীনহীন, বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছে। তজ্জন্য, দাদার উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণাম। শ্রীরসিক লাল দে, সোণামুখী, বাঁকুড়া।

হংস" বিশিষ্ট মানুষ জগতে কটী আছে। বিশুষ্টের দ্বাদশ জন শিষ্য ছিল, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব রসের পাত্র কেবল মাত্র সাড়ে তিনজন পাইয়াছিলেন, পূরা চারজনও নয় *

দাদা একস্থানে লিখিয়াছেন "বিজ্ঞানোৎকর্ষকলে যদি পূর্ব্বাবস্থায় আনীত হইতে পারিবে আশা আছে।" উপমেয় ও উপমা একবস্তু নহে, উপমার দরকার ততটুকু—কেবল মাত্র উপমের বস্তু বুঝাইবার জন্য; ঈশ্বরের একটী নাম "অনুপমের।" নিগুর্ণ মহাপ্রভু, কৃপা করিয়া মানবীয় রূপ ধারণ করিয়া থাকেন কিন্তু মানবীয় আত্মা কখনও নিগুর্ণ মহাপ্রভু হইতে পারে না,—ইহাই মায়াবাদ; জীব ও ঈশ্বরের ভেদ্ চিরকাল বর্ত্তমান্।

"এ কথার ভাবার্থ বুঝিতে বড় বড় পণ্ডিতের মাথা ঘুরিতেছে", এ কথাটী ধ্রুব সত্য, যদি পণ্ডিতেরা ইহার ভাবার্থ বুঝিতেন; তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের প্রেম-বন্যায় জগত প্লাবিত হইয়া যাইত। অন্যের কথা কি বলিব, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিরও এক সময় মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। অন্যে পরে কা কথা।

কলিযুগের যুগধর্ম্ম, নাম সঙ্কীর্ত্তন, ইহা ত্যাগ করিয়া যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি করিলেই অপরাধ করা হয়। যাগ যজ্ঞকারী পুণ্যবানেরা, নামাপরাধী।

সমালোচনাতে বলিয়াছেন "জপতপকারী ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষী পুণ্যও হইতে পারেন।" "নাহি চান তাঁরা ব্রজের মাধুর্য্য" আমরা এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ হয়তো চান।" জপতপ বিধি মার্গের সাধন, ব্রজের মাধুর্য্য চাহিতে হইলে রাগে আসিতে হইবে।

"রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়॥" শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা।

---

* লেখক মহাশয় কি পাগল রাধামাধবের খুব অন্তরঙ্গ ভক্ত (রসের পাত্র) হইতে পারিয়াছেন? হইলেও প্রকাশ করা যে অভিমান বলিয়া মনে হয়। আর এক কথা স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সামান্য (অভিমানযুক্ত) মানবের তুলনা করিতে যাওয়া যে ঘোর অপরাধ। তবে যদি পাগলের ভক্তগণ পাগলকে আধুনিক অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত ভগবান করিয়া তুলিতে চাহেন তবে আমরা কিছু বলিতে চাহিনা কেননা "যার যেই ভাব সেই সে উত্তম।" (পরিদর্শকগণ।)

কোন জিনিষ চাহিলেই পাওয়া যায় না, পাইবার পথে চলিতে হয়।

"সত্যযুগ হইতে অসংখ্য যুগে মহাপাপ করিয়াছ, সেই পাপ স্মরণ করিয়া—" এস্থলে সন্দেহের কোন কারণ নাই, ইহাতে পাপের গুরুত্ব বুঝান হইয়াছে। আমরা ক্ষীণজীব নই, "নিত্যদাস"—ভুলিয়া যাওয়ার ফলেহ মায়ার বন্ধনে পড়িয়াছি। এখানে গরব" তুহার গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তুহার রূপে।" মানবের নিকট সত্যযুগ হইতে কলিযুগ অনেক কাল কিন্তু জীবাত্মার নিকট বেশী নহে। সংসার যন্ত্রনায় নিত্যই পাপ স্মরণ হয়। "কেহই পুণ্যবান নহে" এ ভাবে অহঙ্কার নষ্ট হইবে ও দীনতা আসিবে—মুক্তাত্মা পুরুষদের কথা স্বতন্ত্র।

"প্রেমের সাধন গৃহীর (ই) হইতে পারে, সন্ন্যাসীর পক্ষে দুরূহ।"—সমালোচনায় ভুল ক্রমে (ও) ছাপা হইয়াছে। "সন্ন্যাসী" শব্দে সন্ন্যাস আশ্রমকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কেননা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার একস্থানে শ্রীব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেন সুতোৎপত্তি কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥

সন্ন্যাসীগণকে কৃপা করিবার জন্য প্রভু সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন এবং প্রেমের সাধন যে গৃহীরই, ইহা দেখাইবার জন্যই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ দিয়াছিলেন।

"ব্রতাচারাদির ন্যায় নাম" করিলে নামকে ন্যূন করা যায়—নামে অপরাধ হয়, সে জন্য প্রেম হয় না। নিষ্কামভাবে নাম লওয়া ভিন্ন প্রেম হইবার উপায় নাই।

"তিনি আকর্ষণ করিলে বহুজীবের ভূরি লাভ হইত। দীপালোকাকর্ষণে বহু বহু কীট জুটিয়া আত্ম সমর্পণে প্রয়াস পায়।"—ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে। "বিষয়ী যবন যত, তারা হইল উন্মত্ত, না হইল পড়ুয়া অধম।" বহুভাগ্যে জীবের ভক্ত দর্শন হয়।

মহাপ্রভুর সময়ে "হরিভক্তি বিলাস" গ্রন্থের আভাষ মাত্র প্রচলিত ছিল; প্রভু, শ্রীগ্রন্থখান উদ্ধার করিয়া কলির বদ্ধ অল্পায়ু জীবকে বুঝাইলেন—ইহার আচরণ করা বড়ই কঠিন। "দেহ সাধন যোগ্য করিবার জন্য হরিভক্তি বিলাস বিধি অবশ্য প্রতিপাল্য।"—কয়জন হরিভক্তি বিলাসের আচরণ পালন করিতে

পারেন? হরিভক্তি বিলাসের মতে সাধন করিতে যাইলে তাহার নিয়ম পালন না করিলে অপরাধ হইবে।

"বিধি" অর্থে নিয়ম; কলিযুগের বিধি, হরিনাম সংকীর্ত্তন। এই হরিনাম সংকীর্ত্তন, নিয়ম ও অনুরাগ দ্বারা সাধন করা যায়। অজ্ঞানান্ধ জীবকে প্রথমে নিয়মিত ভাবে সংকীর্ত্তন করিতে হইবে, পরে অনুরাগ হইলে আর নিয়মের প্রয়োজন থাকে না।

"সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

বিধিমার্গে "ব্রজভাব' অর্থাৎ মাধুর্য্য ভাব বুঝিতে পারা যায় না।

"—বলপূর্ব্বক প্রচার কিরূপ আমরা বুঝি নাই।"—প্রচার জিনিষটাই বলপূর্ব্বক করা হয়। প্রাণ যাহা সত্য বুঝিয়াছে তাহা প্রচারের জন্য আপনা হইতেই ব্যাকুল হয়।. নিজে একলা খেয়ে তত আনন্দ হয় না, বলিয়াই আমার নন্দ-নন্দন যশোদা দুলাল ব্রজ-বালক সঙ্গে গোপাঙ্গনাদের দধি দুগ্ধ বলপূর্ব্বক লুটে খাওয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই ভাবেই বিভোর হইয়া মহম্মদ তরবারি হস্তে লইয়াছিল। তুমি চাহ না, আমি বলপূর্ব্বক দিব,—ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম। তুমি রাজা, অনেক খাইয়া থাকিবে, কিন্তু এমন সুমিষ্ট ফল কখনও খাও নাই, - এই জোর করিয়া খাওয়ান'র নাম—প্রেমধর্ম্ম। শ্রীরাম অবতারে ভক্তা - শবরী জীবনে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত ভাব প্রেমের উচ্চ অবস্থাতেই হইয়া থাকে।

"তবু যান তার ঘর" এ স্বভাব আমরা "রাধামাধবে বেশী দেখিতে পাই না।"—আমরা একটু তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিব 'রাধামাধব" ভারতের সর্ব্বত্র সকলের ঘরে ঘরে গিয়াছিলেন। তিনি প্রায় পাঁচশত টাকার ডাক টিকিট খরচ করিয়া সকলকে পত্র দিয়াছিলেন (রাধামাধব এইরূপে অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন।) নিজে স্বয়ং যাইলে নাম সংকীর্ত্তনের সময়টুকু নষ্ট হয় এবং বৈষ্ণবাপরাধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই দেহ লইয়া যান নাই। একবার "রাধামাধব" জনৈক ভারত বিখ্যাত বৈষ্ণবের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বৈষ্ণব প্রবর দুটী মিষ্ট কথা দ্বারাও

অতিথি সৎকার করিলেন না। এই ঘটনা হইতেই তিনি দেশের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

"মাধুর্য্য ভাব স্ত্রীলোকের অতি সহজ"— কারণ মাধুর্য্য ভাবেই তাঁহারা সৃষ্টি হইয়াছেন, অনুরাগী ভক্তের সহবাসে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ততা সম্ভবে না, আর পাগলের কোন সম্প্রদায় হইতে পারে কি? "পাগল সাজা হয় না।" ৩৮ পৃষ্ঠার বাউল শব্দের অর্থ নকল বাউল।

নিজেকে "বৈষ্ণব" বলিয়া পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা, বৈষ্ণব হইব বলিয়া সাধ করি, এই ভাবটী আরও উচ্চ, ইহার নির্দ্দেশ শ্রীমুখের বাণীতেই পরিস্ফুট।

"বৈষ্ণব হইব বলি মনে ছিল সাধ।
তৃনাদপি শ্লোকেতে পড়ি গেল বাধ॥"

দাদা একস্থানে লিখিয়াছেন "বৈষ্ণব বেশ ভদ্রবেশ মাত্র, কোন ধর্ম্ম চিহ্ন নয়। কালে উহা ধর্ম্মচিহ্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে"— ধর্ম্মের চিহ্ন কল্পিত নয়, "বিনা ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রেন" ইত্যাদি অনেক শ্লোক শ্রীশিব পুরাণ প্রভৃতি অনেক শ্রীগ্রন্থে আছে। উপাসনা ভেদে নানান্ চিহ্ন হইয়াছে যদি কল্পিত হইত তবে শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ থাকিত না। আত্মতত্ত্ব না জানিয়া ধর্ম্মের চিহ্ন ধারণ করা মহাপাপ। বি, এ, পাস না করিয়া, নিজের নামের সঙ্গে ব্যবহার করিলে জেল হয়। মালা তিলক বিনয় বা দীনতার চিহ্ন নয়, লোক সম্মান আদায় করিবার চতুরতা। তবে যদি বলেন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বা শ্রীবাস আচার্য্য প্রভৃতি, ভক্ত-বৃন্দ "বৈষ্ণব চিহ্ন" ধারণ করিতেন, সে সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদের মত পাপীকে ধরা না দিলে আমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিতাম না। দাদা বলিয়াছেন, "এসবে বেশী আসিয়া যায় না।"—"পাগল রাধামাধব" ইহাতে অনেক ক্ষতি দেখিয়াই এ বিষয়ে এত আলোচনা করিয়াছেন। তর্কের খাতিরে যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে ইহা কল্পিত, কিন্তু পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর হইতেছে। যদি শিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজ এই চিহ্ন ব্যবহার উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে কপটাচারীর দল আপনা হইতে ত্যাগ করিবে। তখন মালা তিলক দেখিয়া ধার্ম্মিকতা বুঝা যাইবে না; দীনতাই বৈষ্ণবের লক্ষণ।

মালা তিলকধারী চোর দেখিলে প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে; সাধুর বেশ ধরিয়া মিথ্যাকথা বলা মহাপাপ। মালা তিলকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে।

মালাতিলক বিধি মার্গের, তাহা হইলে হরিভক্তি বিলাসের মতে চলিতে হইবে, সেবাপরাধের ভয় পদে পদে; যেখানে পদস্খলনের এত ভয়, তাহাপেক্ষা সরল পথে যাওয়াই ভাল।

"স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নাই গোচারণ লীলা।
স্বয়ং শ্রীমতীর নাই বিরহের জ্বালা॥

নিত্যধামের—নিত্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বৃন্দাবন লীলা; নিত্য-কৃষ্ণের গোচারণ লীলা নাই। নিত্য রাধা, নিত্য-ধামে নিত্য-বৃন্দাবণ লীলা করিতেছেন; তাঁহার বিরহ নাই। ভূ-বৃন্দাবনে নিত্য-বৃন্দাবনের আভাষ মাত্র। ভূ-বৃন্দাবনে আসিয়া আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে মানবীয় মূর্ত্তিতে অনেক অবতারের কার্য্য করিতে হইয়াছিল —

"নারায়ন চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥"

শ্রীচরিতামৃত, আদিলীলা।

"দেহ দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ।"

একথা পূর্ণ সত্য, তাঁহাদের দেহ আমাদের মত জড় মাংস পিণ্ড নয়, এ ভাবের কথা না লিখিলে অজ্ঞান জীব ব্রজবাসীকে আমাদের মত মানুষ ভাবিত। অজ্ঞান জীব কি কখন ব্রজলীলা দেখিতে পায়; ব্রজবাসীর নিত্যদেহ। লীলাময় কৃপা করিয়া নিত্য বৃন্দাবন লীলা ধরাধামে করিয়া বিস্মৃত জীবদিগকে পূর্ব্বস্মৃতি উদ্দীপন করিয়া দিলেন যে এ লীলা স্মরণ ও চিন্তনে, তাহাদের নিত্যানন্দের কথা মনে পড়িবে। ভূ বৃন্দাবন লীলা নিত্য-বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইবার সাধনের আদর্শ। সে জন্যই দয়াল প্রভু রাধার ভাব ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রিয় বিচ্ছেদে কেমন করিয়া কাঁদিতে হয় বিরহের ভাব শিখাইবার জন্য নিজে আদর্শ আচরণ করিয়া দেখাইলেন। প্রভু আদর্শ আচরণ করিয়া না শিখাইলে এ অধম জীবকে কে শিখাইবে? অন্তরে মিলনের আনন্দানুভব জনিত আনন্দ, বাহিরে বিরহের জ্বালা। "যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার," "প্রেমসিন্ধু মগ্ন রহে কভু ডুবে কভু ভাসে," "নাচে গৌর পা[illegible]" ইত্যাদি বিরহ মিলনের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে মিলন না হইলে বিরহের ভাব কখনও হৃদয়ে উৎপন্ন হইতে পারে না। পরে "মিলন ও বিরহ" এ দুটী ভাব হৃদয়ে একসঙ্গেই হয়, যেমন গোলাপ দেখিলে তাহার রূপ ও গন্ধ বা গোলাপের গন্ধ প্রাপ্তির আনন্দও এখন ভোগ করিতে পারিতেছি না তজ্জন্য দুঃখ মনে আসে। কিন্তু যে গোলাপ কখন দেখে নাই বা তাহার গন্ধ গ্রহণ করে নাই, তাহার মনে প্রাপ্তির আনন্দ বা অপ্রাপ্তিতে দুঃখের ভাব হৃদয়ে উৎপন্ন হয় না। আমাদের মিলনের আস্বাদ করা আছে তাই বিচ্ছেদে বিরহ হইতেছে; প্রাণে বিরহ জাগিয়াছে আবার মিলন হইবে, তাহারই সূচনা। মিলনের আনন্দ একটু চিন্তা করুন, তাহা হইলেই বিরহের ভাব আপনা হইতেই উঠিবে। যাহার বিচ্ছেদে প্রাণ যত কাঁদে তাহাকে পাইলে হৃদয়ে তত বেশী আনন্দ হয়—প্রেমের ইহাই ধর্ম্ম। অনিত্য দেহে কাঁদ, নিত্যদেহে চিরানন্দ ভোগ কর। বীজের মত গলে যাও, বৃক্ষ হ'য়ে ফল ফুলে সুশোভিত হও। বীজের পুলকিত ভাব বা রোমাঞ্চ অঙ্কুরে হাস্য বিকসিত পুষ্পে ও আনন্দাশ্রু পুষ্পের মধুরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এ জড় অনিত্য দেহে পূর্ণানন্দ ভোগ হইতে পারে না, তজ্জন্য এ দেহে বিরহ যাতনা ভোগ করিতে হইবেই হইবে। যত বিরহ হইবে, ততই মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিবে এবং পূর্ণ মিলনানন্দ ভোগ করিবার নিত্যদেহ গঠিত হইবে। ইহাকেই বলে "বিষামৃতে একত্র মিলন।" নদীর গতি যে স্থানে বাধা পায় তথায় জল বেশী সঞ্চিত হইয়া প্রবল স্রোত সৃষ্টি করে, সেইরূপ মায়ার বাধাতে প্রেমের স্রোত আরও বৃদ্ধি হইয়া প্রেম সমুদ্রের দিকে ছুটে। ইহাই উপাসনা তত্ত্ব। এ রহস্য প্রেমিক সঙ্গ বিনা বুঝা যায় না। আত্মজ্ঞান হইলেই মানব আনন্দামৃতের ডুবিয়া যায়, তখন বিরহ থাকে না। কিন্তু এ জড় অনিত্য দেহ লইয়া সে আনন্দ ক্ষণমাত্রও ভোগ করিতে পারা যায় না। দেহেরই বিরহ হইয়া থাকে, যেমন রোগ, শোক, হর্ষ, দুঃখ দেহেরই হইয়া থাকে, আত্মার নয়। আত্মা নিত্য, আত্মাই নিত্য-আনন্দ ভোগ করিতে পারে। আত্মজ্ঞান হইলেই নিত্য-ধামে স্থান হয়।

"আত্মরক্ষা জীবে দয়া" এর সূক্ষ্মতাৎপর্য্য—পাগলের ভাবে ভাবিত না হইলে বুঝিতে পারা যায় না।

"সহজ ভজন" লিখিয়া বুঝাইবার জিনিষ নয়; প্রেমিক পাগলের কাছে দেখিতে পাওয়া যায়, হৃদয় পবিত্র হইলে অনুরাগে অনুভব হয়। তবে এই সাধন পথে যাইতে হইলে প্রথমে নিজেকে "পতিত ও শরণাগত হইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে হইবে।"

দাদা লিখিয়াছেন "গৌরাঙ্গ গুরুরূপ, রাধাকৃষ্ণ ইষ্টরূপ"—গুরু ও ইষ্টে ভিন্ন দেখাই অপরাধ।

শ্রীরাধামাধব একজন রাগমার্গের উচ্চতম ভক্ত ও শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তাঁহাকে জানিতে হইলে বিধির মাপকাটীতে মাপিলে চলিবে না। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" আস্বাদন করিবার উপায় জগতের লোক ভুলিয়া যাওয়ায়, তাঁহার গ্লানি দুর করিবার জন্য শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরাধামাধব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন*—এ ভাব বুঝিতে হইলে তাঁহার অমিয় মাখা বচনাবলী পাঠ করুন। আজ এ অধম এইখানেই বিদায় লইল। যদি বোবার অস্ফুট ধ্বনি আপনারা স্নেহ করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করেন। আজ্ঞা হইলে এ দাস সে বিষয়ে সাধ্যমত যত্নের ক্রটী করিবে না, ফলাফল—শ্রীগৌরাঙ্গ জানেন।

আনন্দ-নগর।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত, উকীল।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:•:—

এখানে প্রণয় চন্দ্র ও আনন্দ কুমারী আপনাদের বাটী নানাবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন। নববধুর সমাগমে ক্ষমা দয়া সরলতা প্রভৃতি পুরনারীগণ মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। আনন্দ কুমারী নব বধুর মুখ চন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহ

---

* এই কথাটী পাগলের ভক্তবৃন্দের নিকট যেমনই বোধ হউক না কেন আমরা কোন মতেই ইহা স্বীকার করিতে পারি না, লেখক কি দেখিয়া পাগলকে এত উচ্চ আসন প্রদান করিলেন জানিতে পারিলে ভাল হয়, রিতিমত প্রমাণ দেখিবার ইচ্ছা করি। শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যা তিনি উত্তম করিতে পারিতেন বলিয়াই তাঁহাকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর আসন দিতে পারি না। (পরিদর্শক)

মধ্যে প্রবেশ করিলেন নববধূর সদ্‌গুণ রাজি কিছু কাল মধ্যে আনন্দ কুমারীর চিত্ত আকর্ষণ করিল। তিনি বধূমাতার গুণে মোহিত হইয়া পড়িলেন। দেব প্রকৃতি বধূমাতা ক্রমে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর হস্ত হইতে সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের ভার একে একে লইতে লাগিলেন। শ্বশুর ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী বধূমাতার সেবা ভক্তি ও যত্নে পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তাহাদের যাহা কিছু দিবার ছিল সমস্তই দিয়াছিলেন। অবশেষে মনের আবেগে পুঞ্জ পুঞ্জ আশীর্ব্বাদ তাঁহারা তাঁহার উপর বর্ষণ করিয়াছিলেন।

এদিকে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল সেবা সুন্দরীর গর্ব্ভে প্রেম চন্দের এক অসামান্যরূপ লাবণ্য সম্পন্না কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কন্যাটীর নাম মহাভাব সুন্দরী। প্রেমচন্দ ও সেবা সুন্দরী এই কন্যা রত্ন লাভে পরম সুখানুভব করিয়াছিলেন। এই কন্যার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রেমে গঠিত। ইহার মন বুদ্ধি প্রেমময় এবং কার্য্য ও চিন্তা প্রেম মূলক। ইনি স্থির প্রেমানন্দ স্বরূপিনী। শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ্য লইয়া ইহার জন্ম পরিগ্রহ। ইহার কার্য্য ও চিন্তায় কোন রূপ চাঞ্চল্য বা উদ্বেলতা পরিলক্ষিত হইত না। ইহাকে লাভ করা সহস্র ভগবৎ প্রেমিকের মধ্যে একজনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। ইনি মহাভাবে অন্তরে ভগবৎ প্রেম সুধা পান করিতেছেন। সুধার অবধি নাই, পানও দিবানিশি চলিতেছে কিন্তু তথাপি পিপাসার নিবৃত্তি নাই। ভগবান্ প্রেমসুধা যেন তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিতেছেন তিনি স্থিরভাবে যেন তাহা নিরবধি পান করিতেছেন। এখানে বিচ্ছেদ বা বিরহ নাই। ভগবান্ মহাভাবময়ীর নিকট দাস বা ঋণীর ন্যায় সদাই সন্ত্রস্ত। পরম আনন্দময় নিত্য তাঁহার নিকট উপস্থিত। এখানে নিত্য মিলন। মহাভাব-ঘনীভূত প্রেমস্বরূপ-প্রভাব শ্রীরাধায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এ ভাব হৃদয়ের অন্তস্থলে বিরাজ করে; তথায় সেবা ও মধুর রসের আস্বাদ চলিয়া থাকে; বাহ্যিক সেবা বা মাধুর্য্যের আস্বাদ ইহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এই মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার প্রেমে ভগবান্ আত্মহারা, তাঁহার দেহ গ্রন্থি শিথীল হইয়া পড়ে তাই পায়ের উপর পা জড়াইয়া, কটী ও গ্রীবার গ্রন্থি শিথীল হইয়া পড়ায় ত্রিভঙ্গ হইয়া রাধা সন্নিধানে বিদ্যমান। শ্রীরাধা সন্নিকটে মহাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে তিনি সেই মহাপ্রেমের বন্যায়

স্থির থাকিতে পারেন না তিনি ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়েন, অত্যস্থিত যশতঃ বেণু হইতে কেবল মধুর রাধানাম ধ্বনি নিনাদিত হয়। তখন তিনি জ্ঞান হারা, যথাবিধি অন্য সঙ্গীত গাইতে তাঁহার সাধ্য থাকে না। মহাভাবময়ীর এই মহাপ্রেম লাভে ভগবান্ নিত্য লোলুপ। বাহ্যিক ব্যাপারে তিনি নানাস্থানে বিচরণ করিতেন নান বিধ অলৌকিক কার্য্য করিতেন কিন্তু যেখানে শ্রীরাধার বাস সেই মধুর বৃন্দাবন ধামে না আসিলে শ্রীরাধার অন্তরে প্রবেশ করিতেন উভয়ে আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতেন। এই কারণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেন "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদ মেকং ন গচ্ছামি।" এইরূপ ভাব মহাভাব সুন্দরীর চিত্তে নিত্য জাগরূক। শ্রীরাধার নিষ্কাম সেবা ও প্রেম মহাভাবে পর্য্যবসিত। শ্রীরাধা সেবা সুখে সুখিনী ভগবান্ সেই মহাপ্রেমে উম্মাদী। মহাভাব সুন্দরী অতীব গম্ভীরা। সেই মাধুর্য্য পূর্ণ গম্ভীরাকৃতির মধ্যে কি আনন্দের খেলা যে চলিতেছে জীব যদি তাহার এক কণার আস্বাদ পায় তবে না বলিতে পারে সে আনন্দ কি প্রকার? অন্যথা তাহার পরিচয় দিতে জীবের সাধ্য নাই। ইহাঁর চিত্ত আনন্দময় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছেন এচিত্তে অন্য কিছুরই সমাবেশ হইবার স্থান নাই।

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ।)

ভবনগরে স্বার্থরাজ নামক প্রবল পরাক্রান্ত এক দুর্দান্ত রাজার বাস। ভবনগরই তাঁহার রাজ্য। এই নগরের অধিবাসীগণ তাঁহার প্রবল প্রতাপে সদাই সন্ত্রস্ত। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার কাহারো সাধ্য নাই। যিনি তাঁহার নিদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে অণুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করেন তাঁহার আর রক্ষা নাই। স্বার্থরাজ তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। অন্য কোন অধিবাসী তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে সাহসী হন না হইলে তাঁহাকে দুর্দ্দশার একশেষ ভোগ করিতে হয়। এই সকল কারণে কেহই তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করেন না। সুতরাং স্বার্থ রাজের অভীপ্সিত কার্য্য অবাধে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

স্বার্থরাজ অতি দুর্বিনীত, তাঁহার হৃদয়ে দয়া মায়া কিছুমাত্র নাই। তিনি নির্ভয়ে সুখ স্বচ্ছন্দের আশায় অতি ভীষণ নৃশংস কার্য্য করিতে ক্লেশ বোধ করেন না। তাঁহার ভয়াবহ কর্ম্ম কাণ্ডের বিষয় স্মৃতি পথে উদিত হইলে

হৃদয় কম্পিত হয়। নিজের সুখ সম্পত্তি কিসে বৃদ্ধি লাভ করিবে সেই চিন্তা, সেই চেষ্টা স্বার্থরাজের চিত্তে সদাই জাগরুক। নিষ্কাম পরহিত কার্য্য তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। স্বার্থরাজের সহধর্ম্মিনীর নাম কামনা সুন্দরী। উভয়ের মনের ভাব একরূপ, উভয়ে পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। উভয়ের চক্ষু রক্তবর্ণ ও আতঙ্কপ্রদ। যাহার উপর তাঁহাদের বিষময় দৃষ্টি পড়িবে তাহার আর নিস্তার নাই, তাহার প্রতীকারের কোন্ উপায় নাই। কামনা সুন্দরীর কামনার শেষ নাই। তাঁহার কামনা পরিতৃপ্তি সাধনে স্বার্থরাজ নিরন্তর সচেষ্ট। প্রভুর কার্য্যে সহায়তা করা ব্যতীত ভৃত্যগণেরও অন্য উপায় ছিল না। প্রতি নিয়ত অত্যাচার প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের আর্ত্তনাদে ভবনগর ঘোরতর বিষাদ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বার্থরাজের মনের ভাব ও কার্য্য প্রণালী ক্রমে ক্রমে তাঁহার অসংখ্য প্রজার মধ্যে সংক্রামিত হইয়া উঠিল। তখন অত্যাচারী ও অত্যাচার পীড়িত বলিয়া দুইটী পৃথক দল রহিল না। যিনি এক সময়ে অত্যাচারী অপর সময়ে তিনি অত্যাচার পীড়িত। যিনি এক সময়ে অত্যাচার পীড়িত অপর সময়ে তিনিই অত্যাচারী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যিনি এক সময়ে অত্যাচার পীড়িত তিনি যখন অত্যাচার করিতেন সেই সময়ে অত্যাচার পীড়িত হইলে যে ক্লেশ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা একবারও তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত হয় না। স্বার্থ সকলকেই প্রায় অত্যাচারী করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ কর্ম্ম কাণ্ডের নিয়ত অনুষ্ঠানে ভবনগর যার পর নাই বিভীষিকার স্থান হইয়া উঠিল।

কামনা সুন্দরীর গর্ভে স্বার্থরাজের বহু পুত্র ও বহু কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের পরিচয় দেওয়া বহুল ব্যাপার। অনাবশ্যক বোধে সকলের পরিচয় দেওয়া হইল না। যাঁহারা প্রধান ও সর্ব্বজন বিদিত তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল। স্বার্থরাজের জেষ্ঠ পুত্রের নাম অত্যাচার। ইহার শারীরিক বল অপরিমিত। ইনি অতি দুর্ম্মুখ, নির্দ্দয় ও পরপীড়ক। ইহার ভ্রূ কুঞ্চিত, নেত্র যুগল রোষ কষায়িত এবং মুখভঙ্গী অতীব ভীষণ। সদাই মল্লবেশ, পরিধান রক্ত বস্ত্র। গুণের মধ্যে ইনি বড়ই পিতৃভক্ত, পিতার উদ্দেশ্য পালন করিতে একান্ত যত্নশীল সুতরাং অতি প্রিয়। ইহার স্বর অতীব কর্কশ, স্মরণ করিলে জীবের আতঙ্কের উদয় হয়। স্বার্থরাজের দ্বিতীয় পুত্রের নাম অবিচার। ইনি এক দিকে স্বার্থরাজের স্বার্থ অপর দিকে অন্য লোকের

স্বার্থ নিয়ত তৌল করিতেছেন। যখন স্বার্থরাজের স্বার্থ অতিশয় ঝুলিয়া পড়িল এমন কি অপর লোকের স্বার্থ, স্বার্থরাজের স্বার্থের ঠিক ঊর্দ্ধে উঠিল, তখন তৌল ঠিক হইল বলিয়া ইনি প্রকাশ করিলেন। তৌল যন্ত্রের দুই দিক সমসূত্রে থাকা ইহার বিচার সঙ্গত নহে। স্বার্থরাজের নিকট ইহার সুবিচারের বড়ই প্রশংসা। ইনি আপন মনে তৌল করিতেছেন অপর লোকের কোন কথায় কর্ণপাত করেন না। স্বার্থরাজের অর্থের ইনি পরিপুষ্ট, শরীর স্থূল। ইহার বিচার দর্শনে লোক সকল ব্যতিব্যস্ত ভয়ে সশঙ্কিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নিয়ত আর্ত্তনাদ করিতেছে। স্বার্থরাজের তৃতীয় পুত্রের নাম লোভ। ইহার আকৃতি বড়ই বিষদৃষ্টি। হস্তপদ অন্যান্য অবয়বের পরিমিত নহে, উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। উদর অতি বিশাল ও বহু দ্রব্যের আশ্রয় স্থল। মুখ বিবর অতি বিস্তীর্ণ, দন্ত দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ। সংসারে যাহা কিছু লোকের ব্যবহার্য্য তৎসমস্ত গ্রাস করিতে তিনি সতত লোলুপ। তাঁহার মুখব্যাদান দেখিলে আতঙ্কের উদয় হয়। ইহার ভয়ে লোক সকল আপন আপন দ্রব্য সর্ব্বদা লুক্কায়িত রাখিয়া থাকেন। এই পুত্রটী স্বার্থরাজের অতি প্রিয়, তিনি প্রাণসম ইহাকে ভালবাসেন। তিনি যখন যে অভিলাষ করেন স্বার্থরাজ তাহা পূরণ করিতে বদ্ধ পরিকর। ইহার লালসার সীমা নাই। ইহার অপর দুই সহোদর ইহার লালসা তৃপ্তি বাসনায় আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য নিয়ত অনুষ্ঠান করিতেছেন। স্বার্থরাজের চতুর্থ পুত্রের নাম ক্রোধ। ইনি ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিতান্ত প্রিয় ও অনুগত। ইহার শরীর লোহিত বর্ণ। দন্ত সদাই কট্ মট্ করিতেছে। লোচন যুগল লোহিত বর্ণ। কপালের মাংস চারিটী রেখায় বিভক্ত। ভ্রূভঙ্গী আতঙ্ক প্রদ। প্রকাণ্ড গুম্ফ ও শ্মশ্রু। শরীর অতি বিশাল। কর্কশভাষী। তাহার অশ্লীল কথা সদা বিদ্যমান। স্বার্থরাজের কোন কার্য্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা দেখিলে অমনি অনল শিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। লোক সকল ইহাকে দেখিলে ভয়ে সন্ত্রস্ত। যিনি ইহার কোপে পড়িবেন তাঁহার আর নিস্তার নাই। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সর্ব্বদাই ইহার সাহার্য্যার্থ উপস্থিত। উভয় সহোদর একত্র হইয়া তাঁহার উপর নানা বিভীষিকাময় কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ধন প্রাণ উহাদের ক্রীড়ার বিষয় হয়। লোক সকল এই সমস্ত ব্যাপার জানিয়া স্বার্থরাজের সুখের অন্তরায় হইতে অণুমাত্র বাসনা করেন না।

স্বার্থরাজের জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম অশান্তি। সম্পত্তি যতই বৃদ্ধি হইতেছে, ততই তাঁহার লালসা বৃদ্ধি হইতেছে তাঁহার হৃদয়ে শান্তি নাই। অপরের সুখ স্বচ্ছন্দ তাঁহার নিকট বিষময়, তিনি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। স্ত্রীজন সুলভ লাবণ্য বা বশনীয়তা ইহার অঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় না। অসহ্য ক্লেশ তিনি মনে মনে সদাই ভোগ করিতেছেন। স্বার্থরাজের দ্বিতীয় কন্যার নাম দুর্ভাবনা। ইহার মন সদা বিষণ্ণ। মুখে একটা কালিমা পড়িয়াছে। মুখ দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। রাত্রিদিন নিদ্রা নাই। তাহার বাসনা জীর্ণ হয় না। শরীর ক্রমশঃ ক্ষীন হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। স্বার্থরাজ যতই আপন কার্য্য সুসিদ্ধ করুন না কেন, তিনি আপন কন্যা দুর্ভাবনাকে নির্ভাবনা করিতে পারিলেন না। স্বার্থরাজের তৃতীয় কন্যার নামে হিংসা ইনি স্বভাবতঃ অতি কুটীলা ও পরশ্রীকাতরা। হৃদয় সর্ব্বদা অসহ্য অনলে পুড়িতেছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহা ভস্মীভূত হইতেছে না। ইহার দন্ত অতি তীক্ষ্ণ ও বিষময়। দন্তের আকার সন্দংশের ন্যায়। যাহাকে ইনি দন্তাঘাত করেন, তাহার মাংস কতকটা কর্ত্তিত হয় এবং কতকটা শরীর হইতে ছিন্ন হইয়া ইহার দন্তের সহিত বহির্গত হয়। ইহার দংশনে জীব অসহ্য জ্বালায় চট্ ফট্ করিয়া থাকে। ইহার শরীর দেখিলে ঘৃণার উদয় হয়। ইহার নখে ও দারুণ বিষ। স্বচ্ছন্দতা, ইহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। স্বার্থরাজের চতুর্থ কন্যার নাম নীচাশয়তা। ইহার চরিত্রে, ইহার কার্য্যে কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই। প্রহার কর গালি দেও কিছুতেই ইহাকে আপন পালনীয় কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে না। যত প্রকার জঘন্য কার্য্য আছে ইনি তাহা সম্পাদন করিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিতা হন না। তাঁহার বা তাঁহার আত্মীয়গণের স্বচ্ছন্দ হইল এই জ্ঞানই তাহার সুখ এবং এই জ্ঞানই তাহার সচ্ছন্দ। এই কন্যার শরীর হইতে প্রতিনিয়ত একপ্রকার পুতিগন্ধ উদ্গত হইতেছে। ইহার নিকটে কেহই বাস করিতে পারেন না। সকলেই ইহার সঙ্গ পরিহার করিতে একান্ত যত্নশীল।

ক্রমশঃ—

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

লোকো যুক্ত ইত্যর্থঃ। ন চাবিদ্যা কৃতত্বাদ্ব্যবহারিকোহয়ং ভেদঃ সর্ব্বজ্ঞে ভগবত্যবিদ্যাযোগাৎ। ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্যেত্যাদিনা মোক্ষেহপি তস্যাভিধাস্যমানত্বাচ্চ। ন চাভেদজ্ঞস্যাপি হরের্ব্যাধিতানুবৃত্তিন্যায়েনেয়মর্জ্জুনাদি ভেদদৃষ্টিরিতি বাচ্যং তথা সত্যুপদেশাসিদ্ধেঃ। মরুমরীচিকাদাবুদক বুদ্ধির্ব্বাধিতাপ্যনুবর্ত্তমানা মিথ্যার্থবিষয়ত্বনিশ্চয়াম্নোদকাহরণাদৌ প্রবর্ত্তয়েদেবমভেদবোধবাধিতাপ্যনুবর্ত্তমানার্জ্জুনাদি ভেদদৃষ্টিস্তত্ত্বনিশ্চয়াম্নোপদেশাদৌ প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি। যৎ কিঞ্চিদেতৎ। নন্বু ফলবত্যজ্ঞাতেহর্থে শাস্ত্রতাৎপর্য্যবীক্ষণাৎ তাদৃশোহভেদস্তাৎপর্য্য বিষয়ঃ বৈফল্যাজ্জ্ঞাতত্বাচ্চ ভেদস্তদ্বিষয়ো ন স্যাৎ কিন্তুক্তো বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতীত্যাদি শ্রুত্যর্থবদনুবাদ্য এব স ইতি চেন্মন্দমেতৎ। পৃথগাত্মানং প্রেরিতরঞ্চ মত্বা জুষ্টংস্ততস্তেনামৃতত্বমেতীত্যাদিনা ভেদ এবামৃতত্বফল শ্রবণাৎ। বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকতয়া লোকে তস্যাজ্ঞাতত্বাচ্চ। তেচ ধর্ম্মা বিভুত্বাণুত্বস্বামিত্ব ভৃত্যত্বাদয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যা মিথো বিরুদ্ধবোধ্যাঃ। অভেদস্তুফলস্তত্র ফলানাঙ্গীকারাৎ। অজ্ঞাতশ্চ শশশৃঙ্গবদসত্ত্বাৎ। তস্মাৎ পারমার্থিক স্তদ্ভেদঃ সিদ্ধঃ ॥১২॥

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

তত্র সেনয়োর্ম্মধ্যে বান্ধবাদি মোহজাল সংবৃতং বিষীদন্তমর্জ্জুনং ভগবানুবাচ। প্রজ্ঞাবাদান্ স্বমনীষোত্থ বচনানি। কথমশোচ্যাঃ। গতাসূন্ কিমিতি নত্বেবাহং। ঈশ্বরনিত্যত্বস্যাপ্রস্তুতত্বাদ্দৃষ্টান্তত্বেনাহ ॥১২॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

শ্রীভগবান আজ অবিদ্যা কল্পিত সেই ভেদ দৃষ্টি স্বীকার করিয়া অর্জ্জুনকে ভেদজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেছেন, ইহাও বলিতে পারা যায় না।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অবিদ্যার সম্ভাবনা কোথায়? যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্ বলিয়া "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যজ্ঞানময়ং তপঃ" ইত্যাদি মন্ত্র শ্রুতি প্রভৃতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যিনি নিজ তেজ দ্বারা সমস্ত অবিদ্যার কাপট্য দূরীভূত

তাৎপর্য্যানুবাদ।

করতঃ বিরাজমান রহিয়াছেন ("ধাম্নাস্বেন সদা নিরস্ত কুহকং") তাঁহার অবিদ্যাশ্রয় কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারেনা। বিশেষতঃ তিনি যখন স্বয়ং বলিতেছেন "আমি যে জ্ঞানের উপদেশ করিতেছি এই জ্ঞান আশ্রয়ে যাহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে তাহারা সৃষ্টি বা নাশ কালে জন্ম বা ব্যথা প্রাপ্ত হয় না।" এখানে মুক্তাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরে বিভেদ অভিহিত হইয়াছে। বেদান্তের "আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্" এই সূত্রে মোক্ষের অনন্তরও জীবের উপাসনার বিষয় উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ "মোক্ষ পর্য্যন্তমুপাসনং কার্য্যমিতি তত্রাপি মোক্ষেচ, কুতঃ হি য- শ্রুতৌ তথাদৃষ্টং শ্রুতিশ্চ দর্শিতা সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তি। মুক্ত [illegible]মুপাসীত" ইতি সৌপর্ণ শ্রুতৌ। তত্র তত্রচ যদুক্তং তত্রাহুঃ মুক্তৈরুপাসনং বিধিফলয়োরভাবাৎ, সত্যং তদাবিধ্যভাবেঽপি বস্তু সৌন্দর্য্য বলাদেব তৎ প্রবর্ত্ততে॥" অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত জীবকে ভগবানের উপাসনা করিতেই হইবে মুক্তাবস্থাতেও উপাসনার বিধি বলিলেন "সর্ব্বদৈন-মুপাসীত" এখানে "সর্ব্বদা" শব্দ প্রয়োগে মুক্তির পরেও উপাসনার বিধি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, মুক্ত জীবের কামনা না থাকায় উপাসনার অহৈতুকতা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু মুক্ত জীব বিধির অতীত হইলেও তাহার নিজের স্বরূপতঃ দাস্য ভাব তাহাকে সেবায় উন্মুখ করিয়া থাকে, তদুপরি আনন্দলীলাময় শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্যাকৃষ্ট হইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

সুতরাং মুক্ত্যনন্তরও উপনিষদাদি শাস্ত্রে যখন উপাসনার ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে, তখন জীব ও ঈশ্বরের বিভেদ কল্পিত বলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারেনা। যদি "বাধিতানু বৃত্তিন্যায়ে" অর্থাৎ মরীচিকায় জল ভ্রম বাধিত হইয়া, মরীচিকা বুদ্ধি হইলেও, পুনশ্চ কখন কখন "কি জানি যদি জল হ'য় এইরূপে যেমন বাধিত জল বুদ্ধির অনুবৃত্তি দেখা যায়। এখানে সেইরূপ ভেদ উপদেশের স্বীকার কোন ক্রমে সঙ্গত হয় না। কারণ জল বুদ্ধি বাধিত হইয়া পুনরায় উদিত হইলেও, উহার মিথ্যাত্ব নিবন্ধন তদ্দেশে জলাহরণ প্রবৃত্তি

তাৎপর্য্যানুবাদ।

হয় না। তদ্রূপ এখানে ও শ্রীভগবানের উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্তিই হইত না, কারণ তত্ত্বজ্ঞ উহার মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে, উপদেশ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেই পারে না। বিশেষতঃ কল্পিত গুরু, কল্পিত শিষ্য, কল্পিত উপদেশ হইতে অকল্পিত নিত্য বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ উপনিষদাদি শাস্ত্রে কৃত কর্ম্মের দ্বারাই যখন নিত্য বস্তুর প্রাপ্তি নিরাশ করা হইয়াছে ("নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন") তখন কল্পিত উপদেশ হইতে যে সেই নিত্য বস্তুর লাভ হইতে পারে না, "কৈমুতিক ন্যায়ে" তাহার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। সুতরাং অভেদবাদীর এই যুক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

বিশেষতঃ "নিত্যোনিত্যানাংশ্চেতনশ্চেতনানাং একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্" যিনি বহুনিত্যেরও নিত্য, যিনি বহু চেতনেরও চেতন, যিনি স্বয়ং এক হইয়াও বহুর কামনা সমুদায় বিধান করিয়া থাকেন। এই শ্রুতি স্পষ্টই জীবের নিত্যত্ব, বহুত্ব, নিয়ম্যত্ব, নিয়ামকত্ব রূপে পারমার্থিক ভেদের উপদেশ করিয়াছেন। যদি বল যাহা অজ্ঞাত এবং যাহার জ্ঞানে কিঞ্চিৎ ফলের সম্ভাবনা আছে, এবম্বিধ তত্ত্বোপদেশেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, যাহা জ্ঞাত তাহার জন্য উপদেশের আবশ্যক হয় না, তাহাতে উপদেশের বৈফল্যই হইয়া থাকে। সুতরাং অভেদ তত্ত্ব যখন আমাদিগের অজ্ঞাত এবং তদ্বিষয়কাজ্ঞানে ফল সম্ভাব আছে, তখন অভেদ তত্ত্বেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ভেদ কাহারও অজ্ঞাত নহে। তথাপি শাস্ত্র যে ভেদের উপদেশ করেন উহা কেবল সূর্য্য প্রাতঃকালে জল হইতে উত্থিত হন, পুনশ্চ সায়ং কালে জল মধ্যে প্রবেশ করেন" ইত্যাকার শ্রুতিবাক্যের ন্যায় কেবল অনুবাদ মাত্র। অভেদ বাদীর এই যুক্তিও নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ "পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে পৃথক এবং তিনি সকল জীবের নিয়ন্তা জানিয়া, তাঁহার সেবা করিলে, সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক জীব অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে।" এই শ্রুতি জীবের ভেদ জ্ঞানেই অমৃতফলের কথা ঘোষণা করিতেছেন।

এই যে ভেদ তত্ত্ব ইহা জ্ঞাত ও নহে, কারণ জীব এতদিন নিজেকে দেহ বলিয়া জানিয়া আসিতেছিল, সে যে দেহ নহে, সে যে পরমাত্মারই চিৎকণা

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

নমু ভীষ্মাদি দেহাবচ্ছিন্নানামাত্মনাং নিত্যত্বেঽপি তদ্দেহানাং তদ্ভোগায়তনানাং নাশে যুক্তঃ শোক ইতি চেত্তত্রাহ দেহিনোঽস্মিন্নিতি। ত্রৈকালিকা

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

নত্বেবেতি। যথাহংনিত্যঃ সর্ব্ববেদান্তেষু প্রসিদ্ধঃ এবং ত্বমেতে জনাধিপাশ্চ নিত্যাঃ। দেহিনোভাব এতত্তবতি। তদেবাসিদ্ধমিতিচেন্ন। দেহিনোঽস্মি-

তাৎপর্য্যানুবাদ।

নিত্য অণু চৈতন্য স্বরূপ, ঈশ্বর বিভু চৈতন্য স্বরূপ, জীব তাঁহার নিয়ম্য তিনি নিয়ামক, জীব সেবক, ঈশ্বর প্রভু, সেব্য এই সকল জীবেশ্বর গত অণুত্ব, বিভুত্ব, ভৃত্যত্ব, প্রভুত্ব, প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় ইহা লোকে অজ্ঞাত। সুতরাং ঐ সকল অজ্ঞাত বিষয় জানিবার শাস্ত্রই একমাত্র উপায়, শাস্ত্রই আমাদিগকে জানাইয়া থাকেন। সুতরাং অভেদ বাদীর পূর্ব্বোত্থাপিত অজ্ঞাতত্ব ও ফলদায়কত্বরূপ যুক্তি বলে ভেদ তত্ত্বেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবধারিত হইতেছে। অভেদ তত্ত্ব অজ্ঞাত হইলেও শশশৃঙ্গের বা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীকত্বেই পর্য্যবসিত হইতেছে, যেহেতু কোন কালেই উহার সত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহার সত্তাই নাই তাহা যে ফলদায়ক নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব জীবেশ্বরের পারমার্থিক ভেদই সিদ্ধ হইতেছে।

মাধ্বভাষ্যের তাৎপর্য্যানুসারেও দেখা যায়, এখানে ঈশ্বরের নিত্যত্ব অপ্রস্তাবিত হইলেও, সর্ব্ববেদান্ত প্রসিদ্ধ আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যেরূপ নিত্য, অর্থাৎ সকল বেদান্তাদি শাস্ত্র সিদ্ধ, তুমিও তদ্রূপ এবং এই সকল জনাধিপ রাজাভিমানী-জীব সকলও নিত্য। অপ্রস্তাবিত হইলেও ভগবান নিজেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপে উপস্থিত করিয়া জীবের নিত্যত্ব অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে বিদ্যমানতার দ্বারা জীবের কল্পিত ভেদ নিরাশ পূর্ব্বক, নিত্য ভেদই সংস্থাপন করিয়াছেন ॥১২॥

শ্রীভগবান দেখিলেন অর্জ্জুনকে আত্মার নিত্যত্বের বিষয় উপদেশ করিয়াও তাঁহার শোক অপনোদন করিতে পারিলেন না, অর্জ্জুনের হৃদয়ের অভিপ্রায়

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ধহবে। দেহা যস্য সন্তি তস্যদেহিনো জীবস্যাস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে ক্রমাৎ কৌমার যৌবনজরাস্তিস্রোঽবস্থা ভবন্তি। তাসামাশু সম্বন্ধিনাং তদ্ভোগোপযুক্তানাং পূর্ব্বপূর্ব্ববিনাশেন পরপর প্রাপ্তৌ যথা ন শোকস্তথৈব তদ্দেহবিনাশে সতি দেহান্তর প্রাপ্তির্ভবিষ্যতীতি। তথাচ ভীষ্মাদীনাং জরিতদেহনাশে নব্যদেহ

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

নৃযথা কৌমারাদি শরীর ভেদেপি দেহীতদীক্ষিতা সিদ্ধঃ। এবং দেহান্তর প্রাপ্তাবপীক্ষিতৃত্বাৎ। নহি জড়স্য শরীরস্য কৌমারাদ্যনুভবঃ। সম্ভবতি। মৃতস্যাদর্শনাৎ। মৃতস্যবায্বাদ্যপগমাদনুভবাভাবঃ। অহং মনুষ্য ইত্যাদ্যনু- ভবাচ্চে তৎসিদ্ধমিতিচেন্ন। সত্যেবাবিশেষেদেহে সুপ্ত্যাদৌজ্ঞানাদি বিশেষা

তাৎপর্য্যানুবাদ।

তিনি জানিতে পারিলেন, অর্জ্জুন যেন মনে মনে চিন্তা করিতেছেন;—"ভীষ্মাদির আত্মা নিত্য হইলেও, আত্মা যে দেহকে অবলম্বন করিয়া ভীষ্মাদি নামে অভিহিত হইতেছেন, আত্মার এই ভোগায়তন দেহের বিনাশে শোক কোন প্রকারেই অযৌক্তিক নহে। দেহ ব্যতিরেকে আত্মার বিষয় ভোগ হইতে পারে না, আর দেহ আছে বলিয়াই অস্মদাদির সহিত এই মমতা বন্ধন, এই সম্বন্ধের বিচ্যুতিকর দেহের বিনাশে শোক অবশ্যম্ভাবী ও কর্ত্তব্য।" অর্জ্জুনের এবম্বিধ আশঙ্কায় অপনোদনাভিলাষে বলিতেছেন ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই যাহার বিভিন্নদেহ ধারণ হইয়া আসিতেছে যা হইতেছে সেই দেহাভিমানী যে জীব "দেহী" আখ্যায় অভিহিত হয়, তাহার এই বর্ত্তমান দেহেও ক্রমিক অনেক গুলি অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কৌমার, যৌবন ও জরা এই তিনটী অবস্থার পরিবর্ত্তন বিশেষ রূপেই অনুভূত হইয়া থাকে।

কালের স্বভাবে দেহীর বর্ত্তমান ভোগায়তন এই শরীরে বাল্যাবস্থার নাশে যৌবন তাহার নাশে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার জন্য যেমন শোক উপস্থিত হয় না। সেইরূপ কালবশে ভোগায়তন এই দেহের বিনাশ হইলেও, জীর্ণ দেহের পরিবর্ত্তে ভীষ্মাদির নবীন দেহ ধারণ "যযাতি যৌবন প্রাপ্তি" ন্যায়াবলম্বনে শোকের পরিবর্ত্তে আনন্দই হইতেছে। সুতরাং দেহের

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

প্রাপ্তুর্বযাতি যৌবন প্রাপ্তিন্যায়েন হর্ষহেতুরেবেতি ন তদ্দেহবিনাশহেতুকঃ শোকস্তবোচিত ইতি ভাবঃ। ধীরো ধীমান্‌দেহস্বভাব জীবকর্ম্মবিপাক স্বরূপজ্ঞঃ। অত্র দেহিন ইত্যেক বচনং জাত্যাভিপ্রায়েণ বোধ্যং পূর্ব্বত্রাত্ম বহুত্বোক্তেঃ। অত্রাহুঃ। এক এব বিশুদ্ধাত্মা। তস্যাবিদ্যয়া পরিচ্ছিন্নস্য তস্যাং প্রতিবিম্বি-

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

দর্শনাৎ। সমশ্চাভিমানোমনসি। কাষ্ঠাদিবচ্চ। শ্রুতেশ্চ। প্রামাণ্যঞ্চ প্রত্যক্ষা-দিবৎ। নচবৌদ্ধাদিবাক্যবৎ। অপৌরুষেয়ত্বাৎ। নহ্যপৌরুষেয়েপৌরুষেয়া জ্ঞানাদয়ঃ কল্পয়িতুং শক্যাঃ। বিনাচকস্যচিদ্বাক্যস্যাপৌরুষেয়ত্বং নসর্ব্ব সময়াভিমত ধর্ম্মাদি সিদ্ধিঃ। যশ্চতৌনাঙ্গীকুরুতে নাসৌ সময়ী। অপ্রযো-

তাৎপর্য্যানুবাদ।

বিনাশ জন্য তোমার মত ধীর ব্যক্তির শোক কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। তুমি দেহী ও দেহের অবস্থা পরিজ্ঞাত আছ। যে পুরুষ দেহের ও স্বকৃত কর্ম্ম বিপাকের স্বরূপ জ্ঞাত আছে, তাহাকেই ধীর বলা হয়। এখানে "ধীর শব্দের উল্লেখে শ্রীভগবান যেন অর্জ্জুনকে ও তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ হইতে বলিলেন। এবং পূর্ব্বে আত্মার বহুত্ব উক্ত হইলেও এখানে "দেহিনঃ" এই পদটী জাত্যাভিপ্রায়ে একবচন করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে জানিতে হইবে। এখানে যেন মায়াবাদে কল্পিত পরিচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্ববাদ অবলম্বনে শ্রীভগবান একবচন নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহা মনে না হয়।

উঁহাদিগের মতে শুদ্ধ আত্মা এক হইয়াও অবিদ্যার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া অথবা অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাত্বকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বহুরূপে প্রতিভাত হন মাত্র কিন্তু বস্তুত উহা এক। এক আকাশ যেমন ঘটাদি পৃথক আধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথক বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, এক সূর্য্য যেমন পৃথক জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথক রূপে প্রতিভাত হন। তদ্রূপ আত্মা এক হইয়াও অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথক রূপে ভাসমান হন। এবং পরিচ্ছিন্ন বাদ ও এইরূপ এক শুদ্ধ আত্মাকে অবিদ্যা বিভেদ করিয়া থাকেন, বিদ্যাকৃত

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

তস্য বা নানাত্মত্বং। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্-ভবেৎ। তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমানিতি। তদ্বিজ্ঞানেন তস্য বিনাশেতু তন্নানাত্বনিবৃত্ত্যা তদৈক্যং সিধ্যতীত্যেকবচনেনৈতৎ পার্থসারথিরাহেতি তন্মন্দং জড়য়া তয়া চৈতন্যরাশেশ্ছেদাসম্ভবাৎ তৈরপি তদ্বিষয়ত্বানঙ্গীকারাচ্চ।

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

অকত্বাৎ। স্বাত্মধর্ম্মো নিরূপ্যত্বাদিতিচেন্ন। সর্ব্বাভিমতস্য প্রমাণং বিনাপি যোক্তু্মশক্যত্বাৎ। নচ সিদ্ধিরপ্রামাণিকস্যেতিচেন্ন। সর্ব্বাভিমতেরেব প্রমাণ-ত্বাৎ। অন্যথা সর্ব্ববাচিক ব্যবহারা সিদ্ধেশ্চ। নচ ময়া শ্রুতমিতি তবাজ্ঞাতুং শক্যং। অন্যথা বা প্রত্যুক্তরং স্যাৎ। ভ্রান্তির্ব্বাতবস্যাৎ। সর্ব্বদুঃখ কারণত্বং

তাৎপর্য্যানুবাদ।

পরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ আত্মা কারণ ব্রহ্ম, এবং অবিদ্যাকৃত পরিচ্ছিন্ন আত্মা জীবনামে অভিহিত হন। এতাদৃশ আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান, আত্মগত অবিদ্যা কল্পিত বহুত্বের বিনাশ হইলে, নানাত্ব নিবৃত্ত হইয়া, আত্মার একত্ব সিদ্ধ হয়। এই জন্য শ্রীভগবান এখানে "দেহিনঃ" এই এক বচনান্ত পদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই মায়াবাদি দিগের কথা।

পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ মতকে অতীব মন্দ বলিয়া তৎপ্রতি দোষা-রোপ করিয়াছেন।

চৈতন্য স্বরূপ আত্মার জড় অবিদ্যা কর্ত্তৃক ছেদ সর্ব্বথা অসম্ভব। কারণ উক্ত অদ্বৈতবাদী স্বয়ংই আত্মাকে অবিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে ছেদ স্বীকার করিলে, টঙ্কাচ্ছিন্ন পাষাণ খণ্ডের ন্যায়, আত্মার বিকারিত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব দোষ আপাতন হইয়া পড়ে। এবং অবিদ্যার স্বীকারে অদ্বয়ত্ব হানিও হয়। প্রতিবিম্বিত আত্মার বহুত্বও স্বীকার হইতে পারে না। যেহেতু উঁহারা আত্মাকে "অরূপ" বলিয়াছেন, যাঁহার রূপ নাই তাঁহার প্রতিবিম্বও অসম্ভব। যদি অরূপ বস্তুরও প্রতিবিম্ব হয় বল; তাহা হইলে অরূপ আকাশ দিশাদির প্রতিবিম্ব প্রসক্তি হইয়া পড়ে। যদি বল আকাশের প্রতিবিম্ব

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

বাস্তবে চ্ছেদে বিকারিত্বাদ্যাপত্তিঃ টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণবৎ স্যাৎ। নীরূপস্য বিভোঃ প্রতিবিম্বাসম্ভবাচ্চ। অন্যথাকাশদিগাদীনাং তদাপত্তিঃ। ন চ প্রতীত্যন্যথা-নুপপত্তিরেবাকাশস্য প্রতিবিম্বে মানং তদ্বর্ত্তি গ্রহনক্ষত্র প্রভামণ্ডলং তস্যৈবাস্তসি ভাসমান ত্বেন প্রতীতেঃ। "আকাশমেকং হীতি শ্রুতিস্তু পরমাত্মবিষয়া তস্যা-

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

মাস্যাৎ। একোবান্যথাস্যাৎ। রচিতত্বেচ ধর্ম্মপ্রমাণস্য কর্ত্তৃর জ্ঞানাদি দোষ শঙ্কা স্যাৎ। নচা দোষত্বং স্ববাক্যে নৈব সিদ্ধতি। নচ যেন কেনচিদ-পৌরষেয় মিত্যুক্ত মুক্তবাক্যসমং। অনাদিকাল পরিগ্রহ সিদ্ধত্বাৎ। অতঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ।

স্বীকার পক্ষে যে প্রতীতি হইয়া থাকে, উহাই তৎ প্রতিবিম্ব পক্ষে প্রমাণ। অন্যথা ঐরূপ প্রতীতিই হইত না, তাহাও বলা চলে না, যেহেতু আকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, আকাশস্থিত গ্রহ নক্ষত্রাদি রূপবান বস্তুর প্রতিবিম্ব জলাদিতে পতিত হইয়া থাকে। সুতরাং পরিচ্ছন্ন বা প্রতিবিম্ব স্বীকার দ্বারা আত্মার বহুত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। "আকাশমেকংহি" এই শ্রুতি আকাশের ন্যায় সূর্য্যের ন্যায় পরমাত্মার একত্ব সম্বন্ধে কোন বিরোধই নাই, ইহা শ্রুত্যাদি সকল শাস্ত্র সিদ্ধ।

উক্ত পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদ নিরাশ কল্পে, পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটী যুক্তি অবলম্বনে বলেন; যদি আত্মার একত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আত্মৈক্যের উপদেষ্টা হইতে পারে না, তাহার প্রথম কারণ উপদেষ্টা স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞ কিনা? যদি তিনি তত্ত্বজ্ঞ হন, তাহা হইলে, তৎকালে তাঁহার দ্বিতীয় আত্মার জ্ঞান থাকায়, তাঁহার উপদেশ্য তত্ত্বে জ্ঞান হয় নাই, অথবা কিঞ্চিৎ পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও সেই তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয় নাই, ইহা স্থির নিশ্চয়। যদি অতত্ত্বজ্ঞ হন, তাহা হইলে অজ্ঞত্ব হেতু তাঁহার কাযোপদেশ যোগ্যতাই অসম্ভব হয়। সুতরাং বাধিতানুবৃত্তি ন্যায়ে জীব ব্রহ্মের ঐক্য সম্ভব হয় না।

পূজ্যপাদ মধ্বাচার্য্যও স্বকীয় ভাষ্যে এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া আত্মার দেহান্তর পরিগ্রহ যে শোকের কারণ নহে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

"নির্জ্জন।"

একলা বিরলে বসি,
কাঁদিতেছি দিবানিশি,
কেহ আসে নাকো কাছে শুধায় না কোন কথা।
বুঝিতে পারে না কেহ হৃদয়ের কত ব্যথা॥
সমীর আসিয়া ধীরি,
যায় তনু স্পর্শ করি,
নীরব নিশ্বাস ল'য়ে দূরে দূরে চ'লে যায়।
বাতাসের মাঝে শ্বাস আপনি মিশায়ে যায়॥
অলসে পড়িলে ঘুমে,
স্বপনে ফেলিয়া ভ্রমে,
কত দুঃখ দিয়ে চিতে কাঁদাইয়া চ'লে যায়।
স্মরিয়া সে স্বপ্ন স্মৃতি কাঁদি, করি হায় হায়॥
কতদিন এই ভাবে,
কাঁদাইবে মোরে ভবে,
জানি না এ রোদনের কবে হবে অবসান।
কাঁদিয়া কাটাতে হবে কত দিবা, কত যাম॥
রোদনের হয় শেষ,
থাকেনাকো কোন ক্লেশ,
যদি আসি শ্রীগৌরাঙ্গ দেন হৃদে প্রেমরাশী।
ঘুচে যাবে দুঃখ জ্বালা হাসিব প্রেমের হাসি॥
(আর) সব জ্বালা দূরে যায়,
(যদি) আয়ু রবি অস্ত যায়,
ঘুমাব মৃত্যুর কোলে শীতল হইবে বুক।
ঘুমাব শান্তিতে চির থাকিবে না সুখ দুঃখ॥ শ্রী—

ধর্ম্মজীবন।

(বেলেঘাটা সান্ধ্যসমিতিতে পঠিত।)

(লেখক—শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রতরত্ন স্মৃতিভূষণ।)

—:০:—

"ধর্ম্মজীবন" শব্দে প্রধানতঃ তিনপ্রকার ভাব আনয়ন করে। (১) ধর্ম্ম ও জীবন, এতদুভয়ের সম্বন্ধ বা সমন্বয়। (২)—ধর্ম্মই জীবন, অর্থাৎ জীবন আর কিছুই নহে কেবল কতকগুলি ধর্ম্ম-সমষ্টি মাত্র। (৩)—ধর্ম্ম যাহার লক্ষ্য এরূপ জীবন। ধর্ম্ম কাহাকে বলে এ বিষয়ে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন ও করিবেন। কিন্তু ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিলে উহা হইতে একটী মাত্র অর্থই প্রতিভাত হয়। যাহা ধরিয়া থাকা যায়, অথবা যাহা দ্বারা ধৃত হয় তাহাই ধর্ম্ম। এই যে চতুষ্কোণ পদার্থটী দেখা যাইতেছে 'কেহ' উহার পরমাণুগুলিকে ধরিয়া না রাখিলে, ইহার এরূপ আকৃতি হইত না অথবা ইহা থাকিতেই পারিত না। কেন না কোনও মহাশক্তি ইহার পরমাণুগুলিকে নিশ্চয়ই ধরিয়া রাখিয়া বস্তুটীর সত্তা বর্ত্তমান করিতেছে। সুতরাং জগতে যতপ্রকার পদার্থ আছে তাহাদের অস্তিত্বের জন্য এবং স্বাতন্ত্র্যের জন্য এক একপ্রকার ধর্ম্ম অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ আপাততঃ দৃষ্টিতে জগতে দুইপ্রকার ধর্ম্ম লক্ষিত হয়। অচেতন বা জড়-ধর্ম্ম এবং সচেতন বা জীব-ধর্ম্ম। স্থানাবরোধকতা, স্থানব্যাপকতা, বিভাজ্যতা প্রভৃতি জড়-ধর্ম্ম, এবং আহার নিদ্রা ভয় প্রভৃতি জীব ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। সাধারণ ও বিশেষভেদে এই জড়ধর্ম্ম এবং চেতন ধর্ম্ম, আবার দুই ভাগে বিভক্ত সাধারণ ধর্ম্ম সমষ্টিগত এবং বিশেষ ধর্ম্ম ব্যষ্টিগত বা ব্যক্তিগত।

এইরূপ স্থাবর ধর্ম্ম, জঙ্গমধর্ম্ম, বৃক্ষধর্ম্ম, লতাধর্ম্ম, পক্ষীধর্ম্ম, পশুধর্ম্ম এবং মানবধর্ম্ম, আবার সমাজধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম এবং কালভেদে সত্যধর্ম্ম, ত্রেতাধর্ম্ম প্রভৃতি যুগধর্ম্ম, এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্ম বিরাজিত দেখা যায়। প্রত্যুত যতপ্রকার পদার্থ আছে এবং তাহাদের যত প্রকার অবস্থা হইতে পারে

তাহাদের-প্রত্যেক অবস্থাতেই ধর্ম্ম পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। এই হস্তস্থিত অঙ্গুলি পাঁচটীর স্বতন্ত্র ধর্ম্মতা না থাকিলে উহারা পাঁচটী না হইয়া একটাই হইত। এই প্রকারে ধর্ম্ম বহুবিধ হইলেও যিনি উহাদের মধ্যে একত্ব দর্শন করেন তাঁহার জীবনই ধর্ম্মজীবন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রত্যেক পদার্থই-পরমাণু সমষ্টি। কোনও না কোন মহাশক্তি ঐ পরমাণুগুলিকে ধরিয়া রাখিয়া বস্তুটীর সত্ত্বা বর্ত্তমান করিতেছে। হিন্দুগণ বহুকাল হইতে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥" বলিয়া যে মহাশক্তির আরাধনা করিয়া আসিতেছেন এই শক্তি সেই মহাশক্তিরই অংশ। জড়বাদীগণ এই শক্তিকে আকর্ষণ বলিয়া থাকেন। একটা পরমাণু যদি আর একটা পরমাণুকে আকর্ষণ না করিত তাহা হইলে এই জগতের অস্তিত্ব হইত কি?

কেবল পরমাণুগত আকর্ষণ কেন? এই জগৎ বহুবিধ আকর্ষণের লীলাক্ষেত্র। একপ্রকার আকর্ষণ বশতঃ পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ, চন্দ্রসূর্য্য, তারা ও নক্ষত্রাবলী নিজ নিজ গন্তব্যপথে চলিতেছে বলিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্বীকার করিয়া থাকেন। একপ্রকার আকর্ষণ বশতঃই পক্ষিগণ আহার মুখে লইয়া নীড়াভিমুখে ধাবিত হয়। এক প্রকার আকর্ষণ বশতঃই ১০টা বাজিতে না বাজিতে কেরাণী নিজ নিজ অফিষ (কর্ম্মস্থান) অভিমুখে দৌড়িতে থাকেন, এবং এক প্রকার আকর্ষণ বশতঃই অন্ততঃ একদিনের ছুটী (অবকাশ) পাইলেও তাঁহাদের মন দেশাভিমুখে আকৃষ্ট হয়। যদি এই সমস্ত আকর্ষণ না থাকিত তাহা হইলে জগতের অস্তিত্ব কিছুতেই হইতে পারিত না।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই আকর্ষণাত্মক বহুদেবতার মধ্যে প্রধান দেবতাই "কৃষ্ণ" ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন, কৃষ্‌+ণ = কৃষ্ণ। কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দঃ। অর্থাৎ কৃষ্‌ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ, এই আকর্ষণই ভূ বাচক অর্থাৎ সত্ত্বা বাচক। আকর্ষণ ব্যতিরেকে জগতের সত্ত্বাই হইতে পারে না। শ্রীজীব গোস্বামী অনেক স্থানে বলিয়াছেন "সর্ব্বাকর্ষকত্বাৎ কৃষ্ণঃ।" অতএব কৃষ্ণশক্তি জগতের মূলকারণ সন্দেহ নাই। ইহাই সদ্ধর্ম্ম। এই পথে দেখিলেই "ধর্ম্মে জগৎ প্রতিষ্ঠিতং বা ধর্ম্মোধরা ধারক" প্রভৃতি উক্তির অর্থের সহজে উপলব্ধি হয়।

এই অনন্ত পদার্থ, পরিপূর্ণ বিলাস বিশ্বরাজ্যে বিবিধ পদার্থ বিরাজিত থাকিলেও বিচার বুদ্ধিতে কিন্তু প্রমাতার জ্ঞানই সমস্ত পদার্থ উপলব্ধির মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়। যে জন্ম-বধির সে শব্দ কিরূপ পদার্থ বুঝিতে পারে না। জন্মান্ধ যে, সে বর্ণ কিরূপ পদার্থ বুঝিতে পারে কি? সুতরাং প্রমাতার জ্ঞানই প্রমাণ অর্থাৎ চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রমেয় অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত পদার্থ অনুভব করেন। এই যে চতুষ্কোণ পদার্থটী দেখা যাইতেছে আমরা কিরূপে উহার উপলব্ধি করিতেছি, আমরা দেখিতেছি উহা চতুষ্কোণ, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, একটু প্রস্থ বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, বেশ মসৃণ ইত্যাদি শ্বেতবর্ণতা, মসৃণতা প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম সমষ্টি ভিন্ন, পদার্থটী আর কিছুই নহে। এবং প্রমাতার চিন্তাই উহার অস্তিত্বের কারণ। এইরূপ কি চেতন, কি অচেতন, সমস্ত পদার্থই চিন্ময় অর্থাৎ কতকগুলি চিন্তা সমষ্টি মাত্র। ইহাই চিদ্ধর্ম্ম।

কোন পদার্থের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে, তাহার প্রতি চিত্তের আকর্ষণ হয়ই হয়। আমি এক্ষণে জেনারল পোষ্টাফিষের গুম্বজটীর বিষয় ভাবিতেছি। তৎপ্রতি আমার চিত্ত নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহা না হইলে এক্ষণে উহা না দেখিয়াও আমি উহার গোলত্ব, শুভ্রত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অনুভব করিতে পারিতাম না। পূর্ব্বস্মৃতি বলে আমার চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া, উহার ধর্ম্মগুলি আমার সমক্ষে এক্ষণে প্রতিভাত হইতেছে। ফলতঃ চিন্তা বলিলে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হওয়া বুঝায়। সুতরাং চিন্তা ও আকর্ষণ অভিন্ন।

চিন্তা-শক্তি আমা হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে গমন করতঃ গোলত্ব, শুভ্রত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম আমার নিকট আনয়ন করিয়া সেই সেই ধর্ম্ম সমষ্টিভূত পদার্থের জ্ঞান জন্মাইতেছে। সুতরাং চিন্তা ও পদার্থে কেমন মধুর সম্বন্ধ। চিন্তা ভিন্ন পদার্থ নাই। আবার পদার্থ ভিন্ন চিন্তা হইবে কিসের? চিন্তা জ্ঞানের আশ্রয়ে থাকে এবং পদার্থই তাহার বিষয় বা আধার। জগতে বহুবিধ পদার্থ প্রতীত হয় বলিয়া, আধার বহুবিধ স্বীকৃত হইয়া থাকে। "আধার" "আধার" "আধার" এই কথাটী বহুবার বলিলে 'রাধা' নামই উচ্চারিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চিন্তাশক্তি ও আকর্ষণ অভিন্ন, এবং আকর্ষণ কৃষ্ণাত্মক; সুতরাং জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি সমস্তই রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলামাত্র। এই

লীলাধর্ম্মে আনন্দের উৎপত্তি। আনন্দলাভের আশাতেই সকলের অস্তিত্ব, সুতরাং আনন্দ জগতের মূলধর্ম্ম।

আশ্রয়নিষ্ঠ চিন্তা, বিষয় বা আধারনিষ্ঠ চিন্তার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় স্বাধিষ্ঠানে প্রত্যাগমন করিলে, তবে তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মায় এবং তাহা হইতেই আনন্দ হয়। আমার চিন্তাশক্তি দর্শনেন্দ্রিয় পথে বাহিরে গমন করতঃ একটী বৃক্ষ হইতে গোলত্ব, হরিৎবর্ণত্ব প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম লইয়া আমার নিকট পুনরায় আসিলে আমার জ্ঞান হয় গাছে একটী ফুল ফুটিয়াছে; বা কেমন সুন্দর ফুলটী। চিন্তাশক্তি এইরূপ বাহিরে গমন করে কেন? কেবল আনন্দ লাভ ভিন্ন ইহার আর কোনও কারণ দেখা যায় না। এই নিমিত্ত এই বহির্গমন এবং স্বাধিষ্ঠানে প্রত্যাবর্ত্তনরূপ ব্যাপারকে লীলা বলা যায়। এই লীলা-ধর্ম্মই, আনন্দ লাভের সোপান। এবং সকলেই আনন্দ লাভের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু এই লীলাধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতে না পারাতে আনন্দলাভ ঘটিয়া উঠে না। কোনও কোনও বিষয়ে কিঞ্চিৎ আনন্দ হইলেও পূর্ণজ্ঞানের অভাবে পূর্ণানন্দ লাভ হইতে পারে না।

ঢাক কখন ঢোলের মত বাজে না, ঢোল কখন মৃদঙ্গ বা খোলের ন্যায় বাজিতে পারে না, আবার মৃদঙ্গ হইতে সেতারের ন্যায় বাদ্যবাহির হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। সকলই ত বাদ্যযন্ত্র, তা বলিলে কি হইবে? জ্ঞান সমস্ত পদার্থে পরিপূর্ণভাবে থাকিলেও বহির্গমন পথ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি সন্নিবেশের তারতম্য বশতঃ জ্ঞান খেলিবার তারতম্য হওয়াতেই আনন্দলাভের তারতম্য দেখা যায়। কাষ্ঠ বৃক্ষের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ নহে। ইন্দ্রিয়াদি সন্নিবেশের উৎকর্ষতা বশতঃ নরদেহ শক্তির যেরূপ সর্ব্বোত্তম লীলাক্ষেত্র হইয়া দাড়াইয়াছে, ইহজগতে বোধ হয় এরূপ ক্ষেত্র আর নাই। উর্ব্বর ক্ষেত্রে সুবৃক্ষের ন্যায় কুবৃক্ষ অধিকতর বর্দ্ধনশীল হয়। সুতরাং মানবে যেমন জ্ঞানের আধিক্য দেখা যায়, অজ্ঞান বা মায়াধর্ম্মেরও প্রাবল্য ইহাতে থাকাতে, মানুষকে অনেক সময় ইতর প্রাণী অপেক্ষা অনেক অপকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে দেখা যায়। কিরূপে মানবগণ ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে অজ্ঞানের আবরণ হইতে অপাবৃত হইয়া, বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারে, তাহাই ধর্ম্মজীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সত্যাবলম্বন ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপান। সত্যাবলম্বন মাত্রেই কপটতা দূরে আনয়ন করে। এই ধর্ম্মধ্বজী বজ্র সত্যকে যিনি আশ্রয় করেন তাহার

হৃদয় কন্দরে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের বিমল উজ্জ্বল জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া থাকে। তিনি মরজগতের নরগণ মধ্যে গণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে স্বর্গরাজ্যেই বিরাজিত থাকেন। কলিমল-কলুষতা তাঁহার চিত্ত-ক্ষেত্রে আবিলতা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না।

চিত্তের একাগ্রতা না থাকিলে কোনও বিষয়ে উন্নতি লাভ করা যায় না। প্রথম সৃষ্ট মানবগণ স্বভাবতই একাগ্রচেতা ছিলেন। সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা লাভের নিমিত্ত অন্যসাধনের আবশ্যক না থাকায় তপস্যাই সত্যকালের যুগধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। তখন মানব মন্দিরে চিন্তাশক্তির অগাধ স্রোত প্রবাহিত হইত বলিয়া, তপোনিরত তপস্বিগণ অনায়াসেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। কিন্তু কালপ্রভাবে জাগতিক মায়ায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিবার নিমিত্ত ত্রেতাযুগে বহু আড়ম্বর পূর্ণ যজ্ঞ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। যজ্ঞের উপযুক্ত ভূমি সংরক্ষণ এবং ঘৃতাদির সংগ্রহে বিলক্ষণ শৌর্য্য বীর্য্যের প্রয়োজন হইত। সুতরাং বলদৃপ্ত মানব চিত্তের সংযমনার্থ ক্রিয়াবহুল যজ্ঞের আবশ্যক হইয়াছিল। মদমত্ত মাতঙ্গের মদ-স্খলিত না হইলে শান্ত হইতে পারে কি? তৎপরে বহুকাল জাগতিক সুখ ভোগ করিয়া চিত্তে আসক্তির উদ্রেক হওয়াতে, দ্বাপর যুগে আসক্তি পরিহারক পূজা প্রণালীর প্রণয়ন হয়। নির্দ্দেশ তরুলতাদির সংসর্গ এবং বিষয় কর্ম্ম হইতে চিত্তকে পৃথক রাখিবার জন্যই পূজার প্রবর্ত্তন। এইরূপে শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধ সত্ত্বের উদয় হইলে, তখন নিষ্কাম হইয়া হরিনাম কীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কলিকাল অপকৃষ্ট কাল বলিয়া যাঁহারা বলিতে ইচ্ছা করেন করুন, কিন্তু ইহার বহুদোষ সত্ত্বেও, যে কালে শ্রীগৌরাঙ্গ ঠাকুর, আর শ্রীহরিনামই সম্বল সেযুগ নিশ্চয়ই শুদ্ধ সত্ত্বের যুগ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ যুগানুবর্ত্তনের ন্যায় যিনি বাল্যকালে চিন্তাশীল, যৌবনে শৌর্য্য বীর্য্যশালী, প্রৌঢ় জীবনে অনাসক্ত এবং বার্দ্ধক্যে নিষ্কামচিত্ত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তননিরত হন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক এবং তাঁহার জীবনই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন বলিয়া কথিত হয়।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বহুসংখ্যক ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পাঁচটী মূল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ মায়াবাদীগণ শক্তিকে, জড়বাদীগণ সূর্য্যকে,

কারুণ্যবাদীগণ শিবকে, বহুশক্তিবাদীগণ গণপতিকে এবং ব্রহ্মবাদীগণ একাধারে এই কয় প্রকার দেবতাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন। হিন্দুই হউন আর খৃষ্টানই হউন ধর্ম্ম ও মত, মায়াবাদ বা জড়বাদ প্রভৃতি ৫টী মতবাদের মধ্যে চইবেই হইবে। সুতরাং ধর্ম্মে সম্প্রদায় গত ভেদ কিছুই দেখা যায় না। তবে ইউরোপ, জাপান এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ ভেদে ধর্ম্মের কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়।

ইউরোপের ধর্ম্ম মৈত্রীকরণ। অনেকে একত্রিত হইয়া কিরূপে প্রাধান্য লাভ করা যায়, তাহাই ইউরোপীয় ধর্ম্ম। সেকারণ সে দেশের সাধারণ লোক কোম্পানী প্রিয় এবং রাজাগণ সাম্রাজ্য প্রিয়।

দৃঢ়ীকরণ জাপানী ধর্ম্ম। নিজের শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহাকে দৃঢ় রাখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী শক্তি সমূহ তাহার সহিত যোগ করিয়া কিরূপ প্রধান হওয়া যায় তাহাই জাপানীর ধর্ম্ম।

ভারতীয় ধর্ম্ম কি করণ বলিব। "ফাঁকী প্রদান" ধর্ম্ম লক্ষণ বলিলে দোষের হইবে না। সংসারী এদেশের সকলেরই ইচ্ছা আমি বড়লোক (ধনী) হইব, অর্থ সংগ্রহ করিব, কিন্তু তাহা পরকে ফাঁকী দিয়া। ধনী অপরকে ফাঁকী দিয়া ধন সংগ্রহে ব্যস্ত। দরিদ্র নিজকে ফাঁকী দিয়া উদরে একমুষ্টি না দিয়া বালক বালিকাদিগকে উপযুক্ত খাদ্য বা রোগে ঔষধ না দিয়া ধন সংগ্রহ করিতেছেন। এমন কি সাধুগণ জগৎকে ফাঁকী দিয়া সন্ন্যাসী হইতে চাহেন।

হায় "অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"র দেশে একি হইল! এই কি সেই দেশ, যে দেশে সকল ধর্ম্মের সকল জ্ঞানের আকর বিরাট বেদশাস্ত্র নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে ব্রহ্মার মুখ কমল হইতে নির্গত হইয়াছিল! এই কি সেই দেশ, যে দেশে বিশাল বুদ্ধি বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ সংহিতা প্রণয়ন করিয়া অমর হইয়াছেন। এই কি সেই দেশ, যে দেশে বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি মনুষ্য সমাজের হিতকর যাবতীয় ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া আদিমানব মনু, সর্ব্বপ্রধান নিয়ম বিধায়ক বলিয়া ভুগোলকের উভয় পৃষ্ঠে অদ্যাপি সম্মানিত হইতেছেন! এই কি সেই দেশ, যে দেশে কৌরব ও পাণ্ডব প্রভৃতি বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া বরেণ্য বীর ধর্ম্মের বিজয় বীণা নিনাদিত করিয়াছিলেন? যে দেশের মূলসূত্র গুলি লইয়া অন্যান্য দেশ

সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিল; জ্ঞানের আদি নিকেতন সেই দেশ, আজ সকলের পদতলের অতল তলে নিপতিত কেন? এখন যে এখানে মরাহাতী লাখ টাকা' শুধু এই সুখ স্মৃতিটুকু ব্যতীত আনন্দ উপভোগের আর কিছুই দেখিতেছি না।

বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের অযথা ব্যাখ্যাই ইহার মূলকারণ। শাস্ত্রকারগণ সূত্ররূপে যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাখ্যাতাগণের স্বকপোল কল্পিত কুব্যাখ্যার ফলে সরলবিশ্বাসী লোকের মনে কুসংস্কার আনিয়া দিয়াছে। অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ এই সরল কথার ব্যাখ্যায় অনেক মহামহোপাধ্যায় বলিয়া আসিতেছেন হিংসা দুইপ্রকার, বৈধ ও অবৈধ। বৈধ হিংসা করা যায়—হিংসার আবার বৈধীত্ব কোথায়? উহাকে হিংসা না বলিয়া অন্য কথা বলা উচিত ছিল। ব্যাখ্যাতাগণের কুব্যাখ্যার ফলে সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মময় রাধাকৃষ্ণের নাম করিতেই আজকাল অনেককে কুন্ঠিত দেখি। "আচার পরমোধর্ম্মঃ" এইটী মনুসংহিতার সারধর্ম্ম। কিন্তু সবর্ণার গর্ভোৎপন্ন সন্তানের জাতি যাইতে পারে না বলিয়াই আজকাল অনেকে অসদাচার করিতে কুন্ঠিত হন না। ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের যথার্থতত্ত্ব সকলের হৃদয়ঙ্গম না হইলে ধর্ম্মোন্নতির কোন আশা করা যায় না। ধর্ম্মোন্নতিই সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল। আমরা যাহা ধরিয়া আছি যদি সেইটীই ক্রমশঃ নিম্নগামী হইল, তবে আমাদের উন্নতিচেষ্টা বাতুলতা নহে কি?

কর্ম্মেই ধর্ম্মের অভিব্যক্তি। কাহার ধর্ম্ম কিরূপ তাহা আপাততঃ দৃষ্টিতে অনুভূত হয় না। উহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ধর্ম্মের 'ধ' এর আকুঁড়িটা ঘুরাইয়া দেখিতে হইবে। 'ধ' এর বামপার্শ্বস্থিত উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত আঁকুড়ি ঘুরাইয়া ডাহিন দিকে নিম্নাভিমুখে রাখিলে 'ধ' 'ক' এর আকার ধারণ করে। তখন ধর্ম্ম, কর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। ফলতঃ ধর্ম্ম ও কর্ম্মে প্রভেদ বেশী বিভিন্ন নয়। আমার পিতৃদেব (তিনি এখন বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত আমি তাঁহাকে উদ্দেশে প্রণাম করি) একদিন তাঁহার চতুষ্পাঠিতে অধ্যাপনা করিবার সময় একখানি তন্ত্রের নাম করিয়া বলিয়াছিলেন, তন্ত্রে (তন্ত্রখানির নাম এক্ষণে আমার মনে নাই) অক্ষর সকলের ধ্যান আছে। তাহাতে বর্ণিত আছে আঁকুড়ি গুলি আসক্তি প্রকাশক। যখন কোন কার্য্যের আসক্তি বা উদ্দেশ্য উর্দ্ধ মুখে অর্থাৎ শ্রীভগবানের দিকে থাকে, তখন তাহা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। একই কার্য্য জগতের হিতার্থে

ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া করিলে ধর্ম্ম, আর কেবল স্বার্থসিদ্ধি বাসনায় করিলে কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্ম একপ্রকার বন্ধন, কিন্তু ধর্ম্ম মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল কর্ম্মবীর জগতের হিত কামনায় আজীবন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের জীবনও ধর্ম্মজীবন।

কর্ত্তব্য প্রতিপালন একটী পরমধর্ম্ম। কিন্তু কোনটী কর্ত্তব্য, কোনটী অকর্ত্তব্য তাহার নির্দ্ধারণ করে কে? শাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ ও নিজের বিবেচনা বুদ্ধি এই তিনের ঐক্যতানেই কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে নিজের বিবেচনা অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিই সর্ব্বপ্রধান। অবিবেকীর আবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি। যদি একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করা যায় তাহা হইলে বিবেকের সিদ্ধান্ত অনায়াসেই অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত দুষ্কর হইলেও অনায়াস লভ্য। এই বিবেক সিদ্ধান্তই ভগবদ্ বাক্য বলিয়া উহা লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। বেদমাতা গায়ত্রী বলিতেছেন—"সাধক, এই দেখ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ। যিনি ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আইস আমরা তাঁহার সেই বরণীয় তেজের বিষয় চিন্তা করি। তিনি আমাদের বুদ্ধি প্রেরণা করেন।" শ্রীগীতাতেও শুনিতে পাই "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" ইত্যাদি স্থলে যে বুদ্ধি শব্দের উল্লেখ আছে উহাতে তাৎপর্য্যতঃ বিবেক বুদ্ধিই বলিয়া বোধ হয়। গীতাতে ফলাভিলাষী না হইয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কার্য্য করিবারই উপদেশ আছে। কিন্তু অবিবেকী হইয়া কার্য্য করিতে বলেন নাই। বিবেক হীনতা হইলেই গড্ডালিকা প্রবাহের উৎপত্তি; এবং গড্ডালিকা প্রবাহ মনুষ্য সমাজের অত্যন্ত অবনত অবস্থার পরিচায়ক।

বেদমাতা গায়ত্রী শ্রীভগবানের বিষয় চিন্তা করিতে বলিতেছেন, কিন্তু উহা চিন্তা না করিয়া কেবল ঐ মন্ত্রটী জপ করিলে কি ফল হইবে? অবশ্য জপে কিয়ৎ পরিমাণে চিত্তের স্থৈর্য্য ও একাগ্রতা সাধিত হয়। এখন শ্রীভগবানের তেজ বিভূতির বিষয় চিন্তা করাই পরমধর্ম্ম বলিয়া গায়ত্রী জপকরাই ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যিনি বড় ধার্ম্মিক, তিনি বড়জোর ১০৮ বা ততোধিক জপই করেন। সভ্য মহোদয়গণ! ভাবিয়া দেখুন দেখি ইহার জন্য দায়ী কে? ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহের কুব্যাখ্যাতা নহে কি? সত্য কিন্তু লুকাইয়া থাকিবার বস্তু নহে।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ইহাই তন্ত্রধর্ম্মের সারমর্ম্ম। কিন্তু কেবল মাত্র জপ করিলে মন্ত্রের সাধন হয় না। মন্ত্রোপদিষ্ট দেবতার বিষয় চিন্তা করিতে থাকিলে বিবেক সিদ্ধান্তানুযায়ী বুদ্ধিবলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবেই হইবে। তখন ঐ কর্ম্মের সাধনই মন্ত্র সাধনার চরণ পরিণাম হইয়া থাকে। অতএব চিন্তা ও ধর্ম্ম, ধর্ম্মজীবন যাপনের প্রধান অবলম্বন।

বহুবহু প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে ধর্ম্মচর্চ্চা হইয়া আসিতেছে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের সার সংগ্রহ করিয়া মহাভারতে. যাবতীয় ধর্ম্ম নির্ণীত হইলেও শাস্ত্রকার বলিলেন "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং";—ইহাতেও পরমধর্ম্ম নির্ণীত হইল না বলিয়া মহাভারতকার ক্ষুণ্নমনে বহুকাল চিন্তার পর আর একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিলেন। লেখ্য-প্রতিজ্ঞায় লিখিলেন -"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।"—এই গ্রন্থে নির্ম্মৎসর সাধুদিগের অকৈতব পরমধর্ম্ম বর্ণিত হইল এবং যে বস্তু, মঙ্গল প্রদান ও তাপত্রয়ের উন্মূলন করে সেই সত্যবস্তু, ইহা পাঠে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের লীলা বলিয়া এমন কি অনেকে গ্রন্থখানি পড়িতেই অভিলাষী নহেন। প্রত্যুত উহার সহজবোধ্য সংস্করণও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু সকলকেই আমি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পড়িলে দেখিতে পাইবেন, ভক্তিধর্ম্ম কিরূপ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই ভক্তিধর্ম্মই মানব প্রকৃতির একমাত্র অনুকূল ধর্ম্ম। যিনি যে কর্ম্মই করুন না কেন তাহাতে তাঁহার ভক্তি না থাকিলে উহা অভীষ্ট ফল প্রদান করে না। জগৎ মায়া মূলক নহে, পরন্তু সত্যমূলক। শ্রীভগবানই এই জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সুতরাং যদি শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে এই জগৎকেও ভাল বাসিতে শিক্ষা কর। এই ভক্তি-ধর্ম্মের পরিণত অবস্থাকে প্রেমধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। জগতের সেবারূপ কর্ম্মেই প্রেমধর্ম্মের পরিপুষ্টি। যাঁহার যেরূপ অবস্থা তিনি সেইরূপ অবস্থাতেই জগতের সেবা করিতে পারেন। রাজা শিক্ষা-মূলক শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতঃ, ধনী অর্থব্যয় করিয়া এবং দরিদ্র কায়িক পরিশ্রম করিয়া জগতের সেবা করুন। অনেক সময় এমন কি কেবল মাত্র মুখের কথা একটী কহিয়াও জগতের সেবা

করা যায়। দুঃখিতের দুঃখ দেখিয়া যদি কেহ 'আহা' বলিয়া নিকটে দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলেও আর্ত্তহৃদয়ে যে কি আনন্দের উদয় হয়, তাহা বোধ হয় অনেকে অনুভব করিয়া থাকিবেন। যদি কপটতার কপাট ব্যবধান না থাকে তবে এই প্রকারে উৎপাদিত আনন্দ, সেব্য ও সেবক উভয়কেই তুল্যরূপে আনন্দিত করে। বিমল আনন্দ উৎপাদনই সেবা। যখন কোনরূপ আবিলতার আবরণ স্বপ্রকাশ আনন্দের উপর আসিয়া পড়ে, তখন ঐ আবৃতানন্দ ব্যক্তিকে আমরা দুঃখিত দেখি। সেই আবিলতার আবরণ অপসারিত করার নামই সেবা।

জীবাত্মা যতদিন যে আধারে থাকেন আমরা ততদিন সেই আধারকে জীবিত বলি। এই জীবাত্মা শ্রীভগবানের অংশ। বিমল আনন্দ করাই ইঁহার ধর্ম্ম। সুতরাং জগতের সেবা করিয়া ইনি যেরূপ আনন্দিত হইবেন, সেরূপ আর কিছুতেই হইবে না। এই সেবা ধর্ম্মের প্রচার করিয়া যে সকল মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে বঙ্গ-গৌরব-রবি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবই সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের আপনার লোক। অতএব তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ কায়মনোবাক্যে জগতের সেবায় নিযুক্ত থাকিলেই ধর্ম্মজীবনের যথার্থ উপসংহার করা হইবে। ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

আনন্দনগর।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত, উকিল)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

—:০:—

ভবনগরে অধর্ম্ম নামে এক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার একটী প্রবল দল ছিল। দুষ্কৃতিশালী বহুতর ব্যক্তি তাঁহার এই দলভুক্ত ছিল। স্বার্থরাজ অপেক্ষা ইঁহাকে লোকে অধিকতর আশঙ্কার চক্ষে দেখিয়া থাকিতেন। ইঁহার বিষয় সম্পত্তি কিছুই ছিল না কেবল দুষ্ক্রিয়ার সাহায্যে প্রতিবেশীগণের নিকট হইতে যে কিছু অর্থ কাড়িয়া লইতেন তাহা হইতে অধর্ম্মের এবং তাঁহার সেই বিশাল দলের জীবন যাত্রা অনায়াসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নির্ব্বাহিত হইত। পরদুঃখে ইঁহাদের অণুমাত্র ক্লেশ বোধ হইত না। অপরকে ক্লেশ দিয়া যদি

তাঁহারা নিজে লাভবান্ হইতে পারিতেন তবে তাঁহাদের মহোল্লাস সাধিত হইত। এই দলের বল বিক্রম লোক সকলের মহাভীতির কারণ হইয়াছিল। সকলেই ব্যতিব্যস্ত। কখন কোন ব্যক্তির উপর ইহাদের অত্যাচার প্রকটিত হইবে তাহা জানিবার উপায় নাই। দুষ্ক্রিয়াবলম্বনে অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজোদর পরিপূর্ণ করা ইহাঁদের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং এই মূল উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া লোকের বিনয় শিষ্টাচার বা কাতরোক্তির প্রতি ইহাঁরা দৃক্‌পাত করিতেন না। স্বার্থরাজের সহিত অধর্ম্মের অতিশয় সৌহৃদ্য ছিল। উভয়ের উদ্দেশ্য ও মতিগতি একরূপ থাকায় তাঁহারা পরস্পরের কার্য্য পরস্পর সমর্থন করিতেন। উভয়ে যেন অভিন্নাত্মা। স্বার্থরাজের সহিত অধর্ম্মের সংমিলনে ভবনগরে নিরন্তর নানাবিধ বিভ্রাট উপস্থিত হইতে লাগিল অধিবাসীগণ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহাঁদের সংশ্রবে তাঁহাদের চিত্ত নিতান্ত কলুষিত হইলেও তাঁহারা আপনাদের দুর্গতি বিলক্ষণরূপ প্রণিধান করিতে পারিয়াছিলেন। ভবনগর মধ্যে স্বার্থরাজের ও অধর্ম্মের কার্য্যকলাপ এবং রীতি নীতির অনুকরণ পূর্ণ মাত্রায় চলিয়া ছিল। কিন্তু ইহাদের অপার মহিমায় লোক সকল আপনাদের অবনতি বুঝিতে পারিলেও বাধ্য হইয়া ইহাঁদের কার্য্যানুরূপ কার্য্য করিতেছেন।

অধর্ম্মের সহধর্ম্মিণীর নাম কুমতি। কুমতি অধর্ম্মের প্রিয়তমা। কুমতির পরামর্শ অধর্ম্মের কার্য্যসকলের চালক স্বরূপ ছিল। কুমতি দেখিতে অতি কুৎসিতা। কিন্তু অধর্ম্ম তাহাকে অতি সুন্দরী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। স্ত্রীর গুণ, রূপ অপেক্ষা কুৎসিততর হইলেও অধর্ম্ম তাঁহার গুণরাশির বড়ই প্রশংসা করিতেন। কুমতির গর্ভে অধর্ম্মের বহু পুত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তন্মধ্যে যাঁহারা সমধিক প্রতাপশালী তাঁহাদের নাম মাত্র উল্লিখিত হইল।

অধর্ম্মের পুত্রগণের মধ্যে দুষ্কর্ম্ম, সন্তাপ, বিদ্বেষ এবং কৌটিল্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিলেন এবং কন্যাগণের মধ্যে নিষ্ঠুরতা, পক্ষপাতিতা, অতৃপ্তি, অসহিষ্ণুতা এবং অধীরতা অতিশয় ক্ষমতাশালিনী ছিলেন। দুষ্কর্ম্ম বড়ই অত্যাচারী ছিলেন। লোক সকল তাঁহার অত্যাচারে যারপর নাই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিলেন। যত প্রকার কুক্রিয়া আছে ইনি সকল গুলি আপন প্রয়োজন মত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ইহার কার্য্যে চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব ও আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল।

ইহার শরীর বলিষ্ঠ, মূর্ত্তি ভীষণ। সুদীর্ঘ গুম্ফ ও শ্মশ্রু বদন মণ্ডলে বিরাজিত। নেত্রদ্বয় আরক্ত বর্ণ। বিকট হাস্য ইহার দীর্ঘ দন্তগুলি মধ্যে মধ্যে বিকাশ করিতেছে। লোকের ক্লেশ যতই অধিক হইবে ইহার আনন্দও সেই পরিমাণে অধিক হইবে ইহার প্রবৃত্তি অতীব জঘন্য। কার্য্য সকল বিষম ভয়প্রদ। অধর্ম্মের পুত্র সন্তাপ সদাই নিরানন্দ। মূর্ত্তি খানিতে বিষাদের কালিমা পড়িয়াছে। ইনি যাহাকে অনুগ্রহ করেন তাঁহার হৃদয় অসহ্য জ্বালায় জ্বলিতে থাকে। ইহাঁর প্রসাদ পূর্ণ মাত্রায় প্রদত্ত হইলে জীব আপন জীবন অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়। ইহাঁর প্রসাদ ভোগ অপেক্ষা জীবন বিসর্জ্জন অতিশয় সুখকর। দুর্ভাবনায় ইহার শরীর নিতান্ত জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাঁর অনুজের নাম বিদ্বেষ। ইনি কাহাকেও প্রিয় চক্ষে দেখেন না। লোকের সুখ স্বচ্ছন্দ হয় তাহা ইহার অভীপ্সিত নহে। সংসারে যিনি কোনরূপ উন্নতি লাভ করিবেন ইনি তাঁহার সর্ব্বনাশ চেষ্টায় কোনরূপ দুষ্ক্রিয়া করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। কোন ব্যক্তিই ইহাঁর প্রিয়তম হইতে পারিল না ইনি নিজে যেমন কষ্ট ভোগ করেন ইহাঁর আশ্রিত জনগণও সেইরূপ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। ইনি লোক সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু লোক সংস্রব না পাইলে ইহাঁর প্রতাপ প্রকাশিত হয় না। এইরূপে উভয় বিধ ইচ্ছার সন্ধিস্থলে থাকিয়া ইনি নিতান্ত ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। কৌটিল্য নামক অধর্ম্মের পু দেখিতে অতি সুন্দর। বদন মণ্ডলে মাঝে মাঝে হাসির বিকাশ। লোক সকল ইহাঁর বাহ্যিক দর্শনে বিমোহিত। ইহাঁর কথাগুলি বড়ই মধুর এই মধুর বাক্যে লোক বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্য লাভে চেষ্টাশীল হন। ইহাঁর হৃদয়ের ভাব বাহ্যিক ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে ব্যক্তি ইহাঁর শরণাগত হইয়াছেন তিনি ইহাঁর আশ্রয়ে ক্লেশ ভোগ করিয়া জ্বালাতন হইয়াছেন। হৃদয়ে ইহাঁর শাণিত ছুরিকা। সেই ছুরিকা দ্বারা ইনি ইহাঁর প্রিয়তম আশ্রিতের গলদেশ বিদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহাঁর অন্তরের ভাব দেখিয়া জীব সকল নিতান্ত ত্রাসিত। ইনি জীবের জন্য যে কত প্রকার ফাঁদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইনি ফাঁদ, ছুরিকা প্রভৃতি মারণ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা কোন আশ্রিতকে একেবারে ভবধাম ত্যাগ করান কাহাকে বা নিদারুণ যন্ত্রণা পরম্পরায় নিতান্ত ক্লেশিত করিয়া থাকেন।

অধর্ম্মের কন্যা নিষ্ঠুরতা দেখিতে অতিভয়ঙ্করী। অতীব কোপন স্বভাবা। হস্তে শাণিত তরবারি। স্ত্রীলোক হইলেও ইহাঁর সমস্ত কার্য্য পুরুষোচিত। ইহাঁর শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ হইতে রক্ত যেন বহির্গত হইতেছে। দেহে কমনীয়তার লেশ মাত্র নাই। স্বর অতিশয় কর্কশ। কর্ণে প্রবেশ করিলে ভীতির সঞ্চার হয়। ইহাঁর হৃদয় নিতান্ত নির্ম্মম, নির্দ্দয়। আনুগত্য বা আর্ত্তনাদ ইহাঁকে স্বকার্য্য হইতে বিরতা করিতে পারে না। যেখানে ইহাঁর আগমন, বিভীষিকাময় কার্য্য রাশিতে সে স্থান অতীব ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়া থাকে। কেহ পুত্র কেহ কন্যা কেহ স্বামী কেহ স্ত্রীর জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে। মেদিনী রক্তে প্লাবিতা। ইহাঁর অনুজার নাম পক্ষপাতিতা ইনি আপন পক্ষীয় লোকগণের উপর বড়ই সদয়। নিজের ও নিজ পক্ষীয় লোকের মঙ্গল সাধন করিতে একান্ত তৎপরা বহু বহু তর্ক যুক্তি প্রয়োগ করিলেও ইহাঁর চিত্ত কিছুতেই নিজ পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করিতে কুণ্ঠিতা হয় না। ইনি আপন কার্য্য পালন করিতেছেন, অনুরোধ, বিনয়, শিষ্টাচার কেহই ইহাঁকে তাঁহার করণীয় কার্য্য হইতে বিচ্যুতা করিতে পারেন না।

অধর্ম্মের কন্যা অতৃপ্তিকে সন্তুষ্টা রাখা জীবের অসাধ্য। যতই বিষয় সম্পত্তি উপার্জ্জিত হউক, যতই সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক ইহাঁর তৃপ্তি সাধন কিছুতেই হয় না। ইহাঁর বাসনা অনন্ত ও অসীম। সেই বাসনা পূর্ণ করিতে ইনি সতত সচেষ্ট। অন্যের দুঃখ ক্লেশ ইহাঁর চিত্তকে দুঃখিত করিতে পারে না। ইহাঁর উদর অতি বিশাল, মুখদ্বার বিস্তীর্ণ, চিত্তে আকাঙ্ক্ষা সদাই বিদ্যমান। একটী পূর্ণ হইতে না হইতে অপর একটী আকাঙ্ক্ষা আসিয়া উপস্থিত। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, চিত্তে কোনরূপ আনন্দ বা প্রফুল্লতার বিকাশ নাই। কুমতির গর্ভে অধর্ম্মের দুই যমজ কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই দুই কন্যার মধ্যে একের নাম অসহিষ্ণুতা অপরটীর নাম অধীরতা। এই দুইটী ভগিনী পরস্পর পরস্পরকে বড়ই ভাল বাসিতেন। ইহাঁরা কেহই অপরটীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। এই দুই কন্যার মনোভাব দেখিয়া অনেকেই অভিলাষ করিতেন যে ইহাঁরা এক পাত্রে বিবাহিতা হন। সহ্য করিয়া চলা অসহিষ্ণুতার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য ভাল হউক মন্দ হউক তিনি কোন ক্রমে তাহা সহ্য করিবেন না। ইনি অতি পুরুষ ভাষিনী। মন কিছুতেই

সন্তুষ্ট নহে। ইহাঁর মূর্ত্তি উগ্র। অধীরতা বড়ই চঞ্চলা, স্থিরভাবে কার্য্য করা ইহাঁর পক্ষে অসম্ভব। বিচার করিয়া কার্য্য করিবার সময় ইনি পান না চঞ্চলতা বশতঃ কোন কার্য্যের বিলম্ব ইনি সহ্য করিতে পারেন না।

স্বার্থরাজ ও অধর্ম্ম এক্ষণে পরাপর পরম আত্মীয়। একের কার্য্য সুসিদ্ধির জন্য অপরের পূর্ণ সহানুভূতি ও চেষ্টা। ইহাদের পুত্র কন্যাগণ স্ব স্ব পিতা মাতার ন্যায় শ্বশুর ও শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর পরম আদরের ধন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা পিতা মাতার ন্যায় শ্বশুর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মঙ্গল সর্ব্বদা অন্বেষণ করিতেন। এইরূপে স্বার্থরাজের এবং অধর্ম্মের বংশধরগণ পিতা ও শ্বশুরের সর্ব্ব প্রকারে বিলক্ষণ পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। স্বার্থরাজ ও অধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় ভবনগরে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী কেহই ছিল না। কালক্রমে স্বার্থ রাজের ও অধর্ম্মের পুত্রগণের বহুতর সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে কেহই আপন আপন বংশানুযায়ী গুণগ্রাম লাভে বঞ্চিত হন নাই। ভবনগর নিবাসী জনগণ আপনাদের প্রভুর ও প্রভুর বন্ধুর কার্য্য আদর্শ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রভুর প্রিয় ছিলেন। প্রভু ও প্রভুর বন্ধুর কার্য্য তাঁহারা এরূপ অনুকরণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কার্য্য তাঁহাদের নিকট কিছুমাত্র দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভবনগরে স্বার্থরাজ ও অধর্ম্ম প্রজাবৃন্দের পরম আদরে ধন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাঁদের সুশাসনে জনগণ স্বার্থরাজকে হৃদয়ের অন্তস্তলে বসাইয়া পূজা করিতেন। এই প্রভুর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলে তাঁহার জন্য কোন কার্য্য করিতে বিমুখ হইতেন না। প্রভুর পূজায়, প্রভুর তৃপ্তিলাভে আপনাদের সুখ আপনাদের স্বচ্ছন্দ। পিতা মাতা হউন, সন্তান হউন, স্ত্রী হউন, ভ্রাতা হউন বন্ধু হউন কাহাকেও স্বার্থরাজের প্রীতির জন্য গ্রাহ্য করিতেন না। যদি প্রভুর সন্তোষ কারণ তাহাদিকে নিধন করা আবশ্যক হয় জনগণের মধ্যে অনেকেই সেই কার্য্য করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। অত্যাচার, ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যের দ্বারা' স্বার্থরাজকে নিয়ত পূজা করিতে ব্যস্ত।

তাঁহাদিগের কার্য্য সকল যত বড় বীভৎস হউক যত বড় জঘন্য হউক তাঁহাদের নিকট পরম রমণীয় কুসুম সদৃশ প্রীতিকর এই কুসুমরূপে কার্য্য দিয়া জনগণ প্রায়ই স্বার্থরাজের নিত্য পূজা করিতেছেন তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রভুর তৃপ্তিসাত। ইহাদের প্রভুর জন্য যেরূপ আগ্রহ, যেরূপ যত্ন, যেরূপ চেষ্টা ভগবান্ বা কোন দেব দেবী এই বিশ্বসংসার মধ্যে কখন কোন ভক্তের নিকট এরূপ ভক্তি এরূপ পূজা পান নাই। স্বার্থরাজের প্রিয় ভক্তগণ স্বার্থ রাজের প্রীতিলাভের জন্য পরস্পর কাটাকাটি মারামারি করিতেছেন, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ব্যভিচারাদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে ক্লিষ্ট করিতেছেন তথাপি প্রভুর পূজায় অণুমাত্র অযত্ন নাই। সকল প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির শিরে পদাঘাত করিয়া জোড় হস্তে প্রভুর নিকট উপস্থিত। প্রভো! কিসে তুমি সন্তোষ লাভ করিবে, কিসে তোমার অভিমত সেবা হইবে বলুন অধম ভক্ত তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত। প্রভো! তোমারই সুখে এই অধমগণ সুখী।

ক্রমশঃ—

প্রাপ্ত গ্রন্থ সমালোচনা।

——:০:——

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি পরিচয়।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী, কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ ভাগবতরত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহিত ও প্রণীত। মূল্য ৷৹ আট আনা, নবদ্বীপ, গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান তীর্থ শ্রীনবদ্বীপধাম! এই স্থানেই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দারুময়ী মূর্ত্তি অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছেন ভক্তগণ এই প্রেমময় মূর্ত্তি দর্শনে এখনও আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন, গ্রন্থকার এই মূর্ত্তি সম্বন্ধেই নানা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা একটী যথাযথ পরিচয় দিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কয়েকটী লীলা লহরীও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা ভক্তগণকে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

কাশবং সূর্য্যবচ্চ বহুযুক্তিকত্বং বদতো ত্যবিরুদ্ধং। ন চাস্যৈক্যস্যোপদেষ্টা সম্ভবতি সহি তত্ত্ববিন্ন বা। অদ্যোহদ্বিতীয়মাত্মানং বিজানতস্তস্যোপদেশ্যা পরিস্ফূর্ত্তিঃ। অন্যোত্বজ্ঞত্বাদেব নাত্মজ্ঞানোপদেষ্টৃত্বং। বাধিতানুবৃত্ত্যাশ্রয়ণং তু পূর্ব্বনিরস্তং ॥১৩॥

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

প্রামাণং শ্রুতেঃ। অতঃ কুতর্কে ধীরস্তত্রনমুহ্যতি। অথবা জীবনাশং দেহনাশং বাপেক্ষ্যশোকঃ। নতাবজ্জীবনাশং। নিত্যত্বাদিত্যাহ। নত্বেবেতি। নাপি দেহনাশমিত্যাহ। দেহিন ইতি, যথা কৌমারাদি দেহহানেন জরাদি-প্রাপ্তাবশোকঃ এবং জীর্ণাদি দেহহানেন দেহান্তরপ্রাপ্তাবপি ॥১৩॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

কৌমারাদি শরীর ভেদেও দেহী আত্মার দ্রষ্টৃত্ব ঈক্ষিতৃত্ব যেমন সিদ্ধ রহিয়াছে, দেহান্তর প্রাপ্তিতেও তাহার কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না, বৃদ্ধাবস্থায় আমি কুমার ছিলাম বলিয়া যেমন স্মরণ হয়। দেহান্তর পরিগ্রহে মায়া শক্তির আধিক্যতা নিবন্ধন, পূর্ব্বদেহের সেরূপ স্মরণ সকলকার হয় না। যে জীব কথঞ্চিৎ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে তাহার পূর্ব্বদেহের ও অবস্থার স্মরণ হইয়া থাকে, ইহা পৌরাণিক আখ্যায়িকার আলোচনায় অনেক স্থলেই দেখা যায়, রাজা ভরত মৃগ দেহ ধারণ করিলেও তাঁহার পূর্ব্ব প্রত্যভিজ্ঞা অবিকৃতই ছিল। কারণ ঈক্ষণ কার্য্য আত্মার, উহা জড় শরীরের নহে, আত্ম-সম্বন্ধ বিচ্যুত দেহের, অনুভব সামর্থ্য থাকে না, তখন দেহ মৃতআখ্যায় অভিহিত হয়। এবং সেই দেহ অত্যন্ত প্রিয় বা মমত্বের আস্পদ হইলেও, তাহাকে সকলেই ত্যাগ করিয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে মমত্বাদি বুদ্ধি দেহের নহে উহা আত্মার। যদি বল প্রাণাদি বায়ুর অপগমে অনুভব নষ্ট হয়, এবং উহার বিদ্যমানেই "আমি মনুষ্য" ইত্যাকার অনুভব হয়। অতএব অনুভবিতৃত্বধর্ম্ম আত্মার না হইয়া উহা প্রাণেরই ধর্ম্ম। এরূপ আশঙ্কা করিতে পারা যায় না, সুপ্তাবস্থায় দেহ পূর্ব্ববৎ অবিকৃতভাবে অবস্থিত থাকিলেও এবং প্রাণাদি বায়ু স্ব স্ব কার্য্য করিলেও, আত্মা কার্য্য হইতে অপসৃতাবস্থায় অবস্থান করেন বলিয়া, কোন বিশেষ অনুভব হয় না। সুতরাং প্রাণকে অনু-

ভবিতা বলা চলিতে পারে না। শ্রুত্যাদি বাক্যে আত্মাকেই অনুভবিতা বলা হইয়াছে। শ্রুত্যাদি বাক্যের প্রমাণ অবিসম্বাদিত; এবং অনুভব সিদ্ধ। ঋত্বিকাদি দ্বারা আমি কার্য্য করাইয়া থাকি কেন? শাস্ত্র বলিয়াছেন, ঋত্বিক সম্পাদিত কর্ম্মের ফল আমি পাইব, ইহা স্বকীয় অনুভবসিদ্ধ এইরূপ কতকগুলি প্রত্যক্ষের যেমন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তদ্রূপ বেদান্তের "শ্রুতেশ্চ" এই সূত্রে, ঋত্বিক সম্পাদিত কর্ম্মফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাসাসত ইতি হো বাচেতি তস্মাদুহৈবংবিদ্‌ উদ্গাতা ব্রূয়াং কংতে কামমাগায়নি ইতি ঋত্বিক্ সম্পাদিতস্য কর্ম্মণঃ যজমান গামিফলং দর্শয়তি।" অর্থাৎ "যাংবৈ কাঞ্চন" শ্রুতি হইতে ঋত্বিক্ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল যজমান দক্ষিণা প্রদান দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিয়া স্বয়ং প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ফল প্রাপ্তি বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ।

ইহা বৌদ্ধাদির বাক্যের ন্যায় বৃথা নহে। বৌদ্ধের বাক্য পৌরুষেয়। শ্রুত্যাদি শাস্ত্র বাক্য অপৌরুষেয়। পৌরুষেয় বাক্যের প্রমাণ্য স্বীকার করিলে দোষ আপতিত হইয়া থাকে। অপৌরুষেয় বিষয়ে পৌরুষেয় অজ্ঞানাদি কল্পনা করা সম্পূর্ণ অনুচিত। অনাদি কাল হইতে অপৌরুষেয় শ্রুত্যাদি বাক্যের যে প্রামাণ্য স্বীকার হইয়া আসিতেছে উক্ত শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ স্বীকার ব্যতিরেকে অভিমত সকল বস্তু বা ধর্ম্ম যে সকল অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং বহু দোষের হাত হইতে নিস্তার পাইবার পক্ষে এক অপৌরুষেয় বাক্যের প্রমাণ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য। অতএব ধীর ব্যক্তি কখন কুতর্কে মোহিত হইয়া অবিষয়ে শোক করেন না। দ্বিতীয় কথা আত্মা যখন নিত্য, তখন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া শোক হইতে পারেনা। এবং দেহকে আশ্রয় করিয়াও শোক হইতে পারে না, কেন না কৌমার দেহের নাশে যখন শোক করিনা তখন জীর্ণ দেহের নাশে দেহান্তর প্রাপ্তি শোকের কারণ হইতে পারে কি?

এখানে মনের মধ্যে আর একটী সংশয় আসিতে পারে, যে জীর্ণ দেহ ত্যাগে শোক করিতে নিবারণ করিলেন, উহা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা অন্য নানা প্রকারে প্রত্যহ যে সকল লোককে কৌমারাদি অবস্থায় মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে দেখিতেছি, তন্নিমিত্ত শোক না হইবে কেন?

পূজ্যপাদ ভাষ্যকার এখানে জীর্ণ শব্দ প্রয়োগ করিয়া উহার উত্তর প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা জীর্ণ বলিয়া বহুকালের পুরাতন কীটাদি দষ্ট বস্তু বুঝিয়া থাকি। কিন্তু নবীন সুন্দর যুবা পুরুষকে দেহ ত্যাগ করিতে দেখিলে ও সেখানে আমরা উহার শরীর জীর্ণ বলিয়া বুঝিব। জীর্ণ অর্থে যেমন পুরাতনকে বুঝাব, তেমনি যাহার পরিপাক হইয়া গিয়াছে তাহাকেও জীর্ণ বলিযা অভিহিত করা হইয়া থাকে। "জীর্ণমন্নং প্রশংসনীয়াৎ" এখানে যাহার পরিপাক হইয়াছে তাহাকেই বুঝাইতেছে। বলিষ্ঠ যুবা পুরুষের আকস্মিক মৃত্যু দেখিয়াও আমরা শোক করিব না কারণ আমরা বুঝিব যে, কর্ম্মের ফলে এই ব্যক্তি সুন্দর মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া আমাদিগের সহিত স্নেহাদি বন্ধনে এতদিন সম্বন্ধ ছিল, আজ উহার সেই কর্ম্ম জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া দেহাদি প্রাপ্তি সেই কর্ম্মই যখন চলিয়া গেল তখন আর দেহ কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। নিমিত্তের নাশে নৈমিত্তিক কখন থাকিতে পারে না ইহা সার্ব্বজনীন সিদ্ধান্ত। জীব নিত্য, আনুবিক্ষণীক কীট হইতে আরম্ভ করিয়া জীব-জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই জীব, এবং সকলেই কর্ম্মানুসারে দেহধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার আকার ও নামে বিভিন্ন কর্ম্ম করিতেছে।

জীবের কর্ম্মানুরূপ দেহ ধারণ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য মহাশয়ও তদীয় বেদান্ত ভাষ্যে লিখিয়াছেন "সৃষ্ট্যুত্তর কালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম, কর্ম্মাপেক্ষশ্চ শরীরাদি বিভাগ ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসজ্যেত।"

অর্থাৎ সৃষ্টির উত্তর কালে শরীরাদি বিভাগাপেক্ষায় কর্ম্ম এবং কর্ম্মাপেক্ষায় শরীরাদির বিভাগ, এইরূপে কর্ম্ম ও শরীরাদির পরস্পরাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ঐতরেয় উপনিষদও বলেন "সোহস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে অথাস্যাহয়মিতর আত্মা কৃত কৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি স ইতঃ প্রযন্নেব পুনর্জ্জায়তে।" ঐভাষ্য পুণ্যেভ্য শাস্ত্রোক্তেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ জীর্ণঃ সন্ প্রৈতী ম্রিয়তে। স ইতোহস্মাৎ প্রযন্নেব শরীরং পরিত্যজন্নেব তৃণ জলুকাবদ্দেহান্তর মুপাদদানঃ কর্ম্মচিতং পুনর্জ্জায়তে।" অর্থাৎ আত্মা পিতা শাস্ত্রোক্ত পুণ্য কর্ম্ম ফলে যাহাকে পুত্ররূপে প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিবার জন্য রাখিয়া গেলেন,

পুনশ্চ তাহার কর্ম্ম শেষ হইলে, সেই আত্মাও দেহের ভোগ কালান্তে গতবয়ো বা জীর্ণাবস্থায় এখান হইতে প্রকৃষ্ট গমন অর্থাৎ মৃত্যুমুখে আপতিত হইয়া থাকে। আপতনশীল সেই আত্মা তদবলম্বিত শরীর পরিত্যাগাবসরে তৃণ জলৌকার ন্যায়, নিজ কর্ম্মার্জ্জিত শরীরকে অবলম্বন করিয়া পুনশ্চ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এখানে "প্রযম্নেব" এই "এব" শব্দের দ্বারা উক্ত আত্মার শরীরান্তর গ্রহণ যে অবিলম্বে ও অব্যবধানে সংসাধিত হইয়া থাকে তাহা দেখান হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে।

"দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনু প্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥
ব্রজংস্তিষ্ঠন পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথাতৃণ জলৌকেবং দেহী কর্ম্ম গতিং গতঃ॥"

অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য বিভিন্ন দেহাশ্রয়ি জীবের ভোগায়তন দেহের পঞ্চত্ব হইলে, স্বকীয় কর্ম্মানুসারে দেহান্তরে গমন কালে, দেহী আত্মা অবশ ভাবে নিজকর্ম্ম লব্ধ অপর দেহকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব স্বীকৃত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। গমন শীল ব্যক্তি যেমন একপদ উত্তোলন করে, অথবা তৃণ জলৌকা (জোঁক) যেমন তৃণান্তরকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জীবের দেহত্যাগ অপর দেহকে অবলম্বনান্তর হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে জলৌকার তৃণান্তর গ্রহণ তাহার স্বেচ্ছামত, আর জীবের দেহান্তর পরিগ্রহণ কর্ম্ম প্রেরিত, জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম তাহাকে যে দেহ চালিত করে, জীব অবশ ভাবে তাহাকেই আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়। এই দেহ গ্রহণ বিষয়ে জীবের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না, জীব কর্ম্ম পরাধীন ভাবেই তাহা পরিগ্রহণ করে। জলৌকার তৃণান্তর পরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দ্বারা জলৌকার তৃণান্তর গ্রহণে তাহার যেমন কোন বিকার আসে না. তদ্রূপ দেহী আত্মার দেহান্তর পরিগ্রহে উক্ত আত্মার যে কোনরূপ বিকার স্পর্শ করে না, ইহাহইতে তাহাও দেখান হইয়াছে। এই দেহান্তর পরিগ্রহ যোগজ সিদ্ধি বলে যোগীগণও করিয়া থাকেন শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির পরকায় প্রবেশ, শুক মহাশয়ের বৃক্ষের মধ্য হইতে উত্তর প্রদান প্রভৃতির বিষয় আমরা দেখিতে পাই। পরকায় প্রবেশে আত্মার প্রত্যভিজ্ঞা

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ননু ভীষ্মাদয়ো মৃতাঃ কথং ভবিষ্যন্তীতি তদ্দুঃখনিমিত্তঃ শোকোমাভূৎ। তদ্বিচ্ছেদদুঃখনিমিত্তস্ত যে মনঃপ্রভৃতীনি প্রদহন্তীতি চেত্তত্রাহ মাত্রেতি। মাত্রাস্তগাদীন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তে বিষয়া আভিরিতি ব্যুৎপত্তিঃ। স্পর্শাস্তাভির্বিষয়াণামনুভবাস্তে খলু শীতোষ্ণসুখ দুঃখদা ভবন্তি। যদেব শীতল-

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

তথাপি তদ্দর্শনা ভাবাদিনা শোক ইতি চেন্নেত্যাহ। মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে ইতি মাত্রা বিষয়ঃ তেষাং স্পর্শাঃ সম্বন্ধাঃ তএব শীতোষ্ণসুখ দুঃখদাঃ। দেহেশীতোষ্ণাদিসম্বন্ধাদ্ধি শীতোষ্ণাদ্যনুভব আত্মনঃ। ততশ্চ সুখদুঃখে,

তাৎপর্য্যানুবাদ।

পূর্ব্ববৎ অবিকৃতই থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত মহর্ষি বেদ ব্যাসের কাতর আহ্বানে শুক দেবের বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে উত্তর প্রদান ইহার একটী প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদুঃ"

এখানে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া উত্তর প্রদান করিলে, কি জানি যদি মায়াবন্ধনে পতিত হইতে হয়। এই আশঙ্কায় তিনি বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে জীবের দেহান্তর পরিগ্রহণ সম্বন্ধে দেহের জীর্ণতা অপেক্ষা করেনা, দেহারম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়েই দেহের নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং হে অর্জ্জুন! জীবের দেহান্তর পরিগ্রহণ সম্বন্ধে তোমার শোক করা কোন ক্রমে সঙ্গত নহে ॥১৩॥

অর্জ্জুনের হৃদয়ে যেন পুনশ্চ আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, হে ভগবান! দৃষ্টান্তে যে জরাবস্থায় নবীন দেহের বিনাশে শোকের অভাব বিষয়ে উপদেশ করিলেন, তাহা শোকের বিষয় না হইতে পারে। কারণ একদিন যাহাকে নবীন দেহধারী দেখিয়াছিলাম, আজ তাহাকে জরাগ্রস্ত দেখিতেছি। তাহার সহিত আমার যে

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

সুখদং গ্রীষ্মে সুখদং তদেব হেমন্তে দুঃখদমিত্যতোহনিয়তত্বাদাগমাপায়িত্বাচ্চানিত্যানস্থিরাংস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব। এতদুক্তং ভবতি। মাঘস্নানং দুঃখকরমপি ধর্ম্মত্বয়া বিধানাদ্যথা ক্রিয়তে তথা ভীষ্মাদিভিঃ সহ যুদ্ধং দুঃখকরমপি তথা বিধানাৎ কার্য্যমেব তত্রত্যো দুঃখানুভবস্ত্বাগন্তুকো ধর্ম্মসিদ্ধত্বাৎ সোঢ়ব্যঃ। ধর্ম্মাজ্জ্ঞানোদয়েন মোক্ষলাভহেতুত্তরত্র তস্য নানুবৃত্তিশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠা পরিপাকং বিনৈব ধর্ম্মত্যাগস্ত্বনর্থহেতুরিতি। কৌন্তেয় ভারতেতি পদাভ্যামুভয়কুলশুদ্ধস্য তে ধর্ম্মভ্রংশোনোচিত ইতি সূচ্যতে॥১৪॥

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

নহ্যাত্মনঃ স্বতোদুঃখাদিঃ সম্ভবতি। কুতঃ? আগমাপায়িত্বাৎ। যদ্যাত্মনঃ স্বতঃস্যুঃ সুপ্তাবপি স্যুঃ। অতোযতোমাত্রাস্পর্শাজাগ্রদাদাবেব তে সন্তিনান্যদেতিতদন্বয়ব্যতিরেকিত্বাত্তন্নিমিত্তা এব নাত্মনঃ স্বতঃ। আত্মনশ্চ দেহৈর্বিষয়বিষয়িভাবসম্বন্ধাদন্যঃ সম্বন্ধো নাস্তি। ন চাগমাপায়িত্বেহপি প্রবাহরূপেণ নিত্যত্বমস্তি সুপ্তিপ্রলয়াদাবভাবাদিত্যাহ। অনিত্যা ইতি। অতশ্চাত্মনো দেহাদ্যাত্ম ভ্রম এব সুখদুঃখকারণং। অতস্তদ্বিমুক্তস্য বন্ধুমরণাদি দুঃখং ন ভবতি। অতোহভিমানং পরিত্যজ্য তান্ শীতোষ্ণাদীংস্তিতিক্ষস্ব॥১৪॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

মমতাজনক সম্বন্ধ ছিল, তাহা পূর্ব্ববৎ অবিকৃতই রহিয়াছে তাহার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। কিন্তু সেই দেহের সম্পূর্ণ বিনাশ হইলে, আমার সেই মমতা সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হইবে, আর যখন তাহাকে আমার বলিয়া দেখিতে পাইব না, তখন তাহার জন্য শোক না করিব কেন? আজ যে ভীষ্মাদিকে পিতামহাদি সম্বন্ধে মমতাস্পদ জানিয়া আমোদানুভব করিতেছি, কালে তাহাকে দেখিতে পাইব না মনে করিয়াই আমার চিত্ত তাপানুভব করিতেছে সুতরাং শোক পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিনা।'' ভগবান অর্জ্জুনের এতাদৃশ মনের অবস্থা জানিয়া যেন পুনশ্চ বলিতেছেন; এজন্য শোক করাও অসঙ্গত, ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ

করা হয় উহাই স্বগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিভূত বিষয়, ঐ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্পর্ক ঐ সম্বন্ধই শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। এখানে কেহ বলেন, চিত্ত ইন্দ্রিয় প্রণালিকা দ্বারা বিষয়ে যাইয়া পতিত হয়েন, এবং তৎকালে চিত্তের স্বচ্ছতা তিরোহিত হইয়া উহা বিষয়াকারে আকারিত হওয়ায়, বিষয়ের সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম তাহার নিজের বলিয়া অনুভব হয়। জলে পতিত প্রতিবিম্ব যেমন জলের কম্পনসহ কম্পিত হইতেছে বলিয়া অনুভূত হইলেও বাস্তবিক বিম্বভূত বস্তু কম্পিত হয় না। তদ্রূপ সুখ দুঃখাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে, বিষয়ের সম্বন্ধে উহার অনুভব অপরে বলেন; সুখাদি আত্মার নিত্যগুণ, কিন্তু যখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষ হয়, তৎকালেই উহার গ্রহণ হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয় যদি বহির্বিষয় গ্রহণ হইতে বিরত থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ সুখ দুঃখের কারণ থাকে না। তজ্জন্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আবশ্যক। মৌলিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায় ঋতু বিশেষে একই জল যেমন সুখের কারণ হইতেছে, আবার সেই জলই সময়ান্তরে দুঃখের হেতু হইতেছে, এই অনিয়তব্যভিচারী ভাবাপন্ন শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখের কারণ নহে, অবস্থানুসারে দেহেন্দ্রিয়ের সহিত পরস্পর্য্য সম্বন্ধেই সুখ দুঃখ আনয়ন করে। অনুভব চেতনের ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি নাই, ইহা অনুভব সিদ্ধ 'চক্ষু দেখিল, কর্ণ শ্রবণ করিল,' কেহ একথা বলে না। আমি দেখিলাম, আমি শ্রবণ করিলাম, এইরূপই ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং ইন্দ্রিয় বিষয়কে আত্মার সহিত মিলিত করাইয়া সুখ দুঃখের অনুভাবতা করে। আত্মায় সুখ দুঃখাদির সম্ভব হয় না, যেহেতু আত্মা নিত্য সুখ দুঃখাদি আগমাপায়ী অনিত্য। যাহার উৎপত্তি ও নাশ আছে তাহাই অনিত্য। অনিত্যের সহিত নিত্যের ঐক্য সম্ভব হইতে পারে না। যদি ইহা আত্মার স্বতঃ সিদ্ধ ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে অসার বা অপার থাকিত না। সুষুপ্তিকালেও ইহার অনুভব থাকিত, কিন্তু যখন অত্যন্ত শোকাতুরকেও সুখে নিদ্রা যাইতে দেখা যায়, তখন জাগ্রতাবস্থায় বিষয় সম্বন্ধ দুঃখের কারণ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। যেখানে বিষয়ের সম্বন্ধ নাই সেখানে সুখ দুঃখও নাই এইরূপে বিষয় ইন্দ্রিয়ের পরস্পর অন্বয় ও ব্যতীরেক ভাব সিদ্ধ হওয়ায় উহা যে আত্মার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে তাহা স্থির। সুতরাং আত্মার সহিত সুখ দুঃখের বিষয় বিষয়ী ভাব সম্বন্ধ ভিন্ন অপর কোন নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করা

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥১৫

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ধর্ম্মার্থ দুঃখ সহনাভ্যাসস্যোত্তরত্র সুখহেতুত্বং দর্শয়ন্নাহ যং হীতি। এতে মাত্রাস্পর্শাঃ প্রিয়াপ্রিয়বিষয়ানুভবা যং ধীরং ধিয়মীরয়তি ধর্ম্মেষিতি ব্যুৎপত্তে

মাধব-ভাষ্যম্।

অতঃ প্রয়োজনমাহ। যংহীতি। যমেতে মাত্রাস্পর্শানব্যথয়ন্তি। পুরিশয়-মেবসন্তং। শরীরসম্বন্ধাভাবে সর্ব্বেষামপি ব্যথাভাবাং পুরুষমিতি বিশেষণং। কথং নব্যথয়ন্তি। সমদুঃখ সুখত্বাং। তংকথং ধৈর্য্যেণ॥১৫॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

যাইতে পারে না। এখানে প্রবাহরূপে ও নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না, আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সুষুপ্তি বা প্রলয়াদিতে উহা থাকে না। সুতরাং যাহার প্রবাহ নাই তাহার প্রবাহ রূপে নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না। আত্মা সুখ দুঃখাতীত নিত্য পদার্থ হইয়াও যে ঐ সকল অনুভব করেন, তাহার কারণ দেহকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করা, যখন নিজেকে দেহ বলিয়া মনে করেন, তখনই মনন কৃত তাবৎ দৈহিক অনর্থ আসিয়া উপতাপিত করিতে থাকে। অতএব অনিত্য ও অস্থির ঐ সকল দৈহিক তাপকে সহ্য কর। হে কৌন্তেয় দেখ, বহু পুরাণাদিতে মাঘ মাসের বিশেষ ধর্ম্ম লিখিত হওয়ায়, ধর্ম্মের সাধক বলিয়া দুঃখ জনক হইলেও লোকে শীতোপেক্ষা করতঃ ঐ মাঘ স্নান করিয়া থাকে। তদ্রূপ ভীষ্মাদির সহিত যুদ্ধ দুঃখ জনক হইলেও, তুমি ক্ষত্রিয় যুদ্ধ তোমার ধর্ম্ম অতএব ধর্ম্ম বুদ্ধিতে উহা করাই কর্ত্তব্য। ঐকারণ যে শোক উহা আগন্তুক। তুমি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বন্ধু-মরণাদি-নিবন্ধন সুখ দুঃখাদিকে সহ্য কর, এই সহিষ্ণুতাই পুরুষার্থ লাভের হেতু। শ্রীভগবান এখানে অর্জ্জুনকে কৌন্তেয় ও ভারত, এই উভয় আখ্যায় সম্বোধন করিয়া তাঁহার পিতৃ মাতৃকুলের গৌরব স্মরণ করাইয়া যেন বলিয়াছিলেন, তুমি সংকুল সম্পন্ন তোমার পক্ষে ধর্ম্মত্যাগ করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না যেহেতু ক্ষণবিধ্বংসী আত্মার ধর্ম্মই একমাত্র অবলম্বন। আজ তুমি যদি শোক ভয়ে ধর্ম্মত্যাগ কর, তাহা হইলে জগতের সামান্য ব্যক্তীরা ধর্ম্মাচরণে কাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। সুতরাং তুমি অবিচলিত চিত্তে কর্ত্তব্য পরায়ণ হও॥১৫॥

অর্জ্জুন যদি মনে করেন; এই জগতের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানী মনুষ্য পর্য্যন্ত কাহাকেও বিনা প্রয়োজনে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে

ভক্তি ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৌষমাস, ১৩২৪ ।

সঙ্ক্ষেপ কথা।

সকলেরই ইচ্ছা আমি বড় হই, এই বাসনা হৃদয়ে উঠিলেই অমনি অন্য সকলকে ছোট না করিলে চলে না। নিজে বড় হ'তে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপরকে ছোট ক'রে দেওয়া হয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই অমনি অভিমান এসে আপনার অনুচরগণকে লইয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসে। হায়! হায়! তখন বড় হওয়া তো হয়-ই না, অধিকন্তু যা ছিলাম তা' হ'তেও নেবে "আস্তাকুড়ে" কত কালের ভাঙ্গা ত্যাজ্য ময়লা যুক্ত জিনিস পত্র ল'য়ে কারবার করিতে হয়। তাই না একদিন শ্রীরূপ ও সনাতন আমাদিগের যাহা প্রার্থনীয়, আত লোভনীয় বিষয়-বৈভব, মান সম্ভ্রম, তাহা ত্যাগ করিয়া গৌর-প্রেমে কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন ? আর সেই জন্যই না জ্ঞানের যাবতীয় গরব দূরে ফেলিয়া একদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বৈদান্তিক শিরোমণি প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিয়াছিলেন ;—

* * * জ্ঞানের গরব আর না করিব—

সব ছেড়ে ফেলে গৌরহরি ব'লে (আমার) নাচিতে বাসনা হ'য়েছে ॥'

তাই বলি ভাই! তুমি আমি কোন ছার, বড় বড় মহা মহা রথীদিগেরও যখন এই কথা, তখন আইস ভাই সরলপ্রাণে বলি,—

জ্ঞানের বড়াই চাইনা আমি দাস হ'তে হে অভিলাষী।
(তোমার) অভয় পদে লুটিয়ে মাথা থা'কবো সুখে দিবানিশি ॥
অভিমানের দারুণ বোঝা ভাসিয়ে দিলে নয়ন জলে,
তোমার হ'য়ে থাকবো নাথ আমার আমি যাব ভুলে,
সেদিন আমার হবে হে ভবে [illegible],—
চরণতলে স'পেদিব জ্ঞান গরিমা [illegible] ॥

হায়! হায়! কবে এমন ক'রে প্রাণ খুলে ভাবুকের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারিব,—

* * * *

"সেই যে শিরে মোহন চূড়া সেই যে হাতে মোহন বাঁশী।
সেই মুরতি দেখবো ব'লে পরাণ আমার অভিলাষী॥
(একবার) বাঁকা হ'যে দাঁড়াও শ্যাম, আগো করি কুঞ্জদুয়ার—
এস আমার হৃদয় মাঝিক বেদবেদান্তে কাজ কি আমার॥"

বল ভাই, একবার দুইবার নয়, লোক দেখান বলা নয়, যথার্থ প্রাণে প্রাণে, আপন হারা ভাবে, দুটিকর যুক্ত করিয়া, মহাপুরুষের সুরে সুর মিলাইয়া বল দেখি ?—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

দীন শ্রী—

শ্রীখুন্তির আত্ম-কথা। *

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩শ বর্ষের ৭২ পৃষ্ঠার পর)

—:০:—

ঐ যাঃ! কি হারা হ'য়ে একেবারে কোথায় গিয়াছিলাম!! অনেক দেশ বিদেশ ঘুরে, রকম বেরকম দেখে আজ ফিরে এসে দেখি, তোমরা আমাকে কিছুতেই ছাড়ান্ দিবে না। কাজেই যা বল্‌ছিলাম বলি—

তারপর কি হ'ল জান? বৃদ্ধ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মহাশয় যখন দেখ্‌লেন, আমার দয়াময় প্রভু বেশ ঠাণ্ডা হ'য়েছেন, তখন আহ্লাদে ধেই ধেই নাচন সুরু ক'রে বল্‌লেন ;—

* নানা কারণে শ্রীখুন্তি মহাশয় স্থানান্তরে গমন করেন ; এবং ফিরিয়া আসার পর কি কারণ জানিনা তাঁর বাক্য বন্ধ ছিল। অধুনা পুনরায় তিনি প্রচার করিতে বসিয়াছেন। ভক্তির সহৃদয় পাঠকগণ, এক্ষণে নিয়মিত ভাবে তাঁহার কাহিনী পাঠ করিতে পারিবেন বলিয়াই আশা করা যায়। (ভক্তি-সম্পাদক।)

"যোষে যাত্র চারি বেদে, যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেখে ॥"

বৃদ্ধ এই একবার দণ্ডবৎ প্রণাম, এই একবার গড়া গড়ি, এই হয়ত কম্প অশ্রু, কিযে ক'র্বে কিছু ঠিক পায় না "হাকাই ঝাঁপাই" যখন আর পায়ে না, তখন শ্রীপ্রভুর দু'ইটী শ্রীচরণে মস্তক রক্ষা ক'রে চরণদুটী দর দর ধারায় অভিষিক্ত ক'রে গদ গদ বচনে পুনঃ পুনঃ স্তব কর্তে লাগিলেন—

"তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন ॥
তুমি সে বরাহ, প্রভু তুমি সে বামণ।
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন ॥"—

দয়াময় আর থাক্তে পারলেন্ না।—করলেন্ কি জান?

"সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়,
চরণ তুলিয়া দিলেন, অদ্বৈত মাথায়।"—

ওহে নব্যের দল! হাঁস্‌ছ কেন? আগে বুঝে দ্যাখো তার পর ঐ অবজ্ঞার হাঁসি হাঁসিও। ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের সেকেলে পয়ার "পাইলুঁ" "নাচিলুঁ" "চাহিমু" পাঠ ক'রে বুঝি অত হাঁস্‌ছ? একটু তলিয়ে, ভাল ওস্তাদের কাছে শিক্ষা কর্‌লেই বুঝ্তে পার্‌বে, এই যে শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভুটি, আর এই যে তাঁর লীলা, এর মধ্যে তোমাদের সমস্ত নব্য-দর্শন (Philosophy) ত' আছেই, তা ছাড়া এতে, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, মিমাংসা ও বেদ-বেদান্তের সার তত্ত্ব পূর্ণ ভাবে আছে। বলি এত হাঁস কেন হে বাপু।—তোমাদের মতে যাহাদের "হোম্‌রা" "চোম্‌রা"র (Theory) সিদ্ধান্ত আছে, তাদের সমস্ত 'গুলোর'ই দেখা সাক্ষাৎ ইহাতে পৃথীর কোণে টেঁকার মত অবজ্ঞার ভাবে রক্ষিত দেখ্‌তে পাবে, বুঝ্‌লে বাপু?

ঐযে অদ্বৈত প্রভুর "তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম" প্রভৃতি স্তব, এতেই তোমার 'ডারউইন্,' টিণ্ডেল্, মোক্ষ-মূলার, ডেমক্রিটস্ প্রভৃতি 'হৈ হৈ এ'র দলের মতামতের পিণ্ড প্রয়োগ বিধি ধার্য্য করা আছে। বাপু হে, হেঁস্ না। এ দলের এক সর্দ্দার জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেছে—

"————and in my ignorance of it all I have asked myself * * * can it be possible that man's knowledge is the greatest knowledge ?—পারে নি বাপু! পারেনি, বুঝে গেছে—"মানবের চিন্তা শক্তি যে স্থানে রোধ হইয়াছে সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবানের কার্য্য সেই স্থান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।"—"যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে"; "মন্মনসা ন মনুতে";

তাই বলছি বাপু! ফিক্ ফিক্ করে হেঁসোনা। বিশ্বাস কর্ কিম্বা বিশ্বাস কর্‌তে শিক্ষা কর। দেখ্‌বে—আমার প্রভুর সম্পত্তির, দক্ষিণ সীমানায় কবিতার মধুর ঝঙ্কার হ'তেও মধুর ঝঙ্কার স্থায়ী ভাবে আছে; পূর্ব্ব সীমানায় দর্শনের সার দর্শন পুঞ্জিকৃত ভাবে অবস্থান কর্‌ছে; পশ্চিম সীমানায় বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত বহু কালের দম্ভে পদাঘাত করিয়া স্থির ভাবে অবস্থিত; আর উত্তর সীমানায় সমস্ত প্রতি-উত্তরকে ভাসাইয়া, ডুবাইয়া প্রেম মন্দাকিণীর প্রবাহ মালা। তথায় লুপ্ত জ্ঞান, ঝন ঝনে তর্ক, মসি বদন সন্দেহকে বিধৌত করিয়া স্ফীত হৃদয়ে ঘোষণা করিতেছে।

"এ দেহ এমন এ অন্তর।
তব তরে কাঁদে নিরন্তর॥
* * *
তোমাতেই পেয়েছি সকলি।
পান করে মন প্রাণ অলি॥
ও চরণ কমল আঁমিয়া।
চারি ধারে বেড়ায় ভ্রমিয়া॥
এ দেহ এ মন এ অন্তর।
তব তরে কাঁদে নিরন্তর॥"

যাও নব্য! যাও বিরুদ্ধ বাদী। যাও চঞ্চল চেতা! একবার প্রভুর রাজ্যের যে কোনও দিকের যে কোনও একটা সীমানার তল্লাস ক'রে দেখ্‌বে, বুঝ্‌বে, হৃদয়ে অনুভব কর্‌বে, বুড়ো খুড়ি যা' বল্লে তা একেবারে "ভীমরতি" বা "বাহাত্তুরের" প্রলাপ নয়। দেখ্‌বে কথা ঠিক্—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভব।

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ম্
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বম্ পরমিহ।—

দূর হোক্ গে ছাই !! আমার এ দোষ ত কিছুতেই যাবার নয়, কি বল্‌ছিলাম, আর কি বল্‌ছি !!

হ্যাঁ তারপর—

শ্রীপ্রভু বল্‌লেন "নাড়া আজ আমার কীর্ত্তনে তুমি নৃত্য কর।" বাপ্‌রে কি সে কীত্তন !! আমার ঠিক স্মরণ হয় না, অনেক দিনের কথা, কিন্তু এটা বেশ মনে হয় কাজী মিয়া মহাশয়কে দমন করিতে যেদিন প্রভু কীর্ত্তন করেন সে দিনকার কীত্তন এবং আজকার এই কীর্ত্তন ; কীর্ত্তনের এরূপ ভাব বোধ হয় অতি অল্পই হইয়াছিল। যা' হউক এইরূপ ভাবে খুব আনন্দ চলিল। বিশেষতঃ বৃদ্ধ আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈতের নৃত্যে সমবেত সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তগণ যেন — "আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলা কেবল।" শেষে শ্রীশ্রীপ্রভু, শ্রীআচার্য্যের মস্তকে বড় স্নেহে বড় আদরে হাত দিয়া বল্‌লেন "বর মাগ" এবং নিজের গলদেশ হইতে মাল্য গ্রহণ করিয়া শ্রীহস্তে অতি আদরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গলে দিলেন, বৃদ্ধ যেন প্রেমানন্দে "ডগ মগ" কর্‌তে লাগ্‌লেন।

আহা সে কি দৃশ্য। সে দৃশ্য শুধু ভাবিবার, শুধু ধ্যান করিবার। কাহার সাধ্য তাহা ভাষায় বর্ণনা করে, কাহার সাধ্য তাহা কেবল বাক্যের দ্বারা অপরের হৃদয়ে আঁকিয়া দিতে পারে। প্রভু যত বলেন "আচার্য্য বর মাগ" আচার্য্য ততই প্রভুর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া দর দর ধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে নির্ব্বাক হ'য়ে থাকেন। কিন্তু সেই নির্ব্বাক অবস্থায়, সেই নির্নিমেষ নয়নে কি বলে জান ?

সে যেন বলে "হে প্রভু ! হে স্বামিন্ ! আমার বাসনা তুমি ; আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত বাঞ্ছার সার তুমি।"

এ ভাব শ্রীআচার্য্যের দৃষ্টিতে ব্যক্ত হ'ল মাত্র। কিন্তু বাক্যে সদাশিব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন ;—

"যদি ভক্তি বিলাইবা,
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।"

বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যায় মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে॥

সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়া॥

এ'টা হ'ল জ্ঞানীর কথা। জ্ঞানীতে প্রেমিকেতে তফাৎ ঐখানে। জ্ঞানীর উত্তর "জগতের উপকার মানবের উপকার" ইত্যাদি। অর্থাৎ জ্ঞানে (reason চলে) উত্তর প্রতি উত্তর চলে প্রেমে তা' চলেনা। প্রেম বলে "ওসব জানিনা।" সে বলিবে ওগো! আমি কি জানি; আমি কি বলতে পারি; আমি কি চাইতে পারি; আমিও ত' তাঁরই; তিনিই সব জানেন।

ঐ যাঃ কি কথায় কোথায় এসেছি!! হ্যাঁ তারপর, এই রকম ত' চল্‌তে লাগ্‌লো; শ্রীনবদ্বীপে সদাই কীর্ত্তনের রোল। সর্ব্বদাই শ্রীপ্রভু, দাদা নিত্যানন্দ, বৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস প্রভৃতিকে লইয়া মহা আনন্দে থাকেন। আর বিশেষ মজা করেন মহাসঙ্কর্ষণ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। কি করেন?— তিনি বাসা নিলেন শ্রীবাসের ঘরে, বোধ হয় মনে আছে ইনি হচ্ছেন সেই ঝগ্‌ড়াটে ভক্ত শ্রেষ্ঠ নারদ; এখানে হয়েছেন শ্রীবাস, বুঝ্‌লে?—শ্রীপাদ এঁর বাড়িতে ঠিক একটী শিশুর ভাবে, সরল চাপল্যে, সরল বালকোচিত ভাবে, দুরন্ত বালকটীর মত নানা লীলা করেন।

কোথায়ও কিছু নাই, হয়ত ভূমে লুটাইয়া গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন সুরু কর্‌লেন্ আবার পরক্ষণেই অট্ট হাস্যে সানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁর দৌরাত্মে সে ঁড়া সব্ গরম।" আর সব্‌সে মজা করেন আহারের সময়—

* * * *

"নিরন্তর বাল্যভাব আন নাহি স্ফুরে॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥"

ব্যাপার যখন এইরূপ তখন কিন্তু আর একটি কাণ্ডের সূচনা—

ক্রমশঃ—

নিবেদন।

—:•:—

ভক্তি পত্রিকার সহৃদয় পাঠকবর্গ আজ ১৬ বৎসর যাবৎ ভক্তি পাঠ করিয়া দেখিতেছেন যে, ইহাতে কোনরূপ ভক্তি-বিরোধী ভাব প্রকাশ হয় না। এতদিন পর্য্যন্ত আমরা কোনরূপ সমালোচনাও প্রকাশ করি নাই, কারণ, সত্য কথা বলিলেও হয়ত অনেকের মনে কষ্ট হইতে পারে, আমরা তাহা করিতে ইচ্ছুক নয়। শাস্ত্র ও বলিয়াছেন ;—"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যম-প্রিয়ম্।" তাই সমালোচনার্থ পুস্তক পত্রিকাদি আমরা সাদরে পাঠ করিয়া জন-সমাজে যাহাতে তাহা প্রকাশ হয় তাহার জন্য যত্ন লইয়া থাকি নিতান্ত যাহা সমালোচনা না করিলে নয় তাহা কোনও রূপ নিন্দাবাদ না করিয়া, অযথা কাহারও উপর কটাক্ষ না করিয়া আমরা ভাল ভাবেই সমালোচনা প্রকাশ করি। যাঁহারা ইহাতে আপত্তি করেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিয়া নিজ মত স্থাপন করিতে ইচ্ছুক নয়। তাঁহারা উপরোক্ত ঐ প্রমাণটী দেখিয়া এইটীই স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা কোন প্রকারে কাহাকেও মনোবেদনা দিতে ইচ্ছুক নয়। কায়মনে কাহারও যাহাতে মনোবেদনা না হয় তজ্জন্য আমরা সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া থাকি।

তারপর এই ১৬ বৎসর যাবৎ পত্রিকা প্রকাশ করিয়া যেরূপ ভাবে গ্রাহক-গণের নিকট হইতে সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইতেছি তাহাতে অনেক সময় আরও সুখ পাঠ্য করিয়া গ্রাহকগণকে প্রচুর পরিমাণে সৎপ্রবন্ধাদি উপহার দিতে বাসনা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিভ্রাটে যেরূপ কাগজ ও মুদ্রণ সরঞ্জামাদির দুর্ম্মূল্যতা পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে কলেবর বৃদ্ধি করা তো দূরের কথা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল তাহাও হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছি, অবশ্য ইহাতে কাহারও হতাশ হইবার কারণ নাই, কেননা কাগজের বাজার নরম হইলেই আমরা পূর্ব্বের ন্যায় এমন কি পূর্ব্বাপেক্ষা কলেবর বৃদ্ধি করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। এক্ষণে অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীগৌর ভগবানই বলিতে পারেন কতদূর কি হইবে।

অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিয়া এবং সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন ও বলিতেছেন যে "ছোট ছোট ভক্তি-ভাবোদ্দীপক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া অল্প মূল্যে গ্রাহকগণকে উপহার দিউন।" অবশ্য এরূপ ভাবে দেওয়া উচিত এবং আমরা যে তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছি না তাহা নহে, তবে এরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে কিছু অর্থের প্রয়োজন, ভক্তি পত্রিকার পরিচালকগণ সেরূপ সঙ্গতিপন্ন নহেন, তাই এই বিরাট ব্যাপার সম্পাদনার্থ আমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ইতি মধ্যেই কোনও কোনও মহাত্মা "ভক্তি-গ্রন্থাগারের" উন্নতি বিধান কল্পে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে আরও সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম আমরা প্রকাশ করিব। এবং এই ভক্তি ভাণ্ডারের উন্নতি কল্পে যিনি দয়া করিয়া যাহা কিছু প্রদান করিবেন (তাহা যত অল্পই হউক না কেন) আমরা যথা সময় এই ভক্তি পত্রিকাতেই তাঁহার প্রাপ্ত স্বীকার করিব। সহৃদয় ভক্তগণ! আসুন আপনারা যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য দ্বারা ভক্তি-শাস্ত্র প্রকাশ ও সর্ব্বসাধারণের উপকারে যত্নবান হউন, এটাঠিক জানিবেন যে, এ অর্থ সাহায্য কোনও ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া নয় এ সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে দান। ইহাতে একদিকে যেমন প্রচার কার্য্যে সহায়তা করা অন্যদিকে তেমনই ভগবৎ কৃপা লাভের একটী সুন্দর উপায়। আপনারা সকলে যদি কিছু কিছু করিয়াও দান করেন তাহা হইলেই যে যথেষ্ঠ হইবে তাহা বলা বাহুল্য। নীতি শাস্ত্রে বলিয়াছেন 'তৃণস্তুমৈর্গুণাপন্নৈ বদ্ধন্তে মত্তহস্তিন" অর্থাৎ সামান্য তৃণ কোন কাজেই লাগে না, কিন্তু কতকগুলি তৃণ একত্র করিয়া মত্ত হস্তিকেও বন্ধন করিয়া রাখা যায়। তাই বলি যদি অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে চান, তবে জীবের যাহাতে মঙ্গল হয়, জীব যাহাতে সৎশিক্ষা পাইয়া আপন কলুষিত চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারে তদুপযোগী সংগ্রন্থ প্রচারে সাহায্য করুন।

আমরা ২।৩ খানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ-রত্ন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি কেবল অর্থের অভাবে এতদিন জনসমাজে প্রকাশ করিতে পারি নাই, এক্ষণে আপনাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়া সকল কথাই বলিলাম, আমরা আর কিছু কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইলেই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিব। যে কয়খানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এক্ষণে উপস্থিত প্রস্তুত আছে উহা ছাপাইতে অন্যূন ৫০০৲ পাঁচশত

টাকার কম লাগিবেনা। আপনারা যদি সকলে একটু কৃপা-দৃষ্টি করেন তাহা হইলে ২।১ মাসের মধ্যেই আমরা গ্রন্থ ছাপাইতে আরম্ভ করিতে পারি। আশাকরি আমাদিগের একাতর ক্রন্দন অরণ্যে রোদন হইবে না।

যিনি যাহা কিছু পাঠাইবেন দয়া করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় ভক্তি গ্রন্থাগারে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইবেন এবং নিজ নিজ নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। কারণ আমরা যথাকালে প্রাপ্তি-স্বীকার এই ভক্তি পত্রিকাতেই করিব। অলমিতি বিস্তরেণ।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আমাদিগের প্রার্থনা জ্ঞাপনের পূর্ব্বেই ভক্তি-গ্রন্থাগারের উন্নতি কল্পে নিম্নলিখিত সাহায্য পাঠাইয়া বাধিত করিয়াছেন।—

১।	মিত্রাশ্রম হইতে মাং শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ মিত্র ...	গণ্টক ...	৫৲
২।	জনৈক ভক্ত	কলিকাতা ...	১৫৲
৩।	শ্রীমতী লক্ষ্মীমণী দাসী ...	হাওড়া ...	২৲
৪।	মাং শ্রীযুক্ত ভক্তি সম্পাদক ...	... ...	১৩৲
		মোট	৩৫৲

ভক্তি-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত ২ খানি ভক্তি-গ্রন্থ (১। শ্রীশ্রী শিক্ষাষ্টকম্। ২। উপাসনা সঙ্গীত।) ৩০০ শত কপি করিয়া গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। উহা তাঁহার আদেশানুসারে ভক্তগণকে; নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া হইবে।

১। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্—।০ চারি আনা। ভিঃ পিতে ।৶০ ছয় আনা।
২। উপাসনা সঙ্গীত—।০ চারি আনা। ভিঃ পিতে ।৶০ ছয় আনা।

বলা বাহুল্য যে এই পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থও ভক্তি-গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে ব্যয় হইবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা;—

ম্যানেজার "ভক্তি-গ্রন্থাগার।" গ্রাম—মাসিলা।
পোঃ আঃ—আন্দুলমৌড়ী, জেলা—হাওড়া।

আনন্দ নগর।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত, উকিল।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

পাঠক! আজ ভবনগরে স্বার্থরাজের ভক্তগণের পূজার ব্যাপার দেখুন। এরূপ বিরাট ব্যপার কখনও নয়ন গোচর হয় নাই। প্রভুর অধীনস্থ একরাজা অপর রাজার রাজ্য প্রভুর সেবার জন্য কাড়িয়া লইতে প্রস্তুত। উভয় রাজা আপন আপন সৈনিক দল বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়াছেন। উভয় দল দণ্ডায়মান। শ্রুতি-রোধকরী তোপধ্বনি আরম্ভ হইল। সৈনিক দল বন্দুকও শাণিত তরবালাদি জীব-নিসূদন অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবমান। কেহ কাহার হস্ত, কাহার পদ, কাহার মুণ্ড কাটিতেছে। বন্দুকের গুলি কাহারও বক্ষঃস্থল, কাহারও মস্তক কাহারও পদভেদ করিতেছে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসম গোলক সকল কামান-মুখ বিনির্গত হইয়া অপর পক্ষের বহুতর সৈনিক পুরুষকে একবারে যমসদনে প্রেরণ করিতেছে। জল প্লাবনের ন্যায় রক্তে মেদিনী ভাসমানা। এই ভীষণ কাণ্ডের মধ্যে সৈনিক পুরুষগণ রণরঙ্গে রঙ্গী হইয়া ছুটিতেছে, মারিতেছে, কাটিতেছে। কত মনুষ্য, সৈনিকের ও অশ্বের পদতলে পড়িয়া বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। সৈনিকগণ অর্থরূপ কুসুম দ্বারা স্বার্থরাজের পূজা করিতে শিখিয়াছে, তাই অর্থের আশায় আজ নিজ জীবন তুচ্ছবোধ করিতেছে। ভবনগর নিবাসী কোন ব্যক্তি অপরের অর্থ আত্মসাৎ করিতে উদ্যত, কোন ব্যক্তি পিতা মাতা জীবিত থাকিলে তাহাদের অর্থের অধিকারী হওয়া দুরূহ জানিয়া পিতা মাতাকে অপসারিত করিতে প্রয়াসী, কোন ব্যক্তি ব্যভিচার পথের আশ্রয় লইয়া ঘোর অন্তরায় জ্ঞানে আপন সহধর্ম্মিনীকে নিপাত করিতে প্রস্তুত। বধ্য ব্যক্তিগণ জানেন না যে অপরে বা তাহাদের প্রিয়পুত্র বা প্রিয়তম স্বামী তাহাদের গলদেশে শাণিত তরবারি চালাইয়া বা বিষ প্রয়োগ বা অন্যবিধ উপায়ে তাহাদিগের প্রাণবধের

চেষ্টা করিতেছেন। স্বার্থরাজের প্রীতির জন্য আজ সেই সকল ব্যক্তি পিতৃ মাতৃ হত্যা, স্ত্রী হত্যা, নর হত্যা প্রভৃতি কার্য্য অবলম্বন করিতেছেন। সেই নিরপরাধীগণের আর্ত্তনাদ অনন্ত আকাশে লীয়মান হইতেছে, তাহাদের রক্ত পৃথিবী রঞ্জিত করিতেছে। ভক্তগণ এই সকল পূজায় কোন রূপ ক্লেশ অনুভব করিতেছেন না। প্রত্যুত প্রভুর সুখে সুখী হইতেছেন। হত্যার ন্যায় ব্যভিচার সমাজ মধ্যে আপন ক্ষমতা প্রসারিত করিয়াছে। পর-ললনা-সম্ভোগ-বাসনা সমাজ মধ্যে অনেককেই উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। এখানে স্বার্থরাজ নিজসুখ রূপ দেহ লইয়া বিরাজমান। এই স্বসুখের চেষ্টায় মনুষ্য আপন দেহ বিসর্জ্জন করিতেছেন কোথায় বা কারাগারকে আপন বাসস্থান রূপে পরিণত করিতেছেন। এই সম্ভোগ কামনা মনুষ্যকে কত প্রকার কৌশল যে উদ্ভাবিত করাইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। যিনি নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সম্ভোগ সুখ উপভোগ করিলেন তিনি স্বসুখ সম্ভোগ রূপ স্বাথরাজের উপাসনায় বহু বহু নিরপরাধ পরিবার মধ্যে অশান্তি রোপণ রূপ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। এই ব্যভিচার পরবশ হইয়া স্বার্থরাজের প্রীতির কামনায় স্ত্রী হত্যা নরহত্যা রূপ বিবিধ দ্রব্য দিয়া মনুষ্য অহরহঃ পূজা করিতেছেন। ব্যভিচারী ব্যক্তি এই স্বার্থরাজের অনাজ্ঞাবহ দাস। চৌর ও দস্যু পরম পূজনীয় স্বাথরাজের তুষ্টি কত প্রকারে সম্পাদান করিতেছেন। নিশ্চিন্ত শয়নে গৃহস্থগণের শরীরে অস্ত্র চালনা করিয়া, প্রজ্জ্বলিত মশাল অঙ্গোপার চাপিয়া ধরিয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ যন্ত্রণা মধ্যে তাহাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদের বহু ক্লেশোপার্জ্জিত সঞ্চিত ধনরাশি লুণ্ঠন পূর্ব্বক উপাস্য দেব স্বার্থরাজের একান্ত মনে আরাধনা করিতেছেন। স্বাথরাজ তাহাদের এই কার্য্যে প্রভূত সন্তোষ লাভ করিতেছেন স্বার্থরাজের সন্তোষ হইলে তাঁহার সেবকগণের মহানন্দ। চৌরগণ কখন কখন অপরের শরীরে অস্ত্রাদি চালনা না করিয়া অতি নিভৃতে বিবিধ কৌশল,জাল বিস্তার করিয়া অপরের বহু চেষ্টা ও যত্নে উপার্জ্জিত সঞ্চিত অর্থ লইয়া পলায়ন করিতেছে এবং তাহাকে চির দারিদ্র্য-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছে। এইরূপ পূজা স্বার্থরাজের উপযুক্ত জ্ঞানে তাহারা নিরন্তর করিতেছে। বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি স্বার্থরাজের প্রিয় সেবকগণ বিবিধ কৌশল রূপ কুসুম রাজিতে প্রভুর সেবা করিতেছে। প্রভু ইহাদের কৌশল

দর্শনে পরম সুখ লাভ করিতেছেন। এই সংসার বিশ্বাসের উপর অবস্থিত। বিশ্বাসের উপর মনুষ্যের ধন সম্পত্তি এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষার ভার প্রতিষ্ঠিত। যিনি বিশ্বাস করেন তিনি অপরকে আপনার পরম আত্মীয় বোধে কতই ভালবাসিয়াছেন। অপরের সুখ স্বচ্ছন্দ আপন সুখ স্বচ্ছন্দ জ্ঞান করিয়াছেন। আজ অপরে সেই বিশ্বাসের শিরে পদাঘাত করিয়া বিশ্বাসঘাতক আরাধ্য দেব স্বার্থরাজের সেবা ও পূজা করিতেছে। হিংসা দ্বেষ পরশ্রী কাতরতা এখানে সদা বিরাজিত। অপরের সৌভাগ্য দর্শন স্বার্থরাজের ভক্তগণের অসহ্য। অপরকে তাঁহাদের পদতলবাসী করা ইহাঁদের অভিপ্রেত। অপরকে তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেখিতে ইহাঁদের সুখ স্বচ্ছন্দ। সেই সুখ স্বচ্ছন্দ ইহাঁদের স্বার্থ। ইহাঁরা সেই স্বার্থের সন্তোষ কামনায় নানাবিধ পর-দ্রোহকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বার্থরাজের সেবা করিতেছেন।

এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা বড়ই বিষয়াসক্ত। ইহারা বিষয় বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণে সততই ব্যতিব্যস্ত। বিষয় ভোগ ইহাদের স্বার্থ। প্রায় মিথ্যা প্রমাণ ও কৃত্রিম দলিলাদি ইহাদের পূজোপকরণ। এই সকল বিবিধ পূজার দ্রব্য লইয়া ইহাঁরা আপনাদের পরমারাধ্য স্বার্থরাজের পূজা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাধিকরণ ইহাঁদের আশ্রয় স্থল। ইহাঁদের বিষয়াসক্তিই প্রায় অধিকাংশ বিবাদের মূল। বিচারালয়ে ইহাঁদের বিষয় বিচারিত হয়। তথায় ইহাঁরা প্রতীকারের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন।

সুবিচার করিতে হইলে বিচারপতির ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান ও শীতল মস্তিষ্ক হওয়া আবশ্যক। এই তিনটী গুণের কোনটীর অভাব হইলে সুবিচারের সম্ভাবনা নাই। ভবনগরে এরূপ বিচারপতির সংখ্যা অতি অল্প। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় অধিকাংশ বিচারপতির মধ্যে কেহ অভিমান পরবশ, কেহ তাঁহার অভিপ্রায় বা ধারণার কোনরূপ প্রতিবাদ সহ্য করিতে একান্ত অসমর্থ, কেহ বা স্থূল বুদ্ধি, কেহ অধার্ম্মিক, বিবাদ জটীল হইবার আশঙ্কায় কেহ বা প্রমাণ ও দলিল গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক কেহবা উর্দ্ধতন বিচার পতিদিগের মনস্তুষ্টির জন্য নিজ হিতাহিত জ্ঞানকে বলি দিয়া থাকেন। বিচারপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ অপরের ন্যায়যুক্তির প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন না, নিজের খেয়াল অনুসারে বিচার কার্য্য সম্পাদন করেন। বিচারপতিগণের এইরূপ অবস্থা হওয়াতে

বিচার কার্য্যে প্রায়ই বিশৃঙ্খলতা ঘটিতেছে। যে বিচারপতির যেরূপ মনোভাব সেই মনোভাব অনুযায়ী কার্য্য তাঁহার সুখ ও স্বচ্ছন্দের বিষয়; সুতরাং নিজ সুখের জন্য ব্যস্ত অপরের সুখ বা দুঃখের প্রতি ইহাঁদের একেবারেই দৃষ্টি নাই অর্থ প্রত্যাশীগণ প্রতিকার পাইবার কামনায় বিচারালয়ে উপস্থিত।

সত্য এক। কিন্তু উভয় পক্ষ যখন পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি প্রয়োগ করিতেছেন তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে সত্য নিরাকরণ করিবার জন্য বিচারপতি উভয় পক্ষের নিকট বাচনীক ও লিখিত প্রমাণ গ্রহণ করিলেন। উভয় পক্ষ অল্প বিস্তররূপে মিথ্যা প্রমাণ দিয়াছেন। কোন কোন সময়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা মোকর্দ্দমাও সত্যের আভাসে রঞ্জিত হইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত। সাক্ষীগণ অর্থ-বশীভূত এবং শিক্ষিত। বিচারপতির সত্য নিরাকরণের সম্পূর্ণ চেষ্টা থাকিলেও সত্য নিরাকরণ হয় না। বিচারালয়ে যিনি ভাল উকিল মোক্তার দিতে পারিবেন এবং ভালরূপ সাক্ষীর প্রমাণ দিতে পারিবেন তিনিই প্রধানতঃ জয়ী হইবেন এই আশায় বিষয়াসক্তগণকে মিথ্যা সৃষ্টিতে উত্তেজিত করিতেছে। উর্দ্ধ বিচারালয়ে আইন ঘটিত তর্ক উপস্থিত হয় সেখানকার ভাব একরূপ এবং নিম্নতন বিচারালয় সমূহের অবস্থা অন্যরূপ। ভবনগরে যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে তাহাতে শীতল মস্তিষ্ক ধার্ম্মিক বুদ্ধিমান্ বিচারপতিরও সত্য-নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য। অর্থপ্রত্যাশীগণ নিজ নিজ স্বার্থের চেষ্টায়ই যে এই কার্য্য করিতেছেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই সকল অর্থপ্রত্যাশীগণের কার্য্যে ভবনগর মধ্যে বহু বহু পরিবার একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে। স্বার্থরাজের উপাসনায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ সংসার মধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ ও দারিদ্রতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিচারপতির সম্মুখে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ অতি শান্ত ও ধীর; কিন্তু বাহিরে তাহাদের বিক্রম দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

এই ভবনগরে কেহ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া কেহ বা কৃষিকার্য্যের দ্বারা কেহ বা অন্যের দাসত্ব আশ্রয় করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইহাঁরা সকলে আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে স্বার্থরাজের সেবা করিয়া থাকেন। রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই স্বার্থরাজের দাস। স্বার্থরাজের গাত্র কেহ স্পর্শ করিলে তাহার আর নিস্তার নাই। ক্রোধ উপস্থিত হইয়া বৈর নির্য্যাতনে তাহাকে যথেষ্ট ক্লেশ দেওয়ার চেষ্টা হইতে থাকে। এই

স্বার্থরাজের সেবায় তৎপর হইলে স্বার্থরাজ ও তাঁহার পরম বন্ধু অধর্ম্মের এবং তাঁহাদের বংশধরগণেরও সেবা করা হয়।

স্বার্থরাজ ও অধর্ম্মের সন্তান সন্ততিগণের দৌরাত্ম্য ক্রমশঃ প্রচণ্ডতর আকার ধারণ করিল। অত্যাচার, ব্যভিচার চৌর্য্য, দস্যুতা ও প্রবল পরাক্রমে অধিবাসীদিগকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিল। কাহারও নিস্তার নাই! কোথায় স্ত্রীহত্যা, কোথায় পিতৃহত্যা, কোথায় পুত্রহত্যা, কোথায় বা ভ্রাতৃহত্যা হইতেছে। ধর্ম্মপ্রাণতা, সরলতা, স্নেহ, দয়া ভবনগরে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। শান্তি বা আনন্দ ভবনগরের ত্রিসীমানায়ও যাইতে ভয় পায়। সকলেই যারপর নাই দুঃখিত, সকলেই ম্রিয়মাণ। উদ্ধারের উপায় কি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করে। অপরকে জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পায় না স্বার্থরাজের আদেশ অমান্য করিবার কাহারও সাধ্য নাই, আবার শান্তি লাভ না করিতে পারিলে হৃদয় স্থির হইবে না এই দ্বিবিধ ব্যাপারে ভবনগরবাসী জনগণের চিত্ত দোদুল্যমান হইতে লাগিল। তাহাদের কার্য্যে সুখ নাই, আহারে বা নিদ্রায় সুখ নাই, রাত্রি দিন কেবল দুর্ভাবনা। যিনি যাহার উপর যেরূপ অত্যাচার অবিচার প্রভৃতি স্বার্থ মূলক কার্য্য করিয়াছিলেন তিনি এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া ক্ষোভে ও ক্লেশে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিলেন। কাহারও কাহার বা অত্যাচার এরূপ গুরুতর ছিল যে, সেই অত্যাচার কাণ্ড স্মরণ পথে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে একবারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। অনুতাপ আসিয়া মনোমধ্যে দেখা দিল, প্রতিজ্ঞা করিল আর স্বার্থরাজের সেবায় ব্যতিব্যস্ত হইব না। আমি না সেই নিরপরাধি নারী হত্যা করিয়াছিলাম? আর আমার জন্যই না তাহার শিশু সন্তানগুলি আহার না পাইয়া মা মা বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় কাঁদিয়া বেড়াইয়াছে? এবং শেষে আহার না পাইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমার দোষেই মা প্রাণত্যাগ করিয়াছে? আমি না সেই নিরপরাধিনীর সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছি? তখন না আমার মহোল্লাস হইয়াছিল? এইরূপ নানা প্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুতকর্ম্মের স্মরণ করিয়া তাহাদের বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিল।

ভগবান্ যে আছেন, তিনি সর্ব্ব-সন্তাপহারী ইহা তাঁহারা জানেন না। মঙ্গলময় ভগবানের শরণাপন্ন হইলে জীবের যে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে এ শিক্ষা এবং

হৃদয়ে ভগবানের আরাধনা করিলে পাপরূপ অনর্থের মূল স্বার্থরাজের যে বিনাশ হয় এ শিক্ষা তাহাদিগকে কে দিবে? নিরুপায় ভাবিয়া তাহারা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহাদের আর্ত্তনাদে ভবনগর তুমুল শব্দে নিনাদিত হইয়া উঠিল। তাহাদের হৃদয়েঅনুতাপ আসিয়া বদ্ধমূল কুসংস্কার সকল দূর করিয়া হৃদয়ে যেরূপ শান্তি দিতে ছিল তদপেক্ষাও তাহাদের যাতনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিষ্ঠুরতম কার্য্য স্মরণ করিয়া হইতে ছিল, তাই জীবন বিসর্জ্জনের দ্বারা সর্ব্বসন্তাপ নাশ করা তাহাদের মঙ্গল বিধায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

ভবনগর-নিবাসীজনগণ স্বার্থরাজের উপাসনায় যাবতীয় ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। এ ক্লেশ ভোগ করিবার মূল কারণ শিক্ষার অভাব। নিজ সুখের চেষ্টায় যত্নশীল না হইয়া অপরের কিসে সুখ স্বচ্ছন্দ হইবে এই চেষ্টা করিতে ও তাহাতেই হৃদয়ের আনন্দ লাভ করিতে যদি জীব শিক্ষিত হয় তাহা হইলে সকল গোলযোগ পরিষ্কৃত হয়, ভবনগরে কোন রূপ অত্যাচার, অবিচার দ্বেষ হিংসাদি থাকিতে পারে না, ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা মিথ্যাকথন সর্ব্বরূপে নিরাকৃত হয়, দেশ আনন্দ ও শান্তির আবাস ভূমিতে পরিণত হয়। সর্ব্ব জীবে ভগবান্ বিদ্যমান জীবের সেবায় প্রাণ মন সমর্পণ করিলে অপর জীবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান হইবে ইহা যদি প্রত্যেক জীবের অন্তরের কামনা হয়। আমার নাই তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি দুঃখ ক্লেশ ভোগ করি তাহা আমার ভাল আমি ক্লেশ স্বীকার করিলে যদি অপরের মঙ্গল হয় তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি সকল জীব এইরূপে অপরের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য যত্নশীল হন, তাহা হইলে সংসারে সকলেই অভাবহীন, সকলেই সুখী, সকলেই আনন্দের হিল্লোলে উল্লাসিত হইবেন ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ—

প্রেমাবতার।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর।)

—:•:—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং

কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌॥ (মুণ্ডক ৩।১।৩।)

সাধক জীব (শ্রীভগবানের কৃপায়) যখন সেই রুক্মবর্ণ পুরুষকে অর্থাৎ জগতে প্রকটলীলার জন্য শ্রীশচী-নন্দন রূপে অবতীর্ণ সেই পর ব্রহ্মেরও কারণ স্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরকে অবলোকন করেন। এই শ্রুতি সেই অপ্রাকৃত দ্যুতির আধার চিদানন্দ মূর্ত্তি শ্রীশচী-নন্দনকেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন।

জীব ব্রহ্মাণ্ড বৃক্ষের ফল। উহা ক্রমে অর্দ্ধপক্ক হইলে "জ্ঞানী" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ক্রমশঃ উহাতে সুরস উৎপন্ন হয়। এই রস—ভক্তি। তখন এই জীব "ভক্ত" অভিখ্যা লাভ করে। ফল পাকিয়া অবশেষে সুপক্ব হয়, উহা তখন সর্ব্বাঙ্গীন রসাল হয়। অর্থাৎ ভক্তি উত্তোরত্তর উত্তমোত্তম হইয়া উৎকর্ষের তর, তম ভেদে বিভিন্ন আখ্যা ধারণ করে। যথা—সাধন ভক্তি, ভাব, প্রেম, মহাভাব।

আদৌ শ্রদ্ধাততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া।

ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।

সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

দুগ্ধসার মাখন, মাখনের সার ঘৃত। মহাভাব ভক্তি-দুগ্ধের নির্যাস ঘৃতস্বরূপ।

"ভক্তি" উপাধি বিধিতে সঙ্কেত করে। কারণ ভক্তি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করে। কিন্তু যখন ঈশ্বরে ভালবাসার সঞ্চার হয়, তখন ভক্তি প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়া ক্রমে সখী ভাবাদিকে প্রাপ্ত করাইয়া থাকে।

আমাকে ঈশ্বরমানে আপনাকে হীন।

তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৪।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে ভক্ত আমাকে ঈশ্বর বা বড় মনে করে এবং নিজকে আমার চেয়ে হীন মনে করে, আমি তাহার প্রেমে বশ হই, কিন্তু তাহার অধীন হইনা। এই উর্দ্ধগা ভক্তি প্রেম বলিয়া কথিত হয় না। কারণ পূজক, পূজ্য হইতে মর্য্যাদাজ্ঞানে দূরে থাকে। ঈশ্বরজ্ঞাননিবন্ধন ঈদৃশী ভক্তির নাম ঐশ্বর্য্য ভক্তি। মধুর বা রাগ ভক্তির আরম্ভ যথাঃ—

"আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সর্ব্ব ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৪)
"মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।" (শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৪)

"রসো বৈ সঃ" ইতি শ্রুতিঃ। রস ও আনন্দ দুটি বিগ্রহ। রসসারভূত শ্রীকৃষ্ণ—উপাস্য এবং আনন্দময়ী শ্রীরাধা—তাঁহার শ্রেষ্ঠা উপাসিকা, এই সম্বন্ধ নিত্য, এবং ইহাই শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ লীলা। এই অন্তরঙ্গ সম্বন্ধাশ্রয়ে জীবেরও তৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। রসনা ব্যতীত রসের আস্বাদন অসম্ভব, সুতরাং কৃষ্ণ পাইবার উপায় একমাত্র শ্রীরাধার করুণা। পক্ষান্তরে রসসংযোগ বিনা রসনাশক্তির স্ফুরণ হয় না। অতএব যুগল-লীলা-বিলাস প্রেম-ভক্তিবদান্যতার নিঝ'রগুহা।

"ভাব বিনা লাভ নাই।"—ভাবরাজ্যের পাটেশ্বরী শ্রীরাধা। ভাবের লোভে কাঙ্গাল বা অনুগত হইয়া রাধারাণীর কৃপাপ্রার্থনামূলে কৃষ্ণ ভজন করিতে হয়। ব্রজের নিম্মল রস এই সিদ্ধপদ্ধতিঅনুক্রমে উপজাত হয়।

"রাগমার্গে ভজে যৈছে ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম।

রাগমার্গের ভজনরীতি এস্থলে কীর্ত্তিত হইয়াছে। রাগমার্গে হাটিতে হইলে ধম্মকম্ম—ধম্মও কর্ম্ম বা ধম্মাধম্ম পদদলিত করিতে হয়।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়াস্বাদনের নাম প্রেম। প্রণয়ের মান গর্ব্বাদিই লীলার রস। উহা প্রেমাস্বাদনের চরমসুখ। এই রসসীমা কে নির্দ্ধারণ করিবে?

ভক্তি মৃণালের বারি শ্রবণ কীর্ত্তন। মৃণালের মস্তক-মণি-কমল—প্রেম। এই দিব্য কমলের কর্ণিকাস্থ মধুরলীলা-রসামৃত শ্রীযুগল লাবণ্যামৃত। প্রেম-স্বরূপিণী শ্রীরাধা রসবিগ্রহ নিঙ্গারিয়া রস ছড়াইতেছেন। যথা "হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।"

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

গুরু কৃষ্ণরূপ গুরু হইয়াছেন কৃষ্ণের স্বরূপ। কৃষ্ণ গুরুরূপে অর্থাৎ গুরু-মূর্ত্তিতে ভক্তে কৃপা করেন।

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।" শ্রীচৈঃ চঃ।

গুরু চৈতন্যের দাস বা ভক্ত। সুতরাং তিনি ঈশ্বর নহেন। আবার তিনি ঈশ্বর না হইয়াও ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকাশ।

"তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।" শ্রীচৈঃ চঃ।

গুরু—ভক্ত, "ভক্ত তার অধিষ্ঠান।" জোয়ারে যেমন সমুদ্রের জল নদীতে প্রবেশ করিয়া নদীর পুষ্টি জন্মায়, তদ্রূপ ভক্তে ভগবান্ দ্যোতিত হন।

১। "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।"

২। "শিক্ষা গুরুকেও জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।"

১ম পয়ারাংশে কৃষ্ণরূপ, ২য় পয়ারাংশে কৃষ্ণের স্বরূপ। প্রথম পয়ারাংশ দীক্ষাগুরুর চিত্র এবং দ্বিতীয় পয়ারাংশ শিক্ষাগুরুর। দীক্ষাগুরু কৃষ্ণের রূপ, শিক্ষাগুরু কৃষ্ণের স্বরূপ বা স্বয়ং কৃষ্ণ। এখানে শিক্ষাগুরুকে স্বয়ং বলিবার কারণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগতের শিক্ষাগুরুরূপে জীবকে ব্রজরসের আস্বাদ করাইয়া ছিলেন।

"কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্তাবতার প্রকাশ।

শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥"

(১) গুরুদ্বয় (দীক্ষা ও শিক্ষা,) (২) ভক্ত, (৩), অবতার, (৪) প্রকাশ, (৫) শক্তি—এই ছয়রূপে কৃষ্ণ বিলাস করেন।

(১) গুরুদ্বয়।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তরূপ।—নাম প্রচার করিয়া দীক্ষা গুরু, এবং রাগ বা রসের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া শিক্ষাগুরু।

(২) ভক্ত—শ্রীবাস।

(৩) অবতার—শ্রীঅদ্বৈত।

(৪) প্রকাশ—শ্রীনিত্যানন্দ।

(৫) শক্তি—শ্রীগদাধর।

পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চমূর্ত্তি নাচে নদীয়ায়।
গোরা আপনি নেচে জগৎ নাচায়,
প্রেমাবতার এই না গৌররায়?

শ্যামসিন্ধুর রস সলিলে তিনটী ঢেউ, তিনটি বাঞ্ছা। "উহা রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতিঃ" ঘটিত।

স্বয়ং শ্যাম-ইন্দু প্রেমসিন্ধু দিয়া অঙ্গ প্রলেপ করিয়া বর্ণচোরা ভক্ত সাজিলেন। জগজ্জীব ভক্ত হইতে তাহার নির্ম্মলোজ্জ্বল আদর্শ এই প্রথম। ভগবান্ যেরূপ ভক্ত হইতে পারেন, জীব তদ্রূপ হইতে পারেনা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ভগবান্,—ভগবান্, এবার ভক্ত। সুতরাং জীব ও ভগবানের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গেল। তাই এমন করুণাবিস্তার আর কভু হয় নাই। রাধাকৃষ্ণ লীলার নিগূঢ় উদ্দেশ্যই পরে গৌর হইয়া জীবকে ধন্য করান। নিভৃত নিকুঞ্জে রস লাড়ুকা পাকান হইয়াছিল, কলির জীবকে খাওয়াইবার জন্য। দ্বাপরে ব্রজলীলায় পাক প্রস্তুত হইয়াছিল, পরিবেশন, বিতরণ ও অভিন্ন দেহে প্রেমের আস্বাদ করা এবং তদানুষঙ্গিক লীলা গৌরাবতারে পূর্ণ হইল। অতএব ব্রজলীলা ও নদীয়া লীলা এক অখণ্ড পূর্ণ লীলারই বিকাশ। ব্রজলীলায় কৃষ্ণ নিভৃত-নিকুঞ্জ-মঞ্চ হইতে অবতরণ করেন নাই? কিন্তু নদীয়া লীলায় তিনি নামিয়া জীবের ঘরে ঘরে ঘুরিয়াছেন। প্রেম বিলাইতে আর কে এতদূর নিম্নে অবতরণ করিয়াছেন? অতএব তিনি গৌররূপে যথার্থ প্রেমাবতার। "প্রেমাবতার" শ্রীগৌরাঙ্গের একচেটিয়া উপাধি। আর কেহ ইহার উপর দাবী করিলে, তিনি দণ্ডনীয় হইবেন না কেন?

ক্রমশঃ—

ভক্তিযোগের উৎকর্ষতা।

—:o:—

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে ভক্তিযোগই যে শ্রেষ্ঠ তাহা শ্রীভগবান নিজ মুখেই বলিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই, ভক্তিমার্গের সাধকবৃন্দ যে অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করেন তাহার কণা-মাত্রও কর্ম্মকাণ্ডমার্গা বা জ্ঞানমার্গীদিগের ভাগ্যে ঘটে না। শাস্ত্রকারগণ

কর্ম্মকাণ্ডের প্রকরণবিধি বদ্ধ করিলেন কেন? এ কথার উত্তর এক কথায় দিতে পারা যায়। মানব জীবন অবস্থা ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধ। বাল্য জীবনের উপযোগী শাসন কর্ম্মকাণ্ড। বালকেরা বাল্যে খেলা ভিন্ন জানে না, উশৃঙ্খলতাই বাল্য জীবনের মূল তত্ত্ব। কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা নরবালক-বৃন্দকে শাসন করাই শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা। কর্ম্মকাণ্ড বালকদিগের খেলা মাত্র। বালকেরা জানেনা খেলা করিলে কি হয়; তাহারা বুঝেনা খেলা করিলে সময় বৃথা অতিবাহিত হয়; তাহাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই খেলা ধূলায় অমূল্য সময় অতিবাহিত করিলে ভবিষ্যতে কষ্ট সহিতে হয়। সকলে খেলা করে, তাহারাও খেলা করে খেলা করিতে হয়, তাই তাহারা খেলা করে। কর্ম্মকাণ্ডও বালকদিগের খেলার মত। জীবের প্রথম জীবন খেলার সময়। বালকেরা খেলা ভিন্ন কিছু জানেনা, খেলাতে তাহাদের বড় সুখ। মানব জীবনের প্রথম অবস্থার ক্রিয়াকাণ্ড বড় ভাল লাগে তাহাতেই সুখ বোধ হয়, জীবনের চরম উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইয়া যেরূপ বালকেরা খেলা ধূলায় অমূল্য সময় নষ্ট করে, অবোধ মানুষও ভক্তিযোগের পরানন্দ ভুলিয়া প্রথম অবস্থায় কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানেই সকল সুখের পরাকাষ্ঠা মনে করে। তাহার পর মানুষ যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাহাদের মনে কর্ত্তব্য জ্ঞানের উদয় হয়, খেলা জিনিষটি যে ভাল নহে তাহা বুঝিতে পারিয়া তখন খেলা ছাড়িয়া কাজে মন দেয়, লেখা পড়ায় মন দেয়। জীবের পক্ষেও তাহাই শুষ্ক কর্ম্মকাণ্ডে যখন তাহাদের মনের অভাব পূর্ণ হয় না, ইহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু কিছু আছে, যাহা তাহাদের অবশ্য অর্জ্জনীয়, যাহার অভাবে তাহাদের মন কখন কখন উৎকণ্ঠিত হয়, তখন তাহারা তাই চায়। সেটী জ্ঞান পিপাসা আত্মজ্ঞান-তত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব। বালকেরা যেমন খেলা ধূলা ছাড়িয়া পাঠে মন দেয়, জীবও সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া জ্ঞানার্জ্জনে মনোনিবেশ করে। জ্ঞানবলে ভক্তিমার্গে উঠিবার এই প্রথম চেষ্টা। তাহার পর শ্রীভগবানের কৃপায় যখন তাহারা জ্ঞান বলে ভক্তিরসের স্নিগ্ধ মধুরতা ক্রমশঃ আস্বাদন করিবার সুযোগ পায় তখন তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। এইটী বৃদ্ধ বয়সের কাজ। এই সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের ব্যতিক্রম অধিক স্থলে লক্ষিত হয়। সে কথা বলিবার এখন সময় নয়।

ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রথম সময় বাল্যকাল। বালকের সরল নির্ম্মল হৃদয় ভক্তিদেবীর বাসস্থান। বালকের স্বাভাবিক ভাবই ভক্তি উদ্দীপক। বালকের পক্ষে শাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, শাস্ত্রজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। ভক্তির বীজ লইয়াই তাহার পৃথিবীতে জন্ম। সলিল সেচনাভাবে সেই স্বাভাবিক পরিপুষ্ট ভক্তিবীজ ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। বালকের হৃদয়-ক্ষেত্র কর্ম্ম কাণ্ডরূপ আবর্জ্জনা ও কণ্টকে পূর্ণ হইলে ভক্তি-বীজের অঙ্কুর হইতে পারে না, তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। বালকের মন চিরশুদ্ধ, বালকের হৃদয় শ্রীভগবানের অত্যুৎকৃষ্ট আবাস স্থল। এমন সুকোমল কুসুম-সিংহাসন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমরা এই স্বাভাবিক নিয়ম-গঠিত শ্রীভগবানের কুসুম কোমল স্বর্ণ সিংহাসনকে কণ্টকময় ও আবর্জ্জনাময় করিয়া তুলি। এত সাধের রত্ন সিংহাসন অব্যবসায়ীর হস্তে পড়িয়া ধূলি কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীভগবানের বৈঠকের অনুপযুক্ত হয়। ইহাতে বালকের কোনরূপ দোষ নাই। বালকের অভিভাবকগণ রত্নের মর্ম্ম বুঝেন না তাহারা ভক্তির বীজ উচ্ছেদ কারী; বালক তাঁহাদের খেলার সামগ্রী, তাহাকে লইয়া তাঁহারা কত খেলাই খেলেন; বালক-হৃদয় সতত সরল; কাঠিণ্যের লেশমাত্র নাই। মৃত্তিকা দ্বারা তুমি শ্রীভগবানের বিগ্রহ না গড়িয়া হনুমানের মূর্ত্তি গড়াইতেছ। ইহাতে মৃত্তিকার দোষ কি? গঠন কর্ত্তার দোষেই মৃত্তিকার বিকৃত ভাবের উৎপত্তি। বালক-হৃদয় কুসুম কোমল, তাহাকে যেরূপ ভাবে গঠন করিবে, যেরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করিবে, তাহা সেইরূপ হইবে ও সেরূপ কার্য্য করিবে, সকলই তোমার হাতে। তুমি তাহাকে যেভাবে চালাইবে, সে ঠিক সেই ভাবেই চলিবে। তুমি তাহার চালক, প্রতিপালক, রক্ষক, ভক্ষক সকলি। ভক্তি-লতার বীজ তোমার হাতে, বালক-হৃদয় কর্ষিত স্বাভাবিক সরস ক্ষেত্র, তুমি যদি বুদ্ধিমান কৃষক হও, সেই ক্ষেত্রে উত্তম বীজ বপন করিতে পার। প্রথম হইতে বালক-হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইলে তাহা কালে বিশেষ সুফল প্রদান করে। ইহার প্রমাণ প্রতি-নিয়ত ভক্ত-গৃহে লক্ষিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিপথের কণ্টকগুলি উচ্ছেদ করিয়া পথটী অতিশয় পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তাহার পরিকরবৃন্দ ভক্তিপথের পথিকদিগকে সেই

সরল অথচ সুগম পথে লইয়া যাইতে নিরন্তর সচেষ্ট। কিন্তু কালের প্রভাবে এখনও অজ্ঞানান্ধ ভক্তি-বহির্মুখ পণ্ডিতাভিমানী কুতার্কিক লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তাঁহারা প্রভু প্রবর্ত্তিত সরল ও সুগম ভক্তি পথটী ক্রমশঃ জটিল ও কুটিল করিয়া তুলিতেছেন। ইহাদিগের মধ্যে প্রভু ও আচার্য্য সন্তানদিগের প্রতি বিনীত নিবেদন, তাঁহারা কলিহত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সহজ পথটী দেখাইয়া দিবেন। ভক্তিমার্গের কণ্টকগুলি কলির জীবের সুবিধার জন্যই প্রভু আমার স্বহস্তে উঠাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আপনারা শক্তিমান; ভক্তিপথ পুনরায় কণ্ঠকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, প্রভুর কার্য্য আপনারা উদ্ধার করিতে সমর্থ। তিনি আপনাদিগকে সে শক্তিদান করিয়া গিয়াছেন। প্রভু-দত্ত শক্তির পরিচয় দিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নামের গৌরব রক্ষা করুন। ভক্তি পথ প্রদর্শক আপনারা, ভক্তিযোগের শিক্ষক আপনারা, ভক্তি পথ আপনাদেরই চিরদিন পরিস্কৃত রাখিতে হইবে। তাহা না করিলে প্রভুর উপদেশ বাক্য লঙ্ঘন করা হইবে। কলির জীবের নিত্য হাহাকারের জন্য, তাঁহাদিগের ত্রিতাপ জনিত তাপের জন্য, তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যই প্রভু আমার আপনা-দিগকে এত বড় উচ্চপদ দিয়া গিয়াছেন। প্রভুপাদ শব্দের অর্থ আপনারা অবশ্য জানেন। শ্রীপদ শব্দের অর্থ লক্ষ্মীপতি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে যিনি সম্যকরূপে দান করেন তিনিই শ্রীপাদ। শ্রীপাদ, প্রভুপাদ, প্রভু, উপাধি বড় সহজ বস্তু নহে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র সর্ব্ব-জগতের পূজ্য, সর্ব্বদেব দেবীর আরাধ্য প্রভু। এই জন্যই তাঁহার নাম মহাপ্রভু। দুই প্রভুর প্রভু বলিয়াও তাঁহাকে ভক্তগণ মহাপ্রভু নাম দিয়াছেন।

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥ চৈঃ চঃ।

ভক্তিমার্গ-পথ অতি পরিষ্কৃত। কলির ধর্ম্ম অতি সহজ। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কলির ধর্ম্ম ব্যাখা করিয়া গিয়াছেন:—

চৈতন্য চরিত শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
সর্ব্বকর্ম্ম ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি।
এই কলিকালে আর নাই অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণব শাস্ত্র কহে এই মর্ম্ম॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিপথের প্রদর্শক। তাহার শ্রীচরণ চিন্তা ভিন্ন ভক্তি যোগ সাধন হইবে না। তাই বলি কলিরজীব! শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাগত হও, তাঁহার কৃপা ভিন্ন ভক্তিলাভ সুদুর্লভ। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর দাসগণের সঙ্গ কর। তাঁহাদের অনুগ্রহ পাইলেই শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে মতি হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে মতি হইলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে।

চৈতন্য চরণে যার আছে রতি মতি।
জন্ম জন্ম হয় যেন তাঁহার সংহতি॥ চৈঃ ভাঃ।

এই মূলমন্ত্র মনে রাখিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হও দেখিবে অচিরাৎ সুফল ফলিবে। ভক্ত সঙ্গ ভক্তি মার্গের প্রধান অঙ্গ। ইহা যেন মনে থাকে। ঠাকুর নরহরি বলিয়াছেন :—

"অনুক্ষণ তোমার ভক্তের সঙ্গ চাই।"

জয় গৌর বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। তোমাদের সকল কার্য্যের ভার শ্রীগৌরাঙ্গ লইবেন। তোমার কার্য্য তুমি কর। তোমার কোন চিন্তাই থাকিবে না। একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ চিন্তাই তোমার কার্য্য। তাহাতেই সর্ব্ব সিদ্ধি! ভক্তি পথে আসিয়া চির শুষ্ক হৃদয় সুশীতল কর। ভক্তিরস ভিন্ন সে হৃদয় দ্রব হইবার নয়।

বৈষ্ণব দাসানুদাস,
শ্রী—

প্রার্থনা।

—:০:—

ভেবেছিনু হে গৌরাঙ্গ! সারি সব কাজ,
অবসর মত নাথ, ভজিব তোমায়;
কিন্তু কি কহিব দুঃখ হে হৃদয় রাজ!
দিনে দিনে শুধু মোর দিন ব'য়ে যায়।
এ পোড়া কাজের মোর হ'লনা ত শেষ,
ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নব কাজ বেড়ে যায়।

কত ভাবে কতবার ভ্রমি কত দেশ,
সময় যে যায়—কবে ডাকিব তোমায়!
তা'হলে হবে না সখা, ডাকা তোমা আর
এখনও হেলায় যদি কাটাই সময়,
কাজের নাহিক অন্ত, কিসে হ'ব পার—
এখনও না তোমা যদি ডাকি দয়াময়!
শত কাজে আনমনা যত থাকি আমি,
তোমারে না ভুলি যেন হে হৃদয়স্বামি।
শ্রীগোপেন্দু ভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

সন্তোষ রক্ষার সাতটী উপায়।

(লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র উকীল।)

—:০:—

যাঁহারা শ্রীভগবানে সমস্ত নির্ভর করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীআশুতোষের সম্পত্তি সন্তোষ সততই বর্ত্তমান। কিন্তু সে ভাগ্য সকলের হয় না। সে জন্য মনীষীগণ সন্তোষ রক্ষার কতক গুলি অমোঘ সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে গুলি স্মরণ রাখা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা তাহা হইলে কোন অবস্থাতেই আমাদের হৃদয়ে অসন্তোষ, বিরক্তি বা অসুখ জন্মিতে পারে না এবং আমরা চির সন্তুষ্ট থাকিয়া নিরঙ্কুশ চিত্তে ক্রমশঃ জীবনের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারি। ঐ সঙ্কেত প্রধানতঃ সাতটী। যথা—(১) ধর্ম্মাশ্রয় বা দীক্ষা ও সাধনা। (২) ইহ লোকের অস্থায়িত্ব জ্ঞান। (৩) দরিদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত। (৪) দৈন্য। (৫) মিতাচার। (৬) দত্ত বস্তুর উপযোগিতা। (৭) বাঞ্ছিত বস্তুর অনুপযোগিতা।

উপরোক্ত সাতটীর মধ্যে প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাশ্রয় বা দীক্ষা গ্রহণ ও সাধনা। প্রত্যেকেরই কোন না কোন একটী ধর্ম্মমতে আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। জগতে বহুবিধ ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে। সকলের পক্ষে সকল গুলি জানার অবসর না হইতে পারে, জানিবার আবশ্যকও নাই।

যাহার যে দেশে জন্ম, সেই দেশের জলবায়ু, গাছ গাছড়া, আহার ঔষধ, রীতিনীতি, যেমন তাহার উপযোগী হয় সেইরূপ সেই দেশের প্রচলিত ধর্ম্মমতও তাহার পক্ষে বিশেষ হিতকর হয়।

অবশ্য দু' এক স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ জন্মভূমি বা তন্নিকটবর্ত্তী ভূভাগের চিরসম্মানিত ও সমাদৃত ধর্ম্মমতই যে মানবের উন্নতি-বিধায়ক হয় তাহাতে আর ভ্রম নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন "ধর্ম্ম জিনিসটী মান মর্য্যদা, কোঠা ভিটা, ডাল ভাত, জামা কাপড় বা টাকা পয়সার মত প্রয়োজনীয় নয়; তজ্জন্য সময় ক্ষেপ করা সময়ের অপব্যবহার মাত্র। যদিও করিতে হয় স্থবির কালে করা যাইবে।"

বড়ই পরিতাপের বিষয় ধর্ম্ম ক্ষেত্র ভারতভূমেই এখন এ শ্রেণীর ধারণা প্রবল হইয়াছে। ইহজীবনসর্ব্বস্ব জাতিগণের সহিত সংস্রবই তাহার একমাত্র কারণ।

এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র এইমাত্র বলেন যে, ওসকল জিনিস পশু জীবন হইতে মানবকে কিছুমাত্রও উন্নীত করিতে পারেনা। কারণ—

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
ধর্ম্মোহি তেষাং অধিকো বিশেষঃ
ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

একটী ছেলেকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হইল। ছেলেটী আহারের সময় আহার, নিদ্রার সময় নিদ্রা, বেশ ভূষার সময় বেশ ভূষা খেলার সময় খেলা সবই করিতে লাগিল; কিন্তু পড়িতে বসে না। সেই ছেলে যেমন আসল হারাইতেছে, তেমনই আমারাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া রোজগারের সময় রোজগার, আহার বিহারের সময় আহার বিহার করিলেই জীবনের আসল কার্য্য বা মুখ্য প্রয়োজন সাধিত হইল না।

আসল কার্য্য আত্মতত্ত্ব আলোচনা ও নির্দ্ধারণ এবং আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি সাধন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে শ্রীভগবানের পাদপদ্মের মকরন্দ পানে মত্ত হওয়া ও তজ্জনিত শান্তিসুখ অনুভব করিতে করিতে বিশ্ব প্রেমিক হওয়া। যে প্রত্যহ

সে অন্য কিছু কিছু সময় ব্যয় না করিল সে সেই পূর্ব্বোক্ত ছাত্রের ন্যায় আসল কার্য্যে বঞ্চিত হইল।

যাহা হউক দেশ প্রচলিত বা তন্নিকটবর্ত্তী দুই চারিটী ধর্ম্মমতের বিশেষ বিশেষ উপদেশ, উপাস্য ও উপাসনা তত্ত্ব এবং সেই সেই মতের উপাসক দুই দশজন সাধুর জীবন-চরিত সকলেরই জানা কর্ত্তব্য; এবং তৎপরে নিজের প্রবৃত্তি ও রুচি অনুযায়ী একটী ধর্ম্ম প্রণালী বাছিয়া লইয়া সেই ধর্ম্ম সাধনার জন্য গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক সাধন পথে নিত্য নিয়মিতরূপে কিছু কিছু অগ্রসর হওয়া প্রত্যেক মানবেরই নিতান্ত প্রয়োজন। ইহারই নাম ধর্ম্মাশ্রয় বা দীক্ষা গ্রহণ ও সাধনা। ইহাদ্বারা মানবের চিত্তে নিরন্তর সন্তোষ বিরাজিত থাকিবে।

কেন না প্রত্যেক ধর্ম্মই শিক্ষা দেন যে, শ্রীভগবান করুণাময়। তিনি জীবের মঙ্গলের জন্যই বিবিধ শাস্ত্র দ্বারা নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীভগবান জগতের এবং জগৎবাসী প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্যই উৎসুক আছেন। তাঁহা দ্বারা কখনও কাহারও অমঙ্গল হয় না—হইতে পারে না। পিতা বা শিক্ষক যেমন পুত্র বা শিষ্যের হিতার্থ কখনও পুরস্কার কখনও তিরস্কার করেন, শ্রীভগবানও জীব সম্বন্ধে সতত তাহাই করিতেছেন। যাহা দিলে মঙ্গল হইবে তাহা দিতেছেন, যাহা না দিলে মঙ্গল হইবে তাহার অভাব রাখিতেছেন।

মনে করুন আপনি পীড়িত, আপনার বৈকালিক পিপাসা দেখা দিয়াছে, আপনি শীতল জল চাহিতেছেন। ডাক্তার কি তাহা দেন? না যিনি আপনাকে ভাল বাসেন, তিনি দেন? সে সময়ে আপনি যাহা আপনার পক্ষে ভাল মনে করিতেছেন প্রকৃত পক্ষে তাহা আপনার মঙ্গলাস্পদ নহে। এবং যে তিক্ত ঔষধাদি সেবন করা আপনি নিতান্ত অপ্রীতিকর মনে করিতেছেন তাহাতেই আপনার ভাবী শুভ নির্ভর করিতেছে।

জীব সম্বন্ধে শ্রীভগবানের যাবতীয় কার্য্য ঐ হিতৈষী মিত্রের কার্য্যের মত। এক জনকে ধন দিলে তাহার ও বিশ্বের মঙ্গল হইবে, সে ধন পাইল। আর এক জনকে ধন না দিলে তাহার ও বিশ্বের মঙ্গল হইবে তাহাকে ধনাভাবে রাখা হইল। ইহাতে বৈষম্য বা নিষ্ঠুরতা আদৌ নাই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন করুণার প্রকাশ দেখা যায়।

শ্রীভগবানের আদেশ বাণীও অভ্রান্ত। শাস্ত্রেও সে বাণী পাওয়া যায়। প্রত্যেক শাস্ত্রাদেশই যথাকালে কার্য্যে পরিণত হয়। সকল শাস্ত্রেই সকলকে সংপথে থাকিতে ও অসৎপথ পরিহার করিতে বলিতেছেন। একজন শাস্ত্রাদেশ মানিল না। নানা অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। সময় হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে মনস্তাপ পাইতে হইবে। আবার যে সংপথে থাকিবে পরিদৃশ্যমান শত অভাবের মধ্যেও তাহার সুখ শান্তি বর্ত্তমান থাকিবে। সে কখনই দুঃখ পাইবে না। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে এবং ইহ জগতেও দেখা যায়। হিন্দু ঋষি কামিনী বিষয়ে রামায়ণ ও কাঞ্চন বিষয়ে মহাভারত প্রণয়ন করিয়া আর্য্য জগৎকে সাবধান করিয়াছেন। অতএব স্পষ্টই দেখা গেল হৃদয়ে সতত সন্তোষ রক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই ধর্ম্মাশ্রয় বা দীক্ষা গ্রহণ সাধনা করা আবশ্যক।

সন্তোষ রক্ষার দ্বিতীয় উপায় ইহলোকের অস্থিরত্ব জ্ঞান। এই পৃথিবী আমাদের নিত্য বাসস্থান নহে। বৈকুণ্ঠই আমাদের প্রকৃত দেশ। জগৎসংসার আমাদের বিদেশ। এখানে আমরা তীর্থযাত্রীর পান্থনিবাস বাসের ন্যায় মাত্র দুই এক রাত্রি থাকিব।

বাস্তবিকই তীর্থযাত্রী পান্থশালায় কি করেন? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটু স্থান এবং পুষ্টিকর ও হিতকর কিঞ্চিৎ আহার্য্য পাইলেই কি তিনি সন্তুষ্ট হন না? পরক্ষণে মূল্য দিতে হয় এই আশঙ্কায় কোন বিষয়ে বাহুল্য করেন না। আরও ভাবুন দেখি, যখন আমরা জগতে আসি তখন কি লইয়া আসি? আবার যখন এখান হইতে চলিয়া যাইব কি লইয়া যাইতে পারিব? অতএব গ্রাসাচ্ছাদন লাভ মাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিয়া কতদিনে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব এই আশায় ও সাধনায় জীবন ধারণ করাই কর্ত্তব্য।

সন্তোষ রক্ষার তৃতীয় উপায়—দরিদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত। আমাদের অপেক্ষা অধিক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার তুলনা করা। যখন আমরা আমাদের অপেক্ষা হীনাবস্থ কোন লোকের দিকে লক্ষ্য করি, তখন আমরা আপনাদিগকে তাঁহা অপেক্ষা ধনী ও সুখী মনে করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হই ও তাঁহাকে অবজ্ঞা করি। আবার যখন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির কথা মনে করি তখন তিনি আমাদের অপেক্ষা না জানি কতই সুখী ও নিরাপদের

মনে করিয়া ঈর্ষ্যানলের তীব্র জ্বালা অনুভব করি। এইরূপে উর্ণনাভের ন্যায় প্রত্যেক পুষ্প হইতেই আমরা কেবল মাত্র গরল সংগ্রহ করি।

পরন্তু ঐরূপ উভয় বিধ তুলনা দ্বারা হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য নিবারণ করাই আমাদের পরম কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি সতত কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট ও অগর্ব্বিত থাকা এই দুই সদ্‌গুণ উক্ত তুলনাদ্বয় হইতে অর্জ্জন করা আমাদের উচিত।

মনে করুন কোন কিছু উত্তম গুণ বা ঐশ্বর্য্য আপনার আছে বলিয়া আপনি মনে মনে কিছু গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। এমন সময়ে যাঁহার ঐগুণ বা ঐশ্বর্য্য আপনার অপেক্ষা অধিক আছে তাঁহার কথা মনে করিয়া ঐ গর্ব্বকে জয় করা আপনার বিশেষ প্রয়োজন। ঐরূপ তুলনা হইতে ঈর্ষ্যাবিষ জ্বালা সংগ্রহ না করিয়া গর্ব্ব জয়-সুধা সঞ্চয় করাই যথার্থ বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আবার মনে করুন আপনার কোন কিছু নাই বলিয়া আপনি মনে দুঃখ বোধ করিতেছেন, অথবা কাহারও কোন দ্রব্য আপনা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে দেখিয়া আপনার হিংসা হইতেছে। ঠিক সেই সময়ে আপনার অপেক্ষা অধিক অভাব গ্রস্ত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ ঐ দুঃখ ও হিংসাকে জয় করা ও সন্তোষ অবলম্বন করাই আপনার কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞোত্তম ঈশ্বর যাহাকে যাহার অভাবে রাখা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাকে তাহার অভাবে রাখিয়াছেন। তাঁহার অপেক্ষা অধিক ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা ভালমন্দ জ্ঞান কাহারও নাই। আমরা নিজের বা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের বর্ত্তমান সুবিধা মাত্র পর্য্যালোচনা করিয়া কোন অবস্থা বা কোন বস্তুকে ভাল মনে করি। আর তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন সুবিধা বিবেচনা করতঃ যে অবস্থা বা যে বস্তু দেওয়া ভাল মনে করেন তাহাই আমাদিগকে দেন, এইরূপ চিন্তা ও নিশ্চয় করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করা আমাদের বিশেষ হিতকর।

দুই কি দশজন ধনাঢ্য ব্যক্তির কথা আলোচনা করিয়া চিত্তে অসন্তোষ উৎপাদন করা অপেক্ষা দুশ' পাঁচশ' দরিদ্র ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক চিত্তে সন্তোষ ও শ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

সন্তোষ রক্ষার চতুর্থ উপায় দৈন্য ও বিনয় অবলম্বন। আমাদের গর্ব্ব ও আবেদন বিদ্যা ধনজন রূপ ও কুলশীলাদির মদ আমাদিগকে সন্তোষ লাভ

করিতে দেয় না। আমরা আপনাদিগকে সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট মনে করি এবং অপরকে নিকৃষ্ট ও অনাধিকারী জ্ঞান করি। ইহা আমাদের এক মহৎ ভ্রম ও অশান্তির আকর। সন্তোষ লাভ করিতে হইলে আপনাদিগকে সততই সন্দেহের চক্ষে দেখা উচিত। বস্তুতই আমাদের গর্ব্ব করিবার কি আছে? আমাদের অপেক্ষা প্রত্যেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এমন কত লোকই জগতে আছেন! তাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু 'তৃণাদপি সুনীচ' হইয়া শ্রীভগবন্নাম গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তৃণাদপি হইতে গেলেই সকলকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা অবশ্যক হয়। উত্তম হইয়াও আপনাকে অধম মানিয়া লওয়া ইহাই তৃণাদপির অর্থ। তাই সাধক শ্রীবিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন—

'অবিনয়মপনয় বিষ্ণো! দময় মনঃ শময় বিষয়রস তৃষ্ণাং।
ভূতে দয়াং বিস্তারয় তারয় সংসার সাগরতঃ॥'

সন্তোষ রক্ষার পঞ্চম উপায় মিতাচার। মিতব্যয়িতা, মিতভোগিতা, মিত-ভাষিতা প্রভৃতি মিতাচারের বহু অঙ্গ। মিতব্যয়িতা হইতে অনভাব, ন্যায়পরতা, দানশীলতা, কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ প্রভৃতি বিবিধ গুণের উদ্ভব হয়। মিতব্যয়ী না হইলে সততই অভাবে পতিত থাকিতে হয়। এবং সেই অভাব পূরণ জন্য প্রবঞ্চনা ও দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার ও অযথা লাভ-চেষ্টা প্রভৃতি বহুবিধ অন্যায়াচরণ করিতে হয়। অমিতব্যয়ীর লোভ ও ঋণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। লোভে পাপ এবং পাপে মৃত্যু ঘটে। ঋণগ্রস্তকে সমাজে বিশ্বাস ও স্বাধীনতা বর্জ্জিত হইতে হয়। এবং পরিশেষে জীবন অশান্তি ও অসন্তোষের একটী বৃহৎ প্রস্রবণ হইয়া উঠে।

ঐরূপ মিতভোগী না হইলে সন্তোষ রক্ষা করা যায় না। কোন ভোগে অত্যাসক্তি না হয়। সকল বিষয়েই যাহাতে 'রয়, বয়, সয়' এরূপ আচরণ করা আবশ্যক, সময়ে সময়ে সাধ করিয়া কোন কোন বিষয়ে কিছুদিন বিরতি করাও প্রয়োজন। ঐরূপ অভ্যাস থাকিলে অভাবের সময়ে কোন কষ্ট হয় না, সন্তোষ থাকে। তিথি বিশেষে উপবাস করার এইটী এক মহৎ ফল।

মিতভাষণও সন্তোষের এক প্রধান উপাদান। অমিত বাক্য ব্যবহারের ফলে অনেক সময়ে আমরা মিথ্যা ও পরচর্চ্চা পাপে লিপ্ত হই। এবং সময়ে সময়ে দারুণ মনোকষ্ট পাইতে হয়।

সন্তোষ রক্ষার ষষ্ঠ উপায় দত্ত বস্তুর উপযোগিতা অর্থাৎ আমাদের যে সকল দ্রব্য বা সুবিধা আছে সেগুলির প্রকৃত মূল্য ও উপযোগিতা নির্দ্ধারণ করা। সাধারণতঃ আমরা যে সকল দ্রব্য এক্ষণে আবশ্যক মনে করিতেছি সেইগুলির দিকেই নিয়ত লক্ষ্য রাখি। এবং সেগুলিকে এতই মূল্যবান মনে করি যে, যেগুলি আমাদের এক্ষণে আছে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারি না। এই প্রকার অভাব বোধে মানব জীবনের এক প্রধান দুর্ব্বলতা।

তোমার এক্ষণে যাহা আছে ভাবিয়া দেখা উচিত তুমি সেটীর অভাবে কত অসুবিধায় পড়িতে। যাহার সেটী নাই সে সেটী প্রাপ্তির জন্য কতই আগ্রহান্বিত! আবার তুমি যেটীর জন্য অভিলাষ করিতেছ, সেটী যাহার আছে সে তাহাতে সন্তুষ্ট নয়। তোমার যাহা আছে সে সেইটীর জন্য বিশেষ প্রার্থনা করিতেছে। এমন কি তাহার অধিকৃত তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের কামনা করিতেছে। তাই কবি বলিয়াছেন—

"নিঃস্বোহপ্যেক শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ।
লক্ষেশ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাঙ্ক্ষতি।
চক্রেশঃ সুররাজতাং সুরপতি ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মা শিবপদং শিব বিষ্ণুপদং আশাবধিকোগতঃ॥

এই সকল চিন্তা ও বিচার পূর্ব্বক ঈশ্বর দয়া করিয়া যাহা দিয়াছেন এবং দয়া করিয়া যাহা দেন নাই দত্ত ও অদত্ত এই উভয়ের জন্যই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিয়া সতত সন্তোষে কাল যাপন করা বিধেয়।

সন্তোষ রক্ষার সপ্তম উপায়—বাঞ্ছিত বস্তুর অনুপযোগিতা। যে যে বস্তু আমাদের নাই বলিয়া মনে কষ্ট হইতেছে সেই সেই দ্রব্য প্রাপ্তি ঘটিলেও আমাদের কষ্ট দূর হইবে না ইত্যাকার চিন্তা ও নিশ্চয়।

আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে অভাব মিটে না, বরং বাড়ে। প্রাগুক্ত শ্লোকেই তাহা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। একরাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য পুনঃ চাও. সর্ব্বরাজ্য কর যদি লাভ—তথাপি অভাব বোধ ঘুচিবে না। আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণ মাত্রই ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু আশা ও আকাঙ্ক্ষা অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। প্রদীপের বর্ত্তিতে তৈল যোগ দিলে সে আরও উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিতে থাকে। তাই পণ্ডিতগণ কামনার নাম দিয়াছেন ভবক্ষুধা।

তারপর বুঝা কর্ত্তব্য যে, ঈপ্সিত বস্তু পাইলে আমরা যে বিশেষ সুবিধা লাভের আশা করি, সেই সুবিধার সঙ্গে সঙ্গেই কত অসুবিধা লুক্কায়িত থাকে। প্রাপ্তির ব্যগ্রতা বশে সে সময় আমরা সেই অসুবিধা দেখিতে পাই না কিন্তু

যখন প্রাপ্তি ঘটে তখন সে গুলি দৃষ্ট হয়। তদ্ব্যতীত বাঞ্ছিত বস্তু পাইবার হয়ত আমাদের উপযোগিতাই নাই।

জগতে এমন কোন বস্তুই নাই যাহার প্রাপ্তিতে সুভোগগণের বৃদ্ধি না হয়। মনে শঙ্কা না আসে। আবার প্রত্যেক বস্তুই না পাওয়া পর্য্যন্ত সুখকর বলিয়া অনুমিত হয় কিন্তু একবার প্রাপ্তি ঘটিলে আর তাহার সুখকরত্ব থাকেনা। বরং তাহা বিরক্তি কর হইয়া উঠে।

এদিকে, এই যে প্রাপ্তি তাহাও কৃষ্ণ কৃপা ব্যতীত ঘটে না। তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। শাস্ত্রও বলেন—

আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণ কৃপা নৈলে জীবের বাঞ্ছা নাহি পুরে॥

ইপ্সিত বিষয় লাভ সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলেন –

কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়িয়া বিষ মাগে এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

অতএব আকাঙ্ক্ষিত বস্তু মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা তুল্য প্রকৃত সুখ প্রদানে একান্ত অসমর্থ। কৃত নিশ্চয় করতঃ সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা পরিহার পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দেচ্ছায় একান্ত ভাবে আত্ম-সমর্পণ করাই আমাদের পরম শ্রেয়োৎপাদক ও সন্তোষ জনক।

শ্রীভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই মহাসম্পত্তি সন্তোষ প্রদান করুন। আমরা শান্তরতির অধিকারী হই।

ধর্ম্মাশ্রয়, ইহলোক অস্থায়ী বিচার।
দীনজনে দৃষ্টিপাত, দৈন্য-ব্যবহার॥
আলোচনা প্রাপ্ত-ধন উপযোগি কত।
পাবে কি না পাবে শান্তি লভিলে বাঞ্ছিত।
মিতাচার এই সপ্ত নীতি যেই জন।
পালিবে, পাইবে সেই সন্তোষ রতন।

গোপাল-গীতিকা।

(চাতুরী।)

—:০:—

গৌর, ধন্য হে তব চাতুরী!
যখন্ সে ছিল, বুঝিতে না দিলে,—
কি তাঁর মোহন মাধুরী॥

সে যে খেলা ল'য়ে থাকিত প্রমত্ত,
গোবৎস লইয়ে সদা রত চিত্ত;
মন্দিরা করিতে কি শোভা পাইত,
জীবিতে, বুঝিতে না'রি।

বরজের কোন্ অজানা রাখালে,
ক্ষণিকের তরে ধরায় পাঠালে,
অমৃত সন্ধান দিয়া লুকাইলে;—
ধন্য তব লুকো-চুরী!

বিরহের ভাব "জাগাতে কেবল,"
বুঝাতে সাধনা শুধু আঁখিজল,"
"বিষামৃত গোরা-প্রেম" মহাবল;—
ভাল খেলিলে হে শ্রীহরি।

আভাসে যাহার এরূপ সৌন্দর্য্য,
প্রকাশে তাহার মরি কি মাধুর্য্য,
যদি দিয়ে নিলে, স্ব-কার্য্য সাধিলে,
ছুটাও নিত্য ভাবের লহরী।

বিরহের মাঝে কি আনন্দ ধারা,
কি পাগল-করা ভাবের ত্রিধারা,
বুঝিবার শক্তি, দাও প্রেম ভক্তি,
(সখে) কাতরে যাচনা করি।

গোপালের সঙ্গে গোপালের খেলা,
হেরিতে পরাণ বড়ই উথলা,
শ্রীনিত্যধামের নিত্যানন্দ লীলা,—
(হরি) হেরি যেন আঁখি ভরি।

হে সখা, নিঠুর হ'য়োনা, হ'য়োনা,
ঘুচাও মায়িক ভবের যাতনা,
হে করুণাময়, দেখায়ে করুণা,—
তার দিয়ে পদ তরী॥

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

ধর্ম্মনিষ্ঠং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি সুখ দুঃখ মূচ্ছিতং ন কুর্ব্বন্তি সোঽমৃতত্বায় মুক্তয়ে কল্প্যতে। নতু তাদৃশো দুঃখ সুখ মূচ্ছিত ইত্যর্থঃ। উক্তমর্থং স্ফুটয়ন্ পুরুষং বিশিনষ্টি সমেতি। ধর্ম্মানুষ্ঠানস্য কষ্টসাধ্যত্বাদ্দুঃখমনুষঙ্গলব্ধং সুখঞ্চ যস্য সমং ভবতি তাভ্যাং মুখম্লানতোল্লাসরহিতমিত্যর্থঃ॥১৫॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

দেখা যায় না। আমি নিস্প্রয়োজনে কেন এই বন্ধু মরণাদি নিবন্ধন বিষম শোক সহ্য করি, এই কষ্টকর তিতিক্ষায় আমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? সেইকারণ শ্রীভগবান দেখাইতেছেন:—যে পুরুষ ধর্ম্মার্থ এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যাস করে, সেই পরিণামে অমৃত ফলরূপ মুক্তি (অন্যথা খ্যাতি পরিত্যাগ রূপ যে মুক্তিকে আপাততঃ প্রয়োজনের চরম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ঐ মুক্তি) লাভে সক্ষম হইয়া থাকে।

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! জাগতিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ঐ সকল শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদি ধর্ম্মপ্রাণ যে পুরুষকে ব্যথিত না করে, অর্থাৎ দুঃখে মূর্চ্ছিত ও সুখে অন্ধ না করে। স্বকীয় ধৈর্য্য দ্বারা, যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, সেই ধৈর্য্যশীল পুরুষই মুক্তিরূপ শাশ্বত আনন্দলাভে সক্ষম হইয়া থাকে। ধৈর্য্য ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের পাত্র হওয়া যায় না। এখানে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে "পুরুষর্ষভ" শব্দে সম্বোধন করিয়া, তুমি সৎকুলোৎপন্ন ও শিক্ষিত পুরুষ, তোমার পক্ষে পুরুষ তুল্য হওয়াই কর্ত্তব্য। এই "পুরুষ" শব্দের তাৎপর্য্যেও দেখা যায়, যিনি পরমাত্মরূপে সমস্ত জীবের অন্তরে শয়ান থাকিয়াও, ভাবৎ বিকার-স্পর্শ-পরিশূন্য রূপে অবস্থান করিতেছেন তিনিই পুরুষ; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুববাক্যে—

> "যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
> সংজীবয়ত্যখিল শক্তিধরঃ স্বধাম্না।
> অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
> প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥"

অখিল শক্তিধর যিনি আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আমার এই লীন বাক্যকে এবং হস্ত, চরণ, শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শেন্দ্রিয়, ও প্রাণ সকলকে নিজ চিৎশক্তি দ্বারা

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

তদেবং ভগবতা পার্থস্যাস্থান শোচিতত্বেন তৎপাণ্ডিত্যমাক্ষিপ্তং। শোকহরঞ্চ স্বোপাসনমেব তচ্চোপাস্যোপাসকত্বেদঘটিতমিত্যুপাস্যাজ্জীবাংশিনঃ স্বস্মাদুপাসকানাং জীবাংশানাং তাত্ত্বিকং দ্বৈতমুপদিষ্টং। অথ যদাত্মতত্ত্বেনতু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেদিত্যাদাবংশ স্বরূপজ্ঞানস্যাংশি-স্বরূপ জ্ঞানোপযোগিত্ব শ্রবণাত্তল্লাদৌ সনিষ্ঠাদীন্ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষেণোপদেশ্যং তচ্চদেহাত্মনো বৈধর্ম্ম্যধিয়মন্তরা ন স্যাদিতি তদ্বৈধর্ম্ম্যাবোধায়ারভ্যতে নাসত ইত্যাদিভিঃ।

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

নিত্যমাত্মেত্যুক্তম্। কিমাত্মৈবনিত্য আহোস্বিদন্যদপি। অন্যদপি তৎকিমিত্যত আহ। নাসতঃ ইতি—অসত কারণস্যসতো ব্রহ্মণশ্চাভাবো ন বিদ্যতে। প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব নিত্যৌকালশ্চ সত্তমেতি বচনাচ্ছ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

তাৎপর্য্যানুবাদ।

সংজীবিত করিতেছেন, অর্থাৎ স্ব স্ব কর্ম্মে চেতন পদার্থের ন্যায় প্রেরিত করিতেছেন। আমি সেই অন্তর্য্যামী পুরুষ শ্রীভগবানকে প্রণাম করি। যথা প্রশ্নোপনিষদে,—"ইহৈবান্তঃ শরীরে সৌম্য! স পুরুষঃ" "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।" (কঠ ৪।১২) অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ যিনি জীবের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন তিনিই পুরুষ।

এখানে অর্জ্জুনকেও যেন বিষয়ের তাবৎ সুখ দুঃখের মধ্যে অবস্থান করিয়াও সেই অন্তর্য্যামী পুরুষের ন্যায় নির্ব্বিকার হইতে উপদেশ করিলেন। এতাদৃশ বিকার শূন্য পুরুষেরই মুক্তি সুলভ, ইহাই যেন শ্রীভগবানের বাক্যে বিশেষ ব্যঞ্জিত হইয়াছে ॥১৫॥

শ্রীভগবান এইরূপে অযোগ্য বিষয়ে অকারণ শোক করায় পৃথানন্দ অর্জ্জুনের বিবেককে তিরস্কার করিয়া তাবৎ শোকনাশের একমাত্র উপায় স্বরূপ স্বকীয় উপাসনার বিষয় শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে, প্রথমতঃ অংশ স্বরূপ উপাস্য

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

অসতঃ পরিণামিনো দেহাদের্ভাবোঽপরিণামিত্বং ন বিদ্যতে। সতোঽপরিণামিন আত্মণস্তুভাবং পরিণামিত্বং নবিদ্যতে, দেহাত্মানৌ পরিণামাপরিণামস্বভাবৌ ভবতঃ। এবমুভয়োরসৎসচ্ছব্দিতয়োর্দেহাত্মনোরন্তো নির্ণয়স্তত্ত্বদর্শিভিস্তত্ত্ব স্বভাববেদিভিঃ পুরুষৈর্দৃষ্টোঽনুভূতঃ। অত্রাসচ্ছব্দেন বিনশ্বরং দেহাদিজড়ং

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

পৃথগ্বিজ্ঞতইত্যাদয়ার্থঃ। অসতঃ কারণত্বং চ সদসদ্রূপশ্চাচাসৌ গুণ যথাগুণো বিভুরিতি শ্রীভাগবতে। অসতঃ সদজায়তেতি চ। অব্যক্তেশ্চ। সংপ্রদায় তশ্চেতৎসিদ্ধমিত্যাহ। উভয়োরপীতি। অন্তোনির্ণয়ঃ॥১৬॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

হইতে অংশ স্বরূপ জীবের তত্ত্বতঃ ভেদ, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর নিত্য পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরের অবিদ্যায় উপহিতাবস্থা যে জীব আখ্যায় অভিহিত হয় মাত্র, উহার তত্ত্বতঃ পার্থক্য নাই তাহা নহে। অথবা অবিদ্যাকৃত অধ্যারোপ বা অপবাদের দ্বারা অন্ধকারে পতিত রজ্জুর স্বরূপ অপরিজ্ঞানে সর্পভ্রমের ন্যায়, ঈশ্বরের স্বরূপ অপরিজ্ঞাত থাকায় তাঁহাকে জগৎ বা জীব বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ইহাদিগের পৃথক কোন সত্তা নাই। ইত্যাকার পূর্ব্ব পক্ষী মতের অসমীচিনত্ব প্রতিপাদন মানসেই তিনি জীবেশ্বরের তাত্ত্বিক ভেদ উপদেশেচ্ছু হইলেন। কারণ যুক্ত পুরুষ যৎকালে দীপোপম আত্ম-তত্ত্বের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বকে অবলোকন করেন, অর্থাৎ জীব যে অবস্থায় দীপস্থানীয় প্রকাশ স্বরূপ নিজ আত্মার দ্বারা পরমাত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হন, তৎকালে তিনি উভয় আত্মার বিজ্ঞান,—আত্মা যে অজ, নিত্য এই আত্মা যে অবিদ্যা বা তাহার কার্য্য নহে, উহা হইতে আত্মা পৃথক বিশুদ্ধ, ইত্যাকার আত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত অংশ স্বরূপ জীবাত্মার জ্ঞান অংশী পরমাত্মজ্ঞানের উপযোগী হওয়ায় সনিষ্ঠাদি সকল প্রকার অধিকারির প্রতিই উপদেষ্টব্য। পরন্তু উহা দেহের সহিত আত্মার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের জ্ঞান ব্যতিরেকে হইতে পারেনা, তজ্জন্যই এই শ্লোকের অবতারণা।

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

সচ্ছব্দেন ত্ববিনশ্বরমাত্মচৈতন্য মুচ্যতে। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি নিনীতং দৃষ্টং। জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুর্বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ। নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্ব্বং যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য্যে-ত্যস্তিনাস্তিশব্দবাচ্যযোশ্চেতনজড়যোস্তথাত্বং বস্তুস্তি কিংকুত্রচিদিত্যাদিভির্নি রূপিতঃ। তত্র নাস্তিশব্দ বাচ্যং জড়ং। অস্তিশব্দবাচ্যন্তু চৈতন্যমিতি স্বয়মেব

তাৎপর্য্যানুবাদ।

জীবাত্মার এই জাগতিক দেহ জড় ও অসৎ অর্থাৎ পরিণামী অতএব অনিত্য। অতএব সৎস্বরূপ অপরিণামী আত্মার পরিণাম বা নাশ হইতে পারে না। তত্ত্বদর্শিগণ অসৎ ও সৎ আখ্যায় অভিহিত দেহ ও আত্মার এইরূপ বিরুদ্ধ স্বভাবের বিচারে পরস্পরের তত্ত্বতঃ পার্থক্য অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এই জড় ও চৈতন্যের বিরুদ্ধ স্বভাব অর্থাৎ পরিণামিত্ব ও অনিত্যত্ব এবং অপরিণামত্ব ও নিত্যত্বের বিষয় উক্ত হইয়াছে—

"জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ
বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ।
নদ্য সমুদ্রাশ্চ স এব সর্ব্বং
যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য্য॥"

হে বিপ্র শ্রেষ্ঠ। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অভ্যন্তরস্থিত জ্যোতির্ম্মণ্ডলের জ্যোতিঃ সমুদায় পৃথিব্যাদি ভূমণ্ডল ও তন্মধ্যবর্ত্তিবন, গিরি, দিক্, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি যে সমুদয় বস্তু আছে উক্ত তাবৎ বস্তুই বিষ্ণু, এবং অস্তি, নাস্তি শব্দে যাহা অভিহিত হইয়া থাকে তাহাও সেই বিষ্ণু। এখানে অস্তি নাস্তি শব্দ চেতন ও জড়ের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—

"বস্ত্বস্তি কিং কুত্রচিদাদি মধ্য
পর্য্যন্ত হীনং সততৈক রূপম্।
যচ্চান্যথাত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো
নতত্তথা কুত্র কুতোহি তত্ত্বম্॥"

এখানে যে বস্তু আদিতে থাকেনা এবং পরিশেষেও থাকেনা, বর্ত্তমান কালে উহা থাকিলেও, না থাকিবারই সমান।' এই ন্যায়ানুসারে যাহার আগম ও

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

বিবৃতং। যত্তু সৎকার্য্যবাদস্থাপনায়ৈবৈতৎ পদ্যমিত্যাহুস্তন্নিরবধানং। দেহাত্ম-স্বভাবানভিজ্ঞান মোহিতং প্রতি তন্মোহবিনিবৃত্তয়ে তৎস্বভাবাভিজ্ঞাপনস্য প্রকৃতত্বাৎ ॥১৬॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

অপায় আছে এবং যাহা পরিণামী তাহা বাস্তব নহে। [ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য সুতরাং যাহার বাস্তবত্ব নাই ও উৎপত্তি বিনাশ আছে এরূপ জড় বস্তুই এখানে নাস্তি শব্দবাচ্য এবং ত্রিকালে যাহা সমভাবে অবস্থান করে এমন চিৎ বস্তুই অস্তি শব্দে অভিহিত হয় বা অস্তি শব্দ বাচ্য।

কেহ কেহ সৎকার্য্যবাদ স্থাপনের জন্য এই কথা বলিলাম তাহা মনে করেন না, কেননা সৃষ্টিতত্ত্বের পর্য্যালোচনায়, সৎকার্য্যের প্রতিকূলে অনেক কথাই পাওয়া যায়। ইহা কেবল মাত্র দেহাত্মস্বভাবানভিজ্ঞ (বর্ত্তমান সময়ে) তোমার মত মোহ প্রাপ্তের মোহাপনোদনার্থে আত্মার স্বরূপ জ্ঞাপন পূর্ব্বক পরিদৃশ্যমান জগতে উভয় স্বভাব বস্তু যে নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে তৎপ্রদর্শনোদ্দেশ্যেই উক্ত হইল। কারণ "অসতঃ সদ জায়ত" "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুত্যাবলম্বনে একশ্রেণীর তার্কিকেরা অসৎ বাদের স্থাপনেও বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন।

পরন্তু ঐ সকল শ্রুতির পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য মহাশয় যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উক্ত অসৎকার্য্যবাদের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তিনি বলেন; অত্যন্ত অসৎ হইতে কখন জগদাদির জন্ম হইতে পারেনা, "অসৎ" অর্থাৎ "ব্যাকৃত নামরূপ বিশেষ বিপরীতরূপং" নাম রূপাদি দ্বারা যাহা ব্যাকৃত হইয়াছে তাহার বিশেষ বিপরীত স্বরূপ অবিকৃত ব্রহ্মই এখানে অসৎ শব্দে অভিহিত হইতেছেন। আচার্য্যের মতে অসৎ" শব্দ অত্যন্ত "অসৎ বা অভাব অর্থে প্রযুক্ত দেখা যাইতেছে না। সুতরাং অসৎ অর্থে জড় বা কার্য্যাবস্থারূপ অর্থ বিশেষ যৌক্তিক ও পুরাণ সিদ্ধ বলিয়াই গ্রহণ যোগ্য মনে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও "সদসদ্রূপয়া চাসৌ" এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে দেখা যায় শ্রীভগবান তাঁহার সদসদ্রূপা গুণময়ী মায়া দ্বারা জগতের সৃষ্টি বিধান করিয়া

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

উক্তং জীবাত্মতদ্দেহয়োঃ স্বভাবং বিশদয়ত্যবিনাশীতি দ্বাভ্যাং। তজ্জীবাত্মতত্ত্বমবিনাশি নিত্যংবিদ্ধি। যেন সর্ব্বমিদং শরীরং ততং ধর্ম্মভূতেন জ্ঞানেন ব্যাপ্তমস্তি অস্যাবয়বস্য পরমাণুত্বেন চ বিনাশানর্হস্য বিনাশং ন কশ্চিৎ স্থূলোহর্থঃ কর্ত্তুমর্হতি প্রাণস্যেব দেহঃ। ইহ জীবাত্মনো দেহ পরিমিতত্বং ন প্রত্যেতব্যং

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

কিংবহুনা। যদ্দেশতোহনন্ততন্নিত্যমেব বেদাদ্যস্তদপীত্যাহ। অবিনাশীতি। ন্যাপিশাপাদিনা বিনাশ ইত্যাহ। বিনাশমিতি। অব্যয়স্য তং ॥১৭॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

থাকেন। এখানে সৃষ্টি কার্য্য কাহাকে লইয়া তাহার বিচারে দেখা যায়, সৎ অসৎ উভয়রূপা মায়া তটস্থা জীব শক্তি ও অপরা শক্তি প্রভৃতিকে লইয়া।" কারণ মায়া শব্দের শক্তি অর্থ বহুস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বস্তুতঃ জগৎ কার্য্যও এই দুইকে লইয়াই। সুতরাং উপরি উক্ত চিৎ জড় অর্থই এখানে বিশেষ সঙ্গত হইয়েছে ॥১৬॥

পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মা যখন দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইলেন, তখন জীব ও দেহের স্বভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বে নিত্য ও বিনাশী বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই বক্ষমাণ উভয় শ্লোকে বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন। হে অর্জ্জুন! সেই জীবাত্মাকে অবিনাশী জানিবে, যে অবিনাশী জীব আত্মারূপে এই পরিদৃশ্যমান সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। জীবের উক্ত অবস্থান ধর্ম্মভূত জ্ঞানের দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে উহা নিত্য। দেহ যেমন স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াও প্রাণের বিনাশে সক্ষম হয় না, তদ্রূপ ব্যাপক সূক্ষ্মতর জীব, অর্থাৎ পরমাণুত্বে নিবন্ধন বিনাশের সম্পূর্ণ অযোগ্য জীবের বিনাস সাধন কোন স্থূলতম বস্তুর দ্বারা সাধিত হইতে পারেনা। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে জীবাত্মার

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্ ।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশেত্যাদিষু তস্য পরমাণুত্ব শ্রবণাৎ। তাদৃশস্য নিখিল দেহব্যাপ্তিস্তু ধর্ম্মভূত জ্ঞানেনৈব স্যাৎ। এবমাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ। "গুণাদ্বালোকবদিতি"। ইহাপি স্বয়ং বক্ষ্যতি যথা প্রকাশয়ত্যেক ইত্যাদিনা ॥১৭॥

তাৎপর্য্যানুবাদ ।

পরিমাণ দেহ পরিমাণের অনুরূপ হইয়া থাকে। কারণ জীবাত্মা নিত্য অপরিণামী যদ্যপি দেহের সহিত আত্মার পরিমাণ বলা হয় তাহা হইলে প্রথমতঃ পরিণামিত্বের দ্বারা আত্মার অনিত্যতাদোষ ও শ্রুতি ব্যাকোপ হইয়া পড়ে। "এই অণু আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানিবে, যাহাতে প্রাণ পঞ্চ বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়াছে" ইত্যাদি রূপ শ্রুতি বাক্যে জীবাত্মার অণুপরিমাণত্বই শ্রুত হওয়া যায়। অতএব এবম্ভূত আত্মার নিখিল দেহ ব্যাপ্তি ধর্ম্মভূত কোন জ্ঞানের দ্বারা হইয়া থাকে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে। অর্থাৎ আত্মা সৎচিৎ স্বরূপ হইয়াও যেমন অণু হইতেছেন, তদ্রূপ তিনি চেতন হইলেও চেতয়িতৃত্ব ধর্ম্ম তাঁহাতে আছে তাহাও স্বীকার করিতেই হইতেছে, অন্যথা নিখিল দেহের ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইতে পারেনা। "গুণাদ্বালোকবৎ" (বেদান্তসূত্র ২।৩।২৪) এই সূত্রে আলোকাদির ন্যায় ধর্ম্ম দ্বারা অনেক দেশ ব্যাপিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যথা রামানুজ ভাষ্য—

"আত্মা স্বগুণেন জ্ঞানেন সকল দেহং ব্যাপ্যাবস্থিতঃ, আলোকবৎ যথা মণিদ্যুমণি প্রভৃতীনামেকদেশ বর্ত্তিনামালোকোঽনেক দেশ ব্যাপী দৃশ্যতে, তদ্বদ্ হৃদয়স্থস্যাত্মনো জ্ঞানং সকল দেহং ব্যাপ্যবর্ত্ততে।

গোবিন্দ ভাষ্য যথা—

অণুরপি জীবশ্চেতয়িতৃত্বলক্ষণেন চিদ্গুণেন নিখিল দেহব্যাপীস্যাৎ আলোকবৎ। যথা সূর্য্যাদিরালোক একদেশস্থোঽপি প্রভয়া কৃৎস্নং খগোলং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ।"

আত্মাঅণু হইলেও চেতয়িতৃত্ব লক্ষণ স্বকীয় চিদ্গুণ—অর্থাৎ জীব ধর্ম্মের দ্বারা আলোকের ন্যায় নিখিল দেহব্যাপী হইয়া থাকেন। "যথা প্রকাশয়ত্যেক

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

অন্তবন্তঃ বিনাশিস্বভাবাঃ। শরীরিণো জীবাত্মনঃ। অপ্রমেয়স্যাতি সূক্ষ্মত্বা বিজ্ঞান বিজ্ঞাতৃস্বরূপত্বাচ্চ প্রমাতুমশক্যস্যেত্যর্থঃ। তথাচেদৃশস্বভাবস্য জীব

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

তবতু দেহস্যাপি কস্যচিন্নিত্যত্বমিতি নেত্যাহ। অন্তবন্তইতি। অন্তবন্তইতি দর্পণনাশাৎ প্রতিবিম্বনাশবদাত্মনাশ ইত্যাহ। নিত্যস্যেতি। শরীরিণ ইতি। ঈশ্বরব্যাবৃত্তয়ে। ন চ নৈমিত্তিক নাশইত্যাহ। অনাশিন ইতি। কুতঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ।

কুংস্নংলোকমিমংধ্রুবিঃ” এই শ্লোকে ভগবান স্বয়ংও ইহাই উপদেশ করিয়াছেন। এ‍ং.‍সে যাঁহারা নিবিড়াবয়ব তেজ দ্রব্য প্রদীপ, আর প্রবিরলা বয়ব তেজ দ্রব্যকে প্রভা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই যুক্তি দোষ দুষ্ট। কারণ অবয়ব বিশীর্ণ হইলে তাহাকে আর তদ্ বস্তুরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারেনা। পদ্মরাগাদি মণিকে নিজ প্রভার দ্বারা বদ্ধিত পরিসরে অবস্থান করিতে দেখা যায়। কিন্তু মণিতে তৎকালে প্রবিরলাবয়ব রূপ কোন বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রভা বস্তুর গুণ, উহা যে বিরলাবয়ব নহে তাহা নিশ্চয় হইতেছে। অতএব নিত্য অণু-আত্মার নাশ, এমন কি শাপাদি দ্বারা অন্য দেহাদি বস্তুর বিনাশের ন্যায় কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারেনা ॥১৭॥

অবিনাশী উক্ত জীবের দেহ বিনাশী হইলেও, জীব অবিনশ্বররূপে অবস্থান করতঃ বিভিন্ন দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। মূলে “শরীরিণঃ” এই বিশেষণ হইতে জীবের সকলাবস্থাতেই যে শরীর বিদ্যমান তাহা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ইদম্ শব্দ নির্দ্দিষ্ট ভৌতিক কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম এতদুভয় শরীর বিনশ্বর। আর মায়িক সম্বন্ধ পরিশূন্য হইয়া জীবের নিজ স্বরূপে অবস্থান কালে, ও সাধনের তারতম্যানুসারে সাধনোপযোগী যে দেহ লাভ হইয়া থাকে

নিবেদন।

—:০:—

যে সুরে বাজাও বাঁশী কেমন সে সুর
আমার প্রাণের জ্বালা করে দেয় দূর?
যখনি যে মূর্চ্ছনায় বাজাও সে তার—
আমার তন্ত্রীতে উঠে তেমনি ঝঙ্কার।

তোমার জ্যোছনা রাশি কেমনে অলখে
হৃদয় কুমুদে মোর দেয় ফুটাইয়া?
তোমার সে শান্তিসুধা আমরি পুলকে
আমার সকল ক্ষুধা দেয় মিটাইয়া।

কি মনে ফুকার'?—তব মুরলীর তানে
আমার হৃদয় কুঞ্জ উঠেগো নাচিয়া;
এতদিন চাহি নাই ফিরে যার পানে—
আজি তার পদে প্রাণ সঁপিব যাচিয়া।

সঙ্গীত থামিয়া যায়—থাকে তার রেশ,
জীবনে মরণে সখা—থেক হৃদয়েশ।

শ্রীগোপেন্দু ভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

প্রেমাবতার।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর।)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

"নামবিনু কলিকালে ধর্ম্মনাহি আর।
কলিকালে কৈছে হব কৃষ্ণ অবতার॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥"

লীলাপূরণচ্ছলে যথাকালে প্রেমবিলাইতেই রাধাকৃষ্ণ একতনু হইয়া শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ সুন্দররূপে অবতীর্ণ হইলেন। তদ্ব্যতীত এলীলার অপর কোন হেতু নাই। প্রেমলীলা ধর্ম্মাতীত, নামই কলির পরম ধর্ম্ম, উহার প্রচারক যিনি, তাঁহাকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গঙ্গাজল ও তুলসী মূল্যে কিনিয়া আনিয়াছেন।

"কলিকালে কৈছে হব কৃষ্ণ অবতার।"

ইহা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রথমে সন্দিহান হইয়াও শেষে উপায় স্থির করিলেন, এবং নিজ ভক্তিবলে সেই গোলকপতিকে অবতারণ করাইলেন।

"বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহার।"

বিষ্ণু-নামদানে অসুর বা পাষণ্ডী উদ্ধার করিয়াছেন। ভক্তি-লেশহীন জীব অসুর বলিয়া অভিহিত হয়। ভক্তি সঞ্চার করিয়া দিবার নাম উদ্ধার। অন্তরঙ্গ হেতুস্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনের উক্তি যথা,—

"মাতামোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীনজ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম?
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

এই শুদ্ধ ভক্তি ল'য়ে করিমু অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার?
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিও না জানি না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥"

উপরোক্ত পয়ারচ্ছন্দে প্রেমাবতারের লীলা, কর্ম্ম ও অভিপ্রায় এবং মানব-জীবনের সৌভাগ্য, সাফল্য ও চরম লক্ষ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই ভনিতা-দর্পণে প্রেম-জগৎখানি সম্যক্ পরিকল্পিত হইয়াছে। মস্তকের উপর যেমন মুকুট শোভাপায়, সর্ব্বধর্ম্মের উপর, সর্ব্বশাস্ত্রোপদেশের উপর সেইরূপ ইহাও মণি মুকুট স্বরূপ। যে মহাপুরুষ সর্ব্বতঃ ঋণী, তিনি প্রেমাবতার। উক্ত ভনিতার ছত্রে ছত্রেই প্রভুর ঋণদায় পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। উঁহার যেন আর উপায় নাই; অধমর্ণত্ব ভাবি প্রেমাবতারের লক্ষণ। প্রেমাবতারের চরিত্র একেবারে উল্টা, ভক্ত যেন তাহার কোন দায় রাখেনা, ভগবানই যেন দায়ী। এখানে ভক্তের প্রাধান্য ও বাহাদুরি কত!

"ভক্তেরে প্রসাদ।" ভক্তের আনন্দ বিধান মূলক সেবা সাধন যাঁহার লীলার মুখ্যাঙ্গ তিনি প্রেমাবতার।

"হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।"

ভক্তের পোষণ বা প্রসাদ করা প্রেমাবতারের কার্য্য।

পতিত অধম জীবের জন্য নামই যথেষ্ট জীব বা ভক্ত আনন্দই চাহেন, আর প্রেমাবতারই আনন্দ দাতা।" "আনন্দাংশে হ্লাদিনী" হ্লাদিনীর প্রকট-কেলিস্বরূপ প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীনন্দনন্দন যিনি অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব তিনি সর্ব্বাবতার অঙ্গে করিয়া যেন বহু শাখাযুক্ত কল্পবৃক্ষের ন্যায় কলিযুগে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। একসোণার মানুষ আমাদের মধ্যে নামিলেন। চাঁদ বামনের মুঠে ধরা দিলেন। ইহার পর আর আমাদের অপর কি বাঞ্ছিত আছে! হাতের ফেলিয়া কে আর পাতের তল্লাস করে?

মধুর মানুষটী হাসিতে মধু ছড়াইতেছেন, আলিঙ্গনে প্রেম-ভাসিত করিতেছেন মিঠা কথায় প্রাণ জুড়াইতেছেন। এ ধনের উপেক্ষা করিয়া আর কোনধনের প্রতীক্ষা করিব। পদে পদে অনুসন্ধান করা যাহার গুণ, সেই গুণনিধি গৌর নিত্যানন্দ না ভজিয়া পণ্ডিত আর কে জীবন ধন্য করিতে বিরত থাকে? "গৌর নিত্যানন্দ কৃপা" এই কথা স্মরণেই প্রাণে অমৃতের লহরী উঠে, অধিক কি। গৌর নিত্যানন্দকে যিনি আপনার করিতে পারিয়াছেন তিনিই সিদ্ধ, তিনিই ধন্য, তিনিই পূর্ণ মনোরথ হইয়াছেন। বৈষ্ণবকবি শ্রীল গোবিন্দ দাস গাহিয়াছেন,—

"পূরবে কাঁদিয়াছিল গোপী প্রেমেভোরা।
ভাবিয়া রাধার প্রেম এবে হৈল গোরা॥
ছল ছল অরুণ নয়ান অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥"

বিরাগে অনুরাগ না আনিয়া দিতে পারে কিন্তু অনুরাগই যথার্থ বৈরাগ্যের মূল। ঈশ্বরে অনুরাগ আসিলে অনীশ্বরে (সংসারে) বিরাগ আপনিই আসিবে। সুতরাং অনুরাগী বা বৈরাগী একই জন।

অনুরাগীর নয়ন অরুণ বর্ণ এবং সতত ছলছল। অনুরাগী জন কালবর্ণ হইলেও রাধা-প্রেমের তপ্ত হেমচ্ছটায় স্বর্ণোজ্জ্বল দেখায়। ইহা এক গূঢ় বিজ্ঞান ঘোষনা বটে। অনুরাগীর বিলাসিতার গন্ধও থাকে না। অনুরাগী ভুক্তি মুক্তি রূপ রোগে রোগীনয়। অনুরাগী ধূলায় গড়াইতে ভয় করে না বরং ভালবাসে। ধূলি বিনয়ের পবিত্র ভূষণ। মহাপরাক্রান্তসিংহ কেমন বিনয়াবনত হইয়া দেবীর পাদপদ্ম পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছে। বিনয় মহীয়ান্ হইয়াও ভক্তি দেবীর পাদ মূলে ধূলি সদৃশ।

রাধাকৃষ্ণের ভাববিক্রমবিদ্যুদ্বৈভব আনিয়া শ্রীগৌর ভগবান এক নব অমোঘ ভজন পদ্ধতি প্রচার করিলেন। যে সহজ সুপথচারির সন্ধান পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যোগী ঋষিগণও পান নাই তাহাই কলিযুগে প্রকাশ করিলেন। এ নব বরিষণে দুর্ল্লভ ভক্তি-বৈভব লাভের পাঁচটী কৌশল বা ফোয়ারা খুলিয়া গেল। যথাঃ—(১) মহত্তের সঙ্গ। (২) আচার্য্য সঙ্গ বা দীক্ষা। (৩) ঈশ শক্তি-রূপিণী ভক্তি দেবীর বিকাশ। (৪) ঈশ প্রকাশের কৃপা বা ধামপ্রাপ্তি। (৫) যুগল সেবাধিকার। এই পঞ্চ ফোয়ারার সিকরে জীব কৃষ্ণ-কাম ভাবান্বিত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় চিত্তবৃত্তি মধুময় বোধ করিতে লাগিল। এই পঞ্চ কুসুমের পরাগ গন্ধে জীব প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল। বহু যোগ সাধনায়ও এই দিব্য পিযূষামৃত-ভাবের সঞ্চার হয় না। ভক্তির অদ্ভুত শ্রীসঙ্কীর্ত্তন মণ্ডপের ধূলায় লোটাইলে যে কি এক অমৃতে অন্তর বাহির অমৃতায়মান হয় তাহার অখাদ সুখ বুঝাইবার নয়। ইহা শিক্ষা দিতেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গৌর হইয়া ধূলায় লোটাইয়া কতনা কাঁদিলেন। যাহা শিখাইতে কৃষ্ণেরই প্রয়োজন তাহা শিখাইতে তুমি আমি কে? ধূলি ও কান্না নিষ্কিঞ্চণ ধর্ম্ম শিক্ষার এক অমৃতময় পন্থা।

দেবতা মাত্রেই দাতা। সম্পত্তি বিশেষের ভাণ্ডারী। দেবতা শিরোমণি বিষ্ণু দাতার শিরোমণি, কারণ লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই-ই তাঁহার ঘরণী। বিদ্যা ও সৌভাগ্য-সম্পদের ভাণ্ডার বিষ্ণু মন্দির। বিষ্ণুর চতুর্হস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম বিরাজ করে। শঙ্খ-নাদ শক্তি (বেদ—ভাষা) চক্র—রাজনীতি, গদা শাসন শক্তি এবং পদ্ম—রাজলক্ষ্মী। ইনি ঈশ্বর পালক। কৃষ্ণ—মানুষরূপী বংশী-ধারী, ইনি যে সে দাতা নহেন। ইনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের অতীত প্রেম দান করেন। ইতি প্রেমদাতা।

"আমার কাছে তোমারা অপর কিছু চাহিওনা"—এই ঘোষণা গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ সাজিলেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইয়া হাত চিৎ করিয়া দেখাইতেছেন "আমার কিছু নাই, আমি কাঙ্গাল ভিক্ষুক, ঋণী" এবং কিছু নাই এই আনন্দে নাচিতেছেন ও সর্ব্বজীবকে ভিক্ষুক বা ত্যাগী হইতে উপদেশ করিতেছেন।

ঈশ্বর যুগানুক্রমে নিজ ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদন করিতে করিতে অবশেষে একেবারে সন্ন্যাসী হইলেন। কাঙ্গাল মানুষ! এই কাঙ্গালত্ব ধর্ম্মামৃতের ঘণীভূত মূর্ত্তিতে

কলিযুগে প্রকট হইয়াছেন, ইনি যাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা তাঁহারা যথার্থ পথই পাইয়াছেন। কারণ তাঁহাদের আর অন্য কামনা নাই ; সুবর্ণ যেমন অনলদাহে নির্ম্মল হয় ধর্ম্মও তদ্রূপ যুগ যুগাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কলিতে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বিবর্জ্জিত নির্ম্মল কান্তি লাভ করিয়াছেন। ইহারই নাম শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম। শ্রীগৌরচন্দ্র ইহার প্রাণ দেবতা, স্বর্ণ দেবতা, মধুর দেবতা। রাধা-প্রেম-সিন্ধুর সোণালী রস সলিলে ডুব দিয়া আজ শ্যামসুন্দর গৌরসুন্দর হইয়া নদীয়ার কূলে উঠিলেন। তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"জানি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে সে গৌর হ'য়েছে॥"

শ্যাম রাধা ভাবের গড়ন পাইয়া আত্মহারা এবং কেবল "কানু কানু" করিয়া পাগল। জগজ্জীবের কপালে চাঁদ উঠিয়া যুগলরসের এই কেলি দর্শন করাইতে লাগিল। প্রেম ঋণের কৌতুক প্রসঙ্গে স্বয়ং প্রভু এক তনু হইয়া কলির জীবের, কেবল জীবের কেন সমস্ত জগতের সৌভাগ্য অঙ্কিত করিল।

ক্রমশঃ

অমৃত-প্রসাদ। *

(লেখক—শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে।)

——:০:——

রসিক। আপনি নিজ জীবনে মায়ের করুণার কি পরিচয় পাইতেছেন ?

পাগল। সাধক রাম প্রসাদের গীতগুলি আলোচনা করুন্ তবেই বুঝিতে পারিবেন,—

"মা আমি এত দোষী কিসে ?

প্রতিদিন হায় দিন যাওয়া ভার, সারা দিন মা কাঁদি ব'সে।"

"করুণাময়ী কে বলে তোরে দয়াময়ী।

---

* প্রবন্ধ সম্বন্ধে সকল স্থানে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারি নাই। মতামতের জন্য লেখক দায়ী। ভঃ সঃ—)

কারো দুগ্ধেতে বাতাসা মাগো,—
আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মিলে কই ?"
"অন্নপূর্ণা মা থাকিতে মোর ভাগ্যে একাদশী।"—ইত্যাদি।

ইহাই মায়ের করুণা। ভক্তের প্রতি ইহাই দয়া! ইহাই ভক্ত-বাৎসল্য আনন্দ কৌতুক; ইহাই দয়াময়ীর দয়া—প্রেম দান্। মা, ভক্তকে ঐশ্বর্য্য না দিয়া প্রেমদানে এইরূপ দুঃখে নিত্য অমর, করেন। ঐশ্বর্য্য দান, মায়া-বিড়ম্বন; মা, ভক্তকে ঐশ্বর্য্য দেন না, ভক্ত ও, ঐশ্বর্য্য কামনা করেন না।

বিড়ম্বনা পূর্ণ সংসারে নানা শত্রু হইতে মা, সতত ভক্তকে রক্ষা করেন; সমুদায় পৃথিবী শত্রু হইলেও, ভক্তের কোন অনিষ্ট হয় না, বরং ইষ্টই হয়।

"মন, কর'না সুখের আশা, যদি অভয় পদে লবে বাসা॥"

আমি সংসার যন্ত্রণায় যত দুঃখ পাই, ততই আমার আনন্দ বৃদ্ধি হয়।

"দেখ সুখ ল'য়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই।"

এ দুঃখ নয়, প্রাণারাম সুখ; এ নিষ্ঠুরতা নহে, মায়ের বিশেষ কৃপা।

রসিক। আপনার মতে "গুপ্ত" বিষয়টী কি ?

পাগল। "এই গুপ্ত ভাব সিন্ধু, ব্রহ্মা না পান্ এক বিন্দু"—

বাক্য মনের অগোচর নিত্য লীলা, মায়াতীত হইলেই দেখিবেন, শব্দের অগোচর উহা কি প্রকারে লিখিব ?

রসিক। এ অধমের সহিত পত্র ব্যবহারে আপনার মূল্যবান্ সময় নষ্ট হয় না কি ?

পাগল। না, পরোপকার কর্ত্তব্য বোধে এবং দুঃখিত লোকের দুঃখ নাশের জন্য আমি অযাচিত ভাবে বহু পত্র দিয়াছি; ইহাও কর্ত্তব্যের মধ্যে একটী।

রসিক। চণ্ডিদাস লিখিয়াছেন—

"পীরিতি দেখিয়া, পড়্সী করিব, তা বিনু সকলি পর"—

পীরিতির চক্ষে কেহ 'পর" থাকে কি ?

পাগল। পীরিতির চক্ষে সমস্ত জগতই কৃষ্ণময় হইয়া থাকে "পর" আর থাকেনা কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ করিলে ঐ পীরিতি লাভ ঘটে।

রসিক। আপনি নিজের আশ্রমটীকে গম্ভীরার সহিত তুলনা করিতেছেন, ইহা কি অপরাধ জনক নহে ? মহাপ্রভুর লীলার অনুকরণ কি জীবের সাধ্য ?

পাগল। সমুদায় জীবের আশ্রয়ই গম্ভীরার অনুকূল হইতে পারে। নব দ্বার যুক্ত মনুষ্য দেহও ভগবানের একটী লীলা নিকেতন।

"দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তি রস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥"—

"লীলা শুক মর্ত্ত্য জনে, তার হয় ভাবোদ্গমে।"

রসিক। আজ কাল দেখিতে পাই, পরমাক্ষরী গায়ত্রী প্রণব মন্ত্র, যথা তথা বিজ্ঞাপনের উপরি ভাগেও প্রকাশিত হইতেছে; ইহা কিরূপ?

পাগল। এ সকল কেবল অকল্যাণ কর; যাঁহারা বিজ্ঞাপনের উপরিভাগেও ঐরূপ প্রণব মন্ত্র প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা অপরাধী হইতেছেন। এই মহা মন্ত্র আর্য্য শাস্ত্রে অতি গুহ্য মন্ত্র; উহা শিব ব্রহ্মার হৃদয়ের ধন; তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক স্থির মনে অন্তরে ধ্যান করিতে হয়; স্ত্রী, শূদ্রাদির ঐ মন্ত্রে অধিকার নাই, মর্য্যাদা লঙ্ঘনে ধর্ম্মের যথেচ্ছাচার ঘটে।

রসিক। গৃহী কি সন্ন্যাসী গুরু করিতে পারে না?

পাগল। না, কলি কালেতে সন্ন্যাসই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

রসিক। কাঙ্গালের ঠাকুর প্রভু কি, শুধু কাঙ্গালেরই ঠাকুর? বড় লোকের কেহ নহেন?

পাগল। বড় লোক, "অহং" ভাব ছাড়িয়া শরণ লইলে, প্রভু আমার, তাঁহারও অন্তরঙ্গ; রাজা প্রতাপ রুদ্র রাজাসনে থাকিয়াও প্রভুকে পাইয়াছেন। ধন মদে অন্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে পায় না, দ্বারে অতিথি হইয়া আসিলেও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে;—

"পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান্।
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্॥

রসিক। আপনি আমাকে এত তিরস্কার করিয়া ব্যথা দিলেন কেন?

পাগল। এ তিরস্কার নহে, পুরস্কার; দণ্ড নহে, শিক্ষা দ্বারা ধন্য করা,

রসিক। অধুনা যে সকল সুন্দর সুন্দর নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা কি নব যুগের সূচনা?

পাগল। না, এ সকল গ্রন্থ দ্বারা মহাপ্রভুর শক্তি আচ্ছন্ন করা হইতেছে। নব যুগের আবির্ভাব করিতে হইলে, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত

প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গীত গোবিন্দ, বিদগ্ধ মাধব উজ্জ্বল নীলমণি, প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ গুলি, ঠিক্ গ্রন্থকার গণের ও তৎসম ভাবাপন্ন টীকাকারগণের ব্যাখ্যার অনুযায়ী প্রকাশ করিতে হইবে, ইহাতে অপরের টীপ্পনী চলিবেনা। এই সমুদায় ভাব রাজ্যের কথা, এই সমুদায় গ্রন্থে মহাজন গণ গ্রন্থরূপী হইয়া বিরাজমান আছেন, এই সকল গ্রন্থের নিত্য পাঠ ও পূজা করিলেই মহাপ্রভু প্রসন্ন হইবেন ; সকলে নিজ নিজ কপোলকল্পিত মত ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত না হইলে, কেহ কোন প্রকারে নিরপরাধ নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিতে পারিবেন না। সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেই বিনা উদ্যোগে মহা সংকীর্ত্তনের তুমুল তরঙ্গ উত্থিত হইবে এবং তখন দেখিতে পাইবেন আবার নূতন যুগের আবির্ভাব। বর্ত্তমান যুগে বিপরীত ভাব দেখিতেছি ; আত্ম সমর্পণ হইল না, প্রচারের ধুমটা বেশী ; ইহা, নাম প্রেম প্রচারের সুলক্ষণ নহে ; আত্ম প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ইহা ত্যাগ না করিলে প্রকৃত পথে যাওয়া কঠিন।

শ্রীখুন্তির আত্ম-কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

কি হল ? বিদ্যানিধি "পুণ্ডরীকের জন্য শ্রীপ্রভু বড়ই বিলাপ, হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। ইনি হচ্ছেন এক জন চট্টগ্রাম বাসী প্রভুর প্রধান ভক্ত। লীলাময়ের লীলা কিরূপে বুঝা যাবে ! এক দিন কোথায়ও কিছু নাই হটাৎ—

"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখিব আরেরে বাপরে"—

ব'লে উচ্চস্বরে ক্রন্দন সুরু কর্‌লেন। সমস্ত ভক্তগণ অবাক এবং ব্যাপার ঠিক না বুঝ্‌লেও, এটা বুঝ্‌লেন যে ইনি "কোন প্রিয় ভক্ত।" ক্রমে প্রকাশ পাইল যে, তিনি একজন প্রভুর প্রিয় হইতেও প্রিয়তম ভক্ত। যে হেতু করুণাময় একেবারে অধীর ভাবে বলেন -

"তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বাস্থ নাহি পাই।
সত্বে তাঁরে আকর্ষিয়া আনহ হেথাই।"

প্রভুর আকর্ষণ, প্রভুর ইচ্ছা কোনটাই কি অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে? বিদ্যানিধি শ্রীনবদ্বীপ ধামে, আসিলেন। নানান ব্যাপার হ'যে শেষে সমস্ত ভক্ত গণের মধ্যে এই প্রচার ঠিকই হ'ল এবং শেষে—

বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌর সুন্দর
প্রেমজলে সিঞ্চিলেন তাঁর কলেবর।'

শ্রীনবদ্বীপ ধামে, এইরূপে আর একটী মহাভক্তের আগমন সম্পূর্ণ হইল। শুনা কথা বাপু; আমার সমস্ত ঠিক মনে নাই। কা'র পর কি, কোন্ তারিখে, কখন, এ সব জানিনা।

হ্যা কি বলছ? ভক্তি জিনিষটা কি, এবং ভক্ত কাহাকে বলে; এই কথা আমাকে বলতে হবে? বাপু হে! অত জানিনা, তবে বৃদ্ধ হয়েছি, অনেক কথাই শুনেছি কিছু কিছু মনেও আছে হয়তো তোমাদের খাপ্ ছাড়া লাগ্‌বে, তা, কি কর্‌বো? যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, বলি—ব্যাকরণ ব'লে একটা কি যেন শাস্ত্র আছে না? তা'তে বলেছে "ভজ্ সেবায়াম্।" লক্ষণ প্রকাশক শাস্ত্রে বলেছে—"হৃষীকেশ সেবনং ভক্তি" আর কেউ বলেছেন"—ঈশ্বর প্র ণিধানাদ্বা।—তা "বা"ই হোক্ আর "তোমাই" হোক। মোট কথা—

"অনুকূল ভাবে অন্য অভিলাষ ত্যাগ করিয়া এবং জ্ঞান, কর্ম্ম যোগ আদি শূন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই ভক্তি" এবং এই অনুশীলনের সাধন নয়টীর মধ্যে যিনি একটীও আচরণ করেন তিনিই ভক্ত।

ব্যাপার টা বুঝালো, বা আমার দ্বারা সে চেষ্টাটা 'যে নিতান্ত সঠিক নহে তাহা বুঝ্‌তে পারিলেও মোট কথায় ২।৪ টা কথা না ব'লে কি ক'রে বৃদ্ধ বয়সে থেমে রই!! সে ৯ কথা কৃষ্ণ কথা শোনা, কৃষ্ণগুণ গান করা, কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করা, মূর্ত্তি দর্শন করা, প্রণাম করা, তাঁহাকে স্মরণ করা। থাক্ এইরূপ ভাবে তা র পর কি হ'ল জান?—

বেশ আনন্দে দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো! শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত চার্য্য, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীগদাধর, বিদ্যানিধি ঠাকুর, প্রভৃতি সকলে মিলে মহা নৃত্য গীত, এবং কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে সর্ব্বদাই সকলে যেন

প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। দিন যায়। এক দিন শ্রীপ্রভু কথা প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরকে বলিলেন "ওহে! এই অবধূত মহাত্মাকে তুমি গৃহে রাখিয়াছ কেন বলতো? কোন জাত, কোথায় ঘর, কিরূপ আচার কিছুই জান না, আর এ'কে এরূপ ভাবে একেবারে গৃহে স্থান দাও!! তুমি নিতান্ত সরল, সেই জন্য তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি।" এই কথা শুনে পণ্ডিত আচার্য্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"আমারে পরীক্ষা প্রভু! না হয় উচিত।"

দিনেক যে তোমা ভজে সেই মোর প্রাণ
নিত্যানন্দ তোর দেহ আমাতে প্রমাণ॥

দয়াময়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা শেষ হইল। বলিলেন—

"——————পণ্ডিত শ্রীবাস!
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস!"

বড় প্রসন্ন হ'য়ে বড় আনন্দে, বড় আহ্লাদে প্রভু বলিলেন—

'যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে॥"
বিড়াল কুক্কুর আদি তোমার বাড়ির
সভার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির।"

একি কম্ বিশ্বাসের ব্যাপার? একি কম্ দয়ার দান?

ওহে! নব্য ভব্যেরা! তোমরা মহা আস্ফালনে হয়ত হাত পা নেড়ে মুখ খানাকে বঙ্গীয় অঙ্কের পঞ্চম সদৃশ ক'রে মাত্র বলতে পার—"Character requires the exercise of many supreme qualities, such as truthfulness, chasteness, mercifulness, and with these integrity, courage, virtue". ইত্যাদি আরও কত কি— কিন্তু বাপু! ভাবতে পার কি? সেকেলে সেই আচার্য্যের—

"জাতি প্রাণ, ধন, যদি মোর নাশ ক'রে"
তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা —

এই কথার ভিতর কি, কি রহিয়াছে? ধারণা করতে পার কি? স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যাঁর এইরূপ বিশ্বাসে আনন্দে হুঙ্কার দিয়া

বুকে ॰, ॰ ও ছুটেন সে বিশ্বাসের উপাদানে তোমাদের কেবল মাত্র ওই— "requires the exercise" ছাড়া আর কোন্ কোন্ বস্তু ছিল? যদি চাও তা হ'লে তোমাদেরি কথায় বলিতেছি হয় ত বুঝলেও বুঝতে পাব্‌বে— সেটা কি বস্তু—

"Though weary love is not tired, though pressed it is not confounded, but as a lively flame it forces its way up words." —

তোমারা যেটাকে "exercise" বল্‌বে সেটাতে "আমার-আমার" খুঁজে বার করার ভাব আছে কিন্তু "for in whatever instance a person se'keth himself there he falleth from love."—কাজেই এ কথার সামঞ্জস্য রক্ষা কর্‌তে গেলেই বল্‌তে হবে বাপু তোমাদের আস্ফালন রেখে দাও। যাও ছুটে গিয়ে আমার শ্রীপ্রভুর দেখান পথের পথিক হ'য়ে বলতে শিক্ষা কর ওগো।

ও পদ করেছি সার
ধন, জন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার।
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
(যেন) কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটী হয় শত কোটী
সকলি করিবে ক্ষমা॥"

যদি এ শিক্ষার পথে কিছু মাত্র 'হামাগুড়ি দিয়া, চলি-চলি পা-পা ভাবে যেতে পা'র তখন বুঝবে প্রেম—কি এক.-মহা আকর্ষণী শক্তি। বলা কথা বল্‌তে বৃদ্ধের চির অভ্যাস। একই কথা হয়ত দ্বিপঞ্চাশ বার বল্‌বে। আমিও সে অভ্যাসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। কাজেই যখন কথা পড়লো দুই চারিটা বলা কথা বলি।

এই যে "প্রেম" জিনিষটা বড় রসের কথা। এ রসের প্রধান কাণ্ড আমার শ্রীপ্রভু যা' করেছেন তা' ক্রমেই বুঝ্‌তে পারা যাবে, উপস্থিত মাঝ থেকে একটা কথা বলি—এক দিন আমার শ্রীপ্রভু রায় রামানন্দ মহাশয়ের সহিত

একান্ত গোপনে কথা কহিতে ছিলেন ক্রমে প্রসঙ্গের ক্রমানুসারে প্রভু বল্লেন—"এহো হয় আগে কহ আর"—

রায় মহাশয় বিপদে পড়লেন আর কি! কি করেন, মনে মনে প্রভুকেই স্মরণ করে প্রভুর সামনে বল্লেন—

যন্নাম শ্রুতি মাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থ পদঃ কিম্বা দাসা নামাবশিষ্যতে॥"

এটা হ'ল প্রেম রাজ্যের প্রথম দরজা দাস্য ভাব। এই দরজা পার হ'য়ে গেলে তার পর সখ্য ভাবের কবাট পাওয়া যায়; তাহাকে অতিক্রম করে বাৎসল্য ভাবের 'আগোড় ঠেলে শেষে কান্তাভাব রাজ্যে হাজীর হ'তে হয়।

বাপু হে! এসবের কাছে তোমার ঐ exercise খাটে না, এতে একটু আর কিছু বস্তুর আবশ্যক।

অত চালাকি ক'রনা। তোমাদের আজ কালের প্রধান পাণ্ডা কি বলেছেন সেইটাই ভেবে দেখো না। তিনি বলেন—

'যদি পর জন্মে পাইরে হ'তে ব্রজের রাখাল বালক।
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক॥"

আরও বলেছেন—

"আমি হবনা তাই, নব বঙ্গে নব যুগের চালক।
আমি জ্বালবনা আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক॥
যদি ননী ছানার গাঁয়ে কোথাও অশোক নীপের ছায়ে,
আমি কোন জন্মে হ'তে পারি ব্রজের রাখাল বালক॥

বুঝলে প্রাণের আশাটা?

ইনি প্রেম কাণ্ডের কেবল প্রথম দরজা দাস্য পার হ'য়ে সখ্য অবধি বড় জোর ধারণা করিবার ক্ষমতা রাখেন। বাপু হে তার—পর তারপর যে যে বস্তু আছে তা তিনি প্রাণে এনেছেন কি না জানিনা। কারণ আমার মবৃচে পড়া খুড়ির মোটা বুদ্ধি কি না! কি বলছিলাম?—তা' আজ আর বল্‌বো না। বড় হাঁপ লেগেছে একটু জীরুই—

ক্রমশঃ—

আনন্দ নগর।

(লেখক—শ্রীযুত কেদার নাথ দত্ত উকীল।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

ভবনগরস্থ স্বার্থরাজের প্রজাগণের হৃদয়ের অন্তস্তলের বেদনা ভূতভাবন বিশ্বপতি ভগবান্ নারায়ণ চন্দ্র বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভবনগরের জনগণ কেবল স্বার্থরাজের আদেশ এতকাল পালন করিয়া আসিয়াছেন। ভগবানকে সম্পূর্ণ ভুলিয়াছেন তাঁহার মঙ্গলময় নাম ক্ষণকালের জন্যও গ্রহণ করেন নাই। যিনি পরম মঙ্গলময়, দয়ার সাগর তাঁহাকে স্মরণ রাখা জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহাকে স্মরণ রাখিলে জীব আপন শুভকর গন্তব্য পথ হইতে কদাপি ভ্রষ্ট হন না। কিন্তু জীব তাঁহার আদেশ পালন না করিলে যখন তাহার ক্লেশ দুঃখ উপস্থিত হয় তখন সেই পরম দয়াল মঙ্গলময় বিধাতা জীবের প্রতি আপনার অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে কিছু মাত্র ত্রুটী করেন না। তাঁহার ক্ষোভ নাই তাহার ক্রোধ নাই। তিনি জীবের প্রতি কৃপা করিবার জন্য সদাই প্রস্তুত কিন্তু মোহান্ধ জীব না বুঝিয়া অজ্ঞান বশতঃ তাঁহার কৃপালাভের চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। তিনি জীবকে বুদ্ধি বিবেচনা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্গুণে বিভূষিত করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার প্রতি মনুষ্যের দৃষ্টি থাকে এবং দৃষ্টি থাকিলে তাহার মঙ্গল হইবে পরমারাধ্য সাধুগণের দ্বারা তিনি নানা উপায়ে তাহা বুঝাইতেছেন। মনুষ্য তাঁহার সেই প্রবোধ বাক্য সকল মনোমধ্যে বিচার না করিয়া ক্ষণিক সুখের ইচ্ছায় অকিঞ্চিৎকর পদার্থের জন্য প্রয়াসী। মনুষ্যের এই অর্ব্বাচীনতা ভগবান বিলক্ষণ বুঝেন। ভবনগরবাসী জনগণ তাঁহার আদেশ পালন না করায় বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন, ভগবান্ তাহাদের সেই বিপদ উদ্ধার জন্য ইচ্ছা করিলেন।

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইবামাত্র দেবনগর ও ভবনগর বাসী জনগণের হৃদয়ে যেরূপ ভাবের সঞ্চার,, যেরূপ কা( ) ব্যাকুলতা আবশ্যক তাহা ক্রমে পরিলক্ষিত

হইতে লাগিল। অতি পবিত্র দেবনগর নিবাসী জনগণ দীর্ঘকাল ভগবানের প্রসাদ উপভোগ করিতে পারিয়াছেন। বিশুদ্ধ আনন্দ লাভে তাঁহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ। তাঁহারা এই নির্ম্মল আনন্দ অন্যস্থানের কোন লোককে দিতে পারেন নাই। এই নগরবাসী যাবতীয় ব্যক্তিগণের চিত্তে আজ অবসাদের কালিমা প্রকাশিত হইল। তাঁহারা এতদিন যে বিমল আনন্দ সুধা পান করিতেছিলেন তাহা পূর্ণ মাত্রায় উপভুক্ত হয় নাই, আনন্দ অপরকে পান করাইতে না পারিলে আনন্দ পানের পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্পাদিত হইতেছে না এই ধারণা দেব-নগর নিবাসী সাধারণ জনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত হইল। তখন তাঁহাদের হৃদয়ে দারুণ অনুতাপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ভবনগর তাঁহাদের নিকট সুতরাং ভবনগরের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হইল। ভবনগর নিবাসী জনগণের অবস্থা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনুসন্ধানে কতক কতক অবগত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই স্থানের অধিবাসীগণের মঙ্গল বিধান করা তাঁহা-দের প্রধান ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। তাঁহারা সকলে একত্র পরামর্শ করিয়া ইহাই স্থির করিলেন যে বণিকরাজ প্রদ্ধারত্ন আপন কতিপয় আত্মীয় মাত্র লইয়া সর্ব্বাগ্রে ভবনগরে যাত্রা করিবেন। তিনি বাণিজ্যের সুবিধা বিবেচনা করিলে ক্রমে দেবনগরবাসী অপরাপর সকলে ভবনগরে যাত্রা করিবেন এবং দুর্ল্লভ প্রেমধন বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া ভবনগর বাসী লোকগণকে সুখী করিবেন।

স্বার্থ রাজের প্রজাগণের চিত্ত ঘোর অশান্তি পরিপূর্ণ। তাঁহারা কি প্রকারে এই মহাক্লেশকরী অশান্তির কবল হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবেন সেই চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল। একদিন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে এমন সময়ে ভবনগর প্রান্ত হইতে অতি সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। যেরূপ সঙ্গীতে ভবনগর বাসীগণ গান করিয়া থাকেন তদপেক্ষা ঐ সঙ্গীত শতগুণ মধুর বলিয়া তাহাদের নিকট প্রতীয়মান হইল। ভবনগর নিবাসীগণ স্থির চিত্তে সেই সঙ্গীত সুধা পান করিতে লাগিলেন। তাহারা কিছু কাল এই সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে তাহাদের চিত্তের সেই ব্যাকুলতা অন্তর্হিত হইল। কিছুকাল পরে যেমন সঙ্গীত বন্ধ হইল তাহাদের চিত্তে ব্যাকুলতা পুনরায় দেখা দিল। তখন তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই সঙ্গীতের স্থান লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে তাহারা ধাবমান হইল।

তাঁহারা লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন এক প্রশান্ত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। তাঁহার মুখমণ্ডলে মধুর হাসির ছটা খেলা করিতেছে। নেত্রদ্বয় বিশাল ও সুদৃশ্য দেখিলেই বোধ হয় যেন সরলতা উহাতে নিরন্তর বিহার করিতেছে। অঙ্গ সৌষ্ঠব পরম প্রীতিকর। ইনি বয়সে প্রবীন। ইহার মস্তকের কেশ রাশি শুভ্রবর্ণ এবং তরঙ্গবৎ আন্দোলিত। ইহার সঙ্গে কতিপয় স্ত্রী পুরুষ আছেন তাঁহাদের সকলেরই রূপ লাবণ্য অলোক সামান্য। সকলেই সহাস্য বদন। বিনয় ও শিষ্টাচার ইহাদের ব্যবহার ও কার্য্যে সম্পূর্ণরূপ বিজড়িত। একটী মহান্ আনন্দের ভাব তাহাদের সকলেরই মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হইতেছে। ফলতঃ ইহাদের আকৃতি দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা হইল ইহারা দেবতা হইবেন। ভবনগর নিবাসী জনগণ ইহাদের নিকট সমুপস্থিত হইলে পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ হইল। তাঁহারা অনন্যমনা হইয়া সেই সুমধুর তাপিত প্রাণ শীতলকর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে সেই প্রবীন ব্যক্তি তাহাদিগকে অতি মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিলেন এবং তাঁহার সন্নিকটে আসন পরিগ্রহ করিবার জন্য অনুনয় করিলেন। তাঁহারা তাঁহার সন্নিকটে আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সকলের মন এই দেব সদৃশ মহোদয়গণের পরিচয় এবং ভবনগরে তাঁহাদের আগমনের কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইল। নাগরিকগণের মধ্যে অনৈক ব্যক্তি সেই প্রবীন ব্যক্তিকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন :—

নাগরিক। মহাত্মন্ আপনার নাম কি ?

প্রবীণ ব্যক্তি। আমার নাম শ্রদ্ধারত্ন।

না। আপনার সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের কাহার কি নাম ? উহাঁরা আপনার কে ? দয়া করিয়া পরিচয় দিলে কৃতার্থ হইব।

প্র। ইহাঁর নাম রতি আমার সহধর্ম্মিণী, ইহাঁর নাম প্রীতি সুন্দরী, ইনি আমার ভগিনী, ইহাঁর নাম ভাব সুন্দর, ইনি প্রীতি সুন্দরীর স্বামী।

না। আপনার নিবাস কোথায় ?

প্র। দেবনগর।

না। সে কোথায় ?

প্র। শ্রীভগবান নারায়ণ চন্দ্রের রাজ্য।

ক্রমশঃ।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতোনায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

তদ্দেহৌ ন শোকস্থানমিতি জীবাত্মনো দেহো ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তস্য ভোগায় মোক্ষায় চ পরেশেন সৃজ্যতে। স চ স চ ধর্ম্মেণ ভবেত্তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮॥

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

অপ্রমেয়েশ্বরস্বরূপত্বাৎ। নহ্যুপাধিবিম্বসান্নিধ্যনাশে প্রতিবিম্ব নাশঃ সতি চ প্রদর্শকে। স্বয়মেবাত্রপ্রদর্শকঃ। চিত্ত্বাৎ। নিত্যশ্চোপাধিঃ কশ্চিদস্তি। প্রতি পত্তৌবিমোক্ষস্য নিত্যোপাধ্যস্বরূপয়া, চিদ্রূপয়াযুতো জীবঃ কেশবপ্রতিবিম্বইতি ভগবদ্ বচনাৎ ॥১৮॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

স্বরূপ ভূত ও সাধন সিদ্ধ উভয় দেহই নিত্য। সুতরাং শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন হয় না বলিয়াই এখানে জীবকে শরীরী বিশেষণ দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব অতি সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন এবং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতৃত্ব নিবন্ধন সহসা যিনি প্রমাণের বিষয় হয়েন্ না, এবম্প্রকার স্বভাব সম্পন্ন জীব বা তাহার দেহ শোকের বিষয় হইতে পারেনা। বিশেষতঃ জীবের উক্ত দেহ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্ত পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃজিত হইয়া থাকে। দর্পণ নাশে প্রতিবিম্ব নাশের ন্যায় দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ বলিতে পারনা ? কারণ প্রতিবিম্ব নষ্ট হইলেও বিম্বভূত বস্তু পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান থাকে। যেহেতু চিৎস্বরূপ এবং উহা শ্রীভগবানের নিত্য উপাধিভূত। তদীয় উক্তি হইতেই দেখ যথা "নিত্য উপাধি স্বরূপ চিদ্রূপযুত জীব ভগবানের এক বিভূতি।" গীতার অন্যত্র ও জীবকে "সনাতন" শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব হে ভরতবংশাবতংস! দেহের নিমিত্ত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার স্বকীয় যুদ্ধরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥১৮॥

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

উক্তমবিনাশিত্বং দ্রঢ়যতি এনমুক্তস্বভাবমাত্মানং জীবং যো হন্তারং খড়্গাদিনা হিংসকং বেত্তি যশ্চৈনং তেন হতং হিংসিতং মন্যতে তাবুভৌ তৎস্বরূপং ন বিজানীতঃ। অতিসূক্ষ্মস্য চৈতন্যস্য তস্য ছেদাদ্যসম্ভবান্নায়মাত্মা।

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

ব্যবহারস্ত নাম ইত্যাহ। য এনমিতি। কুতঃ? উক্তহেতুভ্যো নায়ং হন্তি ন হন্যতে, নহি প্রতিবিম্বস্য ক্রিয়া, সতিবিম্বক্রিয়য়ৈব ক্রিয়াবান। ধ্যায়তীবেতি-শ্রুতেশ্চ ॥১৯॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

শ্রীভগবান আত্মার অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে মোহান্ধ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ করিলেন, তাহাতেও মোহের সম্পূর্ণ অপনোদন না হওয়ায়, আত্মার অবিনশ্বরত্বের দৃঢ় প্রতিপাদন মানসে বলিতেছেন, যে ব্যক্তি উক্ত অবিনশ্বর আত্মাকে হনন কর্ত্তা বলিয়া জানে, অথবা যে ব্যক্তি উক্ত জীবকে তৎকর্ত্তৃক হত হইল, বলিয়া বিবেচনা করে, উহাদের উভয়েই অজ্ঞ, কারণ তাহারা জীবের স্বরূপ অবগত নহে

অতি সূক্ষ্ম চেতন স্বভাব জীবের ছেদন সম্ভব হয় না। যাহার ছেদন সম্ভাবনাই নাই, এমন জীবাত্মা হনন কর্ত্তাও নহে এবং হতও হয় না; সুতরাং হন ধাতুর কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব এতদুভয়ের কোনটীই জীবে সম্ভাবিত হইতে পারে না। আমরা যাহাকে হত্যা বলিয়া থাকি উহা দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধের বিয়োজন মাত্র; আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ বিযুক্ত হইলে আত্মা বিনষ্ট হইল মনে করা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা।

"হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুং" ইত্যাদি শ্রুতিও আত্মার হনন কর্ত্তৃত্বাদি নিবারণ করিয়াছেন। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে,—আত্মা যদি হতই না হয়, তাহা হইলে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি হিংসা হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ করিলেন কেন? তাহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ, উহা কেবল আত্মার হনন নহে, "হিংসা" শব্দের অর্থ পরিদৃশ্যমান স্থূল দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধের

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

হন্তি ন হন্যতে হন্তেঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীত্যর্থঃ। হন্তে র্দেহবিয়োগার্থত্বান্ন তেনাত্মনাং নাশো মন্তব্যঃ। শ্রুতিশ্চৈব মাহ "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হত শ্চেন্মন্যতে হত মিত্যাদিনা। এতেন মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানীত্যাদি বাক্যং দেহ বিয়োগ পরং ব্যাখ্যাতং। ন চাত্রাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি বাচ্যং দেহাজবিধয়োজনে তত্তস্য সত্বাৎ ॥১৯॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

বিচ্ছেদ করা। তুমি আজ তোমার বহু কালার্জ্জিত সুকৃতি বলে যে মানব দেহ লাভ করিয়াছ। সেই অভিমানে বশীভূত হইয়া অপরের দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ভেদে উদ্যত কেন হও, তুমি যখন শত চেষ্টা করিলেও একটী আত্মাকে অভিলষিত দেহের সহিত যোজিত করিতে পার না, তখন তোমার তদ্বিপরীত প্রয়াশ সম্পূর্ণই অন্যায়। আরো এইরূপ পরদ্বেষ হিংসাদি দ্বারা আত্মার সদ্বৃত্তি তিরোহিত হইয়া আত্মা অসৎ বাসনায় কলুষিত হইবে এবং আত্মার মুক্তি পথে ব্যাঘাত সাধিত হইবে বলিয়াই, পরম কারুণিক ভগবান নিজ শ্রুতি বাক্যে তারস্বরে জীবকে হিংসাদি হইতে বিরত হইবার উপদেশ প্রদানে সর্ব্বদা সাধনোপযোগী নৈষ্মল্য সম্পাদনে প্রয়াশ পাইতেছেন।

এখানে আত্মার কোন কর্ত্তৃত্ব আছে তাহাও বলিতে পার না, যদি আত্মার দেহ গ্রহণে কর্ত্তৃত্ব থাকিত তাহা হইলে, দেহের অপারত্যাগেও আত্মার কর্ত্তৃত্ব আপতিত হইয়া পড়িত। কিন্তু লোকে তাহা দেখা যায় না, দেহ জীর্ণ হইয়াছে তথাপি জীবিতাশা বলবতী, অথচ আত্মা দেহ ত্যাগ করিতেছে সুতরাং তাহার কর্ম্মার্জ্জিত কাল পর্য্যন্ত থাকিয়া, কর্ম্ম-বশীভূত জীবকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেহ ত্যাগ করিতে হইতেছে তখন এ বিষয়ে আত্মার কর্ত্তৃত্ব আছে এ কথা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারেনা।

এখানে ভগবান তদুপদিষ্ট উপদেশের প্রাচীনত্ব প্রকটণ মানসে, পূর্ব্বো পদিষ্ট শ্রুতি বাক্যের অনুরূপ শ্লোকের দ্বারা জীবের স্বাভাবস্থার শিক্ষা প্রদান করিলেন ॥২০॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

অথ জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে অপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি যাস্কাদ্যুক্ত ষড়্‌ভাববিকাররাহিত্যেন প্রাগুক্ত নিত্যত্বং দ্রঢয়তি ন জায়তে ইতি। চার্থে বা শব্দঃ। অয়মাত্মাজীবঃ কদাচিদপি কালে ন জায়তে ম্রিয়তে চেতি জন্মবিনাশয়োঃ প্রতিষেধঃ। ন চায়মাত্মা ভূত্বোৎপদ্য ভবিষ্যতীতি জন্মান্তরসত্যাস্তিত্বনয়

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

অত্র মন্ত্রবর্ণোঽপ্যস্তীত্যাহ ;—ন জায়ত ইতি। নচেশ্বর জ্ঞানবদ্ভূত্বাভবিতা। তদ্বিতবৈদেকত। দেশতঃ কালতোযোসাববস্থাতঃ স্বতোন্যতঃ।

তাৎপর্য্যানুবাদ।

মহামতি যাস্ক দেহের সম্বন্ধে, উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয়, ও নাশ এই ষড়্‌ বিকারের কথা বলিয়াছেন।

শ্রীভগবান অর্জ্জুনের অজ্ঞানাপনোদন মানসে আত্মার নিত্যতা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, দেহোক্ত বিকার যে আত্মায় নাই তাহাই দেখাইতেছেন,—

এই জীব বা আত্মা কোন কালে জন্মান না, বা কোন কালে মরেণ না, সুতরাং উঁহার জন্ম বা মৃত্যু নাই। আত্মার যখন "উৎপত্তি" নাই, তখন আর "হইবেন্" ইহা বলা যায় না, কারণ যাহার জন্মই নাই, তখন তাহার আর জন্মান্তরের সম্ভাবনা হইতে পারে না। এই আত্মা যখন অধিক রূপে হন না, তখন আত্মার বৃদ্ধি নাই, ইহা স্থির। যদি বল আত্মার উৎপত্ত্যাদি নাই কেন? তজ্জন্য বিশেষণ দিয়াছেন "অজ ও নিত্য।"—বৃক্ষাদি বস্তু যেমন উৎপন্ন হইয়া

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

প্রতিষেধঃ। ন ভূয়ইতি অয়মাত্মা ভূয়োঽধিকং যথা স্যাত্তথা ন ভবতীতি বৃদ্ধেঃ প্রতিষেধঃ। কুতোভূয়ো ন ভবতীত্যত্র হেতুরজো নিত্য ইতি। উৎপত্তি-বিনাশযোগী খলুবৃক্ষাদিরুৎপদ্য বৃদ্ধিং গচ্ছন্নষ্টঃ। আত্মনস্ত তদুভয়াভাবাৎ ন

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

অবিলুপ্তাববোধাদ্ধেত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি সিদ্ধং। কুতঃ অজাদিলক্ষণেশ্বর-স্বরূপত্বাৎ। শাশ্বতঃ সদৈকরূপঃ। পুরংদেহমণতি—ইতি পুরাণঃ। তথাপি ন হন্যতে হন্যমানেঽপিদেহে॥২০॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, এবং কালে বিনষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা তদ্রূপ উৎপত্তি-শীল পদার্থ নহে, যাহার উৎপত্তি নাই তাহার বর্দ্ধন স্বতঃই নিরস্ত হইতেছে। যাহা চিরকাল সমাবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাহাকেই শাশ্বত বলা হয়। আত্মার শাশ্বত বিশেষণ দ্বারা আত্মা যে ক্ষয় শূন্য তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে অবস্থিত হইয়াও যাহা নব তাহাকে পুরাণ বলা হয়; আত্মার পুরাণ বিশেষণ দ্বারা, আত্মা যে বর্ত্তমান সময়ে কিছু নূতনত্বকে বা রূপান্তরকে প্রাপ্ত হয়েন্ নাই তাহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং ঈদৃশ ষড়্ভাব বিকার পরিশূন্য আত্মা নিত্য, ভোগায়তন স্থূলদেহ বা ভোগ সাধন সূক্ষ্মদেহের বিনাশে, উক্ত আত্মার বিনাশ সাধিত হয় না ইহা বলাই বাহুল্য।

জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে পঞ্চদশীকার বলেন:—

"সা কারণ শরীরংস্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্।"

ঐ টীকা যথা;—

"সা কারণ শরীরং স্যাদিত্যাদিনা সা অবিদ্যা কারণ শরীরং স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাদি কারণীভূতং প্রকৃত্যবস্থা বিশেষত্বাৎ কারণমুপচারাৎ। শীর্য্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্যতি চেতি শরীরং—"ইত্যাদি।

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

বৃদ্ধিরিত্যর্থঃ। শাশ্বত ইত্যপক্ষয়স্য প্রতিষেধঃ। শশ্বৎ সর্ব্বদা ভবতি নাপক্ষীয়তে নাপক্ষয়ং ভজতীত্যর্থঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামস্য প্রতিষেধঃ। পুরাণঃ পুরাপি নবো ন তু কিঞ্চিঃ নূতনং রূপান্তরমধুনা ন লব্ধ ইত্যর্থঃ। তদেবং

তাৎপর্য্যানুবাদ।

এখানে পঞ্চদশীকার অবিদ্যাকেও কারণ শরীর বলিয়াছেন, কারণ স্থূল সূক্ষ্ম উভয় দেহেরই মূল অবিদ্যা—অর্থাৎ প্রকৃতির অবস্থা বিশেষই কারণ রূপে উপচরিত হইয়া থাকে। অবিদ্যা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান তিরোহিত না হইলে শরীর উৎপন্ন হয় না, জীবের নিত্য দাসরূপ সম্বন্ধের তিরোধানেই কর্ম্মানুরূপ দেহ ধারণ হইয়া থাকে। অপঞ্চীকৃত ভূতের গুণতারতম্যে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। এখানে অবিদ্যাকে কারণ স্বীকার করিবার তাৎপর্য্য তদুপহিত আত্মাকে জীব, তৈজস বা প্রাজ্ঞ আখ্যায় অভিহিত করিলেও ঐ প্রাজ্ঞ বা জীবাত্মার ভোগের সাধন স্বরূপ লিঙ্গ শরীরের উৎপত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে যথা :—

"শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে।"

"প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।"

তৎপরে—"স্থাং পঞ্চীকৃতভূতোত্থো দেহ স্থূলোহন্নসংজ্ঞকঃ।"

এই কারিকা দ্বারা অন্নময় স্থূল শরীরের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, অর্থাৎ পঞ্চীকৃত ভূতের গুণ তারতম্যে স্থূল দেহেন্দ্রিয়াদিযোগে স্থূল শরীর সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এই স্থূল শরীর আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়, এবং ইহার সহিত আত্মার বিয়োগ সাধনে জীব "মৃত" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন মৃত্যু হইলেও পুনর্জ্জন্ম হইতেছে তখন গতায়াতের আয়তন-রূপ-কর্ম্মের অধিষ্ঠান ভূত সূক্ষ্মশরীর অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়াছে। সুতরাং জীবের ভোগের পক্ষে একটী শরীর সাধন, একটী শরীর ভোগায়তন হইতেছে।

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

ষড়্ভাববিকার শূন্যত্বাদাত্মা নিত্যঃ। যস্মাদীদৃশস্তস্মাচ্ছরীরে হন্যমানেঽপি স ন হন্যতে। তথাচার্জ্জুনোঽয়ং গুরুহত্যেত্যবিজ্ঞোক্ত্যা দুষ্কীর্ত্তেরনিভ্যতা ত্বয়া শাস্ত্রীয়ং ধর্ম্মযুদ্ধং বিধেয়মিতি ॥২০॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

কোন কোন ব্যক্তি এই কারিকার তাৎপর্য্যানবোধে জীবের স্থূল দেহ ধারণাবস্থায় সূক্ষ্ম দেহের স্বীকার করিতে চাহেন্ না, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ পঞ্চদশীকার যাহাকে কারণ বলিলেন তাহার কখন কার্য্যাবস্থায় নাশ হইতে পারে না, ইহা সকলকারই অনুভব সিদ্ধ। যেহেতু কার্য্য কারণ ভাব অন্বয় ব্যতিরেকে সর্ব্বদাই অবস্থিত। যতক্ষণ জীবের মুক্তি না হইতেছে, ততক্ষণ শরীর দ্বয়ই বিদ্যমান থাকিবে। "শীর্য্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্যতি" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা যাহা তত্ত্বজ্ঞানে বিনষ্ট হয় তাহা শরীর, যৎকালে স্থূল দেহ বিদ্যমান তখন যে তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, এবং তৎকালে যে উভয় শরীর অবশ্য থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য। এমন কি জীবন্মুক্তাবস্থাতেও শরীরদ্বয়ের অবস্থান স্বীকৃত হইতেছে। ঐ সময়ের পার্থক্য এই যে তৎকালে অবিদ্যা আর নব বাসনার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় না। তদিতর অবস্থায় অবিদ্যা উত্তরোত্তর বাসনা জাল সৃজন করিয়া জীবের বন্ধন আরো দৃঢ়তর করিতে থাকে। এই নিমিত্ত জীবন্মুক্তাবস্থাতেও অভ্যাস স্বীকার করিয়াছেন তৎকালে অপ্রারব্ধ অপর সকল প্রকার কর্ম্মের ক্ষয় হইলেও, কেবল মাত্র প্রারব্ধ কর্ম্ম (তাহার শেষের অপেক্ষায়) অবস্থিত থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে শরীর জড়ের কার্য্য মাত্র উহার সহিত চিদ্‌বস্তু আত্মার নিত্য সম্বন্ধের সংস্থাপন হইতে পারে না। হে অর্জ্জুন! তুমি অবিজ্ঞ উক্তির পরিহার পূর্ব্বক, গুরুহত্যাদি অযৌক্তিক দুষ্কীর্ত্তিভয়ে যে ভীত হইয়াছ ঐ ভয় পরিত্যাগ করিয়া, এই শাস্ত্রীয় অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম যুদ্ধে তোমার প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ঈদৃশ তত্ত্বজ্ঞানী যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বুদ্ধিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, বা যে কেহ তাহাকে প্রবর্ত্তিত করে ইহাদিগের উভয়ের কাহাতেও কোন দোষ স্পর্শ হইতে পারে না। ইহাই পরবর্ত্তিশ্লোকে দেখাইতেছেন ॥২০॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্।

এবং তত্ত্বজ্ঞানবান্ যো ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুদ্ধে প্রবর্ত্ততে যশ্চ প্রবর্ত্তয়তি তস্য তস্য চ কোঽপি ন দোষগন্ধ ইত্যাহ বেদেতি। এনং প্রকৃতমাত্মানমবিনাশিনমজম-ব্যয়মপক্ষয়শূন্যঞ্চ যো বেদ শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং জানাতি স পুরুষো যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি কং হন্তি কথং বা হন্তি। তত্র প্রবর্ত্তয়ন্নপি কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি। কিমা-ক্ষেপে ন কমপি ন কথমপীত্যর্থঃ। নিত্যমিতি বেদন ক্রিয়া বিশেষণং ॥২১॥

মাধ্ব-ভাষ্যম্।

অতো য এবং বেদ সকথং কং ঘাতয়তি হন্তিবা। অবিনাশিনং নৈমিত্তিক নাশরহিতং। নিত্যং স্বাভাবিক নাশরহিতং অথবা অবিনাশিনং দোষযোগ রহিতং। নিতং সদাভাবিনং। ইতি সর্ব্বত্রবিবেকঃ। দোষযুক্ত পুরুষাদিষু নষ্টশব্দপ্রয়োগাৎ ॥২১॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

এইরূপে যিনি শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা জীবাত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া জীবকে অজ, ও অব্যয় অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার অপক্ষয় শূন্য সুতরাং নিত্য বলিয়া অবগত হইয়াছেন, এবম্প্রকার জ্ঞানী পুরুষ যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াও কাহাকে হত্যা করে না বা কাহার দ্বারা হত হয় না, এবং উক্তরূপ হনন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করাইয়াও কাহাকে হত্যা করে না, বা উক্ত হনন কার্য্যের নিমিত্ত কোন প্রকার পাতিত্য ভোগ করে না। কারণ আত্মা অবিনাশী শব্দে অভিহিত হওয়ায়, উহার কি নৈমিত্তিক কি স্বাভাবিক সকল প্রকারের নাশ পরিশূন্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অথবা অবিনাশী শব্দে যদি দোষ রহিত অর্থ করা হয়, তাহা হইলেও যাহা নিত্য সর্ব্বদা সমভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই বুঝাইতেছে, যেহেতু লোক দৃষ্টিতে দেখা যায়, দোষ দুষ্ট পুরুষাদিতেই নষ্ট শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব অবিনাশী শব্দের যে অর্থই করা হউক, তাহার দ্বারা আত্মার যে বিনাশ নাই ইহা স্থির নিশ্চয় হইতেছে ॥২১॥

ভক্তি ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, চৈত্র মাস, ১৩২৪।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-জন্ম-গীতি।

(১)

ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যা, ত্রিজগতে কি আনন্দ
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ উদয়।
বৈবস্বত মনু ভোগে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে
ধন্য হইলা কলি সংশয়॥

চোদ্দশত সাত শকে, ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে।
যবে রাহু গরাসিল শশী।
শচী গর্ভ সিন্ধু হ'তে গৌর শশী সমুদিতে
নাশিলেন হৃদয়ের মসী॥

চারিদিকে হরি ধ্বনি, আর কিছু নাহি শুনি
নাম জন্ম দিয়া হৈলা জন্ম।
শ্রীঅদ্বৈত হরিদাস, আচম্বিতে হৈলা হাস
অন্যে কেহ না বুঝিল মর্ম্ম॥

ধন্যরে কলির জীব, হেলায় আপন শিব
কৃপা ক'রে আইলা দুয়ারে!
ওরে পিপাসিত হিয়া, নাচ দু'বাহু তুলিয়া
মিটিল পিপাসা একেবারে!

বল উচ্চে হরি বোল, প্রেমানন্দে তোল রোল
উঠুক সে ভেদিয়া গগন।
নাম কৃপা সমুদিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা দিয়া
ধন্য করুক মানব জনম॥

(২)

জগন্নাথ মিশ্র ঘরে, আনন্দ নাহিক ধরে
নারীগণে করে উলুধ্বনি।
শচীমা'র কি আনন্দ, নিরখি বদন চন্দ্র
কোটী শশী বুঝি একখানি॥
কি ধন পাইনু বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি
এড়িতে না পারে ক্ষণ তরে।
ভয় পাছে হারা হই, নিম্ব বৃক্ষতলে লই
কত মতে রক্ষা বন্ধ করে॥
আলো করিয়াছে ঘর, সর্ব্ব সুলক্ষণ ধর
কি অদ্ভুত অধরেতে হাস।
কি কর, চরণ পদ্ম, সকল শোভার সদ্ম
রকত উৎপল পরকাশ!
ত্রিজগত যার তরে, সদা হাহাকার করে
যোগী মুনি ধেয়ায় চরণ;
কতনা তপস্যা ফলে, কতনা সৌভাগ্য বলে
মিশ্র ঘরে উদয় সে ধন॥
আপনা পাসরে মিশ্র, খুলিয়া হৃদয় উৎস
যত ধন ছিল দান কৈল।
জয় জয় মহাধ্বনি, মিশ্রের মন্দিরে শুনি
নবদ্বীপে কোলাহল হৈল॥
লক্ষ লক্ষ নর নারী, বৈসে নবদ্বীপ পুরী
আসে সবে নানা দ্রব্য ল'য়ে।
ধান্য দূর্ব্বা শিরে ধরি, কত আশীর্ব্বাদ করি
ধন্য হয় শিশু মুখ চেয়ে।
দেব দেবী নর বেশে, শচীর মন্দিরে এসে
নিজ নাথে করিছে দর্শন।
আইলা গোলকপতি, সকল বিভব তথি
সর্ব্ব লোক তথায় মিলন॥

সমুদিল কি মঙ্গল, নব ভাগ্য সমুজ্জ্বল
দেব লোক করিছে বন্দন ।
ভব ভয় গেল দূর, প্রেমানন্দ কি মধুর
ভ'রে গেল মরত ভবন ॥
ধন্য নবদ্বীপবাসী, হেরিল সে মুখ শশী
করিল সে রূপ সুধাপান !
তাঁদের চরণ বন্দি, রাম কহে ভাগ্য নিন্দি
হায় জন্ম না হ'লো তখন ॥

পথের কাঙ্গাল ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ।)

১—এই যে আমি ।

—:০:—

সেদিন পথে বাহির হইয়াছি, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল; মাথা বাঁচাইবার জন্য পথের পাশে একখানি বাড়ীর রকের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই রকের কোণে ঘরটির জানালা বন্ধ, দরজাও বন্ধ। সুতরাং রকের উপর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ এই ভাবে দাঁড়াইয়া আছি; আকাশে মেঘ গর্জ্জন আরম্ভ হইল, ক্ষণপ্রভার উজ্জ্বল প্রভায় চক্ষু চমকিয়া উঠিল। এই ভাবে দুই একবার মেঘ গর্জ্জন হইবার পর এক শিশুর কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত ক্রন্দন ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বুঝিলাম, আমি যে গৃহ দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি, সেই গৃহের ভিতর হইতে এই ক্রন্দন ধ্বনি আসিতেছে। ইহার পর মুহুর্ত্তে শুনিলাম দয়াময়ী কোমলা জননী যেন অতি ব্যস্তভাবে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই শিশুকে অভয়দান পূর্ব্বক বলিতেছেন—"কেন বাবা! এই যে আমি।" তারপর, আর ক্রন্দন নাই, শিশুর সে আকুলি ব্যাকুলি নাই—সব স্থির।

জানিনা, জগতে কত শিক্ষার বিষয় আছে, জানিনা, ভগবান কাকে কখন কি ভাবে শিক্ষা দেন ; জানিনা, কে কোথায় গুরুরূপে কার জ্ঞান চক্ষু কি ভাবে খুলিয়া দেন। এই শিশুর ক্রন্দন আর মাতার এই শান্তি দান চিন্তা করিয়া তখন আমার মনে হইল আহা! ঐ শিশুর মত সরল ভাবে দৃঢ় বিশ্বাসে যদি মা বলিয়া দু'ফোঁটা চখের জল ফেলা যায়, তাহা হইলে জগজ্জননী কি স্থির থাকিতে পারেন? অভয়া তাঁহার অভয় কর প্রসারণ পূর্ব্বক আর্ত্তকে অভয় দেন ; বলেন "ভয় কি বাবা! এই যে আমি।"

সৃষ্ট জীবের মধ্যে দেহ তত্ত্ব আলোচনা করিলে, ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কেবল একমাত্র মানুষের মেরুদণ্ড সরল। কেবল মনুষ্যই সরল ভাবে সোজা হইয়া চলিতে পারে ; সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধ মুখে চাহিতে পারে। শিম্পাঞ্জি, গরিলা প্রভৃতি বনমানুষ কতক পরিমাণে মানুষের চলা-বসার অনুকরণ করে বটে, কিন্তু তাহাদেরও মেরুদণ্ড সরল নহে। একমাত্র মানুষের মেরুদণ্ড সরল, একমাত্র মানুষই সোজা ভাবে দাঁড়াইতে পারে।

এ সৃষ্টি রহস্যের কি কোন উদ্দেশ্য নাই। এ জগতে উদ্দেশ্য হীন কি কিছু থাকিতে পারে। ভগবান মানুষকে এত বুদ্ধি এত জ্ঞান এত শক্তি বিচার ক্ষমতা দান করিয়া তাহার দেহটি যে সরল করিয়া দিলেন ইহার কোন অর্থ নাই? আছে বৈ কি। মানুষ সরল ভাবে একবার দাঁড়াইয়া, ঐ শিশুর মত সরল অন্তঃকরণে উদ্ধবাহু হইয়া উর্দ্ধ মুখে শ্রীভগবানের জয়োচ্চারণ করুক। সে যে মানুষ সৃষ্টির চরম, তাহার পরিচয় দান করুক, স্রষ্টার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি করে গলদশ্রু নয়নে একবার বলুক—

"বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াম্,
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ-
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥

এই ভাবে সরল প্রার্থনায় হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠে, পলকে পলকে সে আনন্দের স্ফুরণ হয়। বিশ্বের যেদিকে তখন নিরীক্ষণ করা যায় তখন যেন সর্ব্বত্রই সেই আনন্দের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় একবার সরল প্রাণে ঐ সরল শিশুর মত অচল অটল বিশ্বাসে প্রার্থনা করিয়া দেখ, জাবনে কি আনন্দ

জগৎ কি আনন্দময়, আনন্দময়ের আনন্দ তরঙ্গ কেমন তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া, রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে। সে তরঙ্গে তোমার চিত্ত প্রবাহ মিশাইয়া দাও সে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত তোমার হৃদয়ে অনুভূত হইবে।

তখন শিশুর হাসিতে সে অমৃতের ধারা যে ক্ষরিয়া পড়িতেছে দেখিতে পাইবে, ঐ কুসুমের সৌন্দর্য্যে যেন সে চির সুন্দরের সৌন্দর্য্য হৃদয় আলোকিত করিবে, ঐ মলয় মারুতের স্নিগ্ধতার মধ্যে যেন শান্তিময়ের রাতুল চরণচ্ছায়ার শীতলতা অনুভূত হইবে। সরল প্রাণে আর্ত্ত হৃদয়ে ভগবন্মুখী হইলে, এই-রূপই হইয়া থাকে। চোখ চাহিয়া দেখ, সত্য কি না?

শুধু কি তাই, এই জগতের মধ্যে রৌদ্র ছায়া, সুখ দুঃখ সকল অবস্থায়, চিত্ত সমভাবে অবস্থান করিয়া একত্র ভগবৎ শক্তির বিভিন্ন বিকাশ দর্শনে, আনন্দিত ও ধন্য হইবে। বসন্তের কোকিল কাকলীতে যে আনন্দ, বজ্রের গভীর গর্জ্জনেও সেই আনন্দ অনুভূত হইবে। কারণ তখন হৃদয়ে তো আর বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র সম্বল লইয়া বিচার করিবে না, তখন সমগ্র জগৎ এক মহাশক্তির দ্বারা চালিত পালিত বলিয়া ধারণা হইবে, আর সেই শক্তি আনন্দ-ময়ের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশক বলিয়া জ্ঞান হইবে। তখন বেদান্তের সেই সার সত্য প্রাণের ভিতর ঝঙ্কার করিয়া উঠিবে :—

"আনন্দাদ্ধের খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

অতীত ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি রহিয়াছে। ভক্ত-জীবন অনুশীলন কর, এই সার সত্য প্রাণে অনুভূত হইবে। ঐ কালো মেঘ দেখিয়া শ্রীমতী রাধা—"ঐ আমার কৃষ্ণের রূপ বলিয়া বিহ্বল হইতেন। "তমাল কালো কৃষ্ণ কালো তাই তমালে ভাল বাসি" এইকথা বলিয়া বিহ্বল হইতেন। আর সেই সরল প্রার্থনা, সেই আকুল প্রাণের আহ্বান সেই ভগবৎ সাধনার অব্যর্থ সন্ধান আজ প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে শিক্ষা দিলেন। জীবের দ্বারে দ্বারে, অতি দীন ভাবে তিনি মানুষকে মানুষ হইতে শিখাইলেন, জগতে থাকিয়া সংসারে থাকিয়া যে গোলকের আনন্দোদ্ভাষিত চিত্র অঙ্কিত করিতে পারা যায় প্রাণে প্রাণে শ্রীভগবৎ কৃপা লাভ করা যায় তাহা জীবকে দয়া করিয়া শিখাইলেন। তিনি না শিখাইলে, শিখায় কে? আনন্দের আধার স্বয়ং না আসিলে আনন্দ বিতরণ করে কে?

তিনি জীবকে কৃপা না করিলে সে অধরাকে ধরে কে? হায়! হায়! মানুষ সে শিক্ষা কি ভুলিবে?

তাই বলি, শ্রীভগবান যখন মানুষকে সরল ভাবে সৃজন করিয়াছেন, তখন এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেন বিফল করিবে? এমন বুদ্ধি জ্ঞান লাভ করিয়া, এমন মনুষ্য জন্ম পাইয়া কেন হেলায় হারাইবে। একটু ফিরিয়া দাঁড়াও—সব ঠিক হইয়া যাইবে। আনন্দময়ের পদনখচ্ছটার আলোক তোমরা পশ্চাতে রাখিয়াছ, তাই তোমাদের সম্মুখে অজ্ঞানতা, মোহমায়ার ছায়া পড়িয়াছে। একবার ঐ আলোক সম্মুখে রাখ, দেখিবে এ ছায়া তোমার পশ্চাতে সরিয়া যাইবে। তখন আর কি কোন বাধা বিঘ্ন থাকে? তখন ঐ সরল শিশুর মত, সরল প্রাণে প্রাণ ভরিয়া বল :—

"দাও অচল অটল, বিশ্বাস ভকতি রতি মতি রাঙ্গা চরণে।
আমার চঞ্চল চিত, কর প্রশমিত, তব করুণা-বারি সিঞ্চনে॥
আমায় দেখায়ে প্রেমের আলো, তুমি করে ধ'রে নিয়ে চলো।
যেন চলি তব পথে, না পড়ি ভ্রমেতে, গহন সংসার কাননে॥"

সরলতার এত গুণ। তাই না, শ্রীভগবান মানুষকে সরল দেহ দান করিয়াছেন। মানুষের বাহ্য প্রকৃতি যা, তাহার অন্তঃ প্রকৃতিও সেইরূপ হউক। ইহাই তো স্বাভাবিক। শাস্ত্রে এই সরলতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নারিকেল বৃক্ষের প্রকৃতি আলোচিত হইয়াছে। নারিকেল বৃক্ষ যখন রোপণ করিতে হয়, তখন উহার মূলে যথোচিত পরিমাণে জল সেচন করিতে হয়। সেই নারিকেল বৃক্ষ যখন বড় হয়, তখন সে উপকারের কথা বিস্মৃত হয় না। কেন হয় না? না, তাহার দেহটি সরল বলিয়া! সে তখন মাথায় করিয়া জল বহন করে। কে কবে তার গোড়ায় একটু জল সেচন করিয়াছে, আজ সে তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মাথায় করিয়া জল বহন করিতেছে। শুধু ইহাই নহে; নিজের পত্র দিয়া তাহার ইন্ধনের কার্য্য করিতেছে। আবার সেই পত্রের কাঠিগুলি দিয়া, আশ্রয় দাতার নর্দামা পায়খানা পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। আহা সরল প্রাণ এমনি নিরভিমান!

তাই কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু "আপনি প্রাচরি ধর্ম্ম" জীবকে শিক্ষা দিলেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

আর এনাম কীর্ত্তনে কি হয়? না—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম, প্রতিপদা পূর্ণামৃতংস্বাদনন ;
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।"

আর শিব মুখনির্গত তন্ত্রশাস্ত্রও গম্ভীর ভাবে ঘোষণা করিতেছেন—"জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ।"

আর পাশ্চাত্য জগতে যীশুখৃষ্টও বলিয়াছেন—"Leave all and follow me."

এটা ঠিক্, গুরুর অভাব হয় না। অভাব শিষ্যত্বের। যদি আমরা একটু মুখ ফিরিয়া দাঁড়াই যদি ঐ আনন্দময়ের পদ-নখ-চ্ছটার আলোক সম্মুখে রাখিতে পারি, আর সরল প্রাণে আর্ত্ত হৃদয়ে, ঐ শিশুর মত প্রাণ ভরিয়া আকুল আহ্বান করিতে পারি, তবেই এ জীবন স্বার্থক হয়। তবেই মানুষের বাহ্য সরল প্রকৃতির সহিত আন্তরিক সরলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। নহে কি?

দুঃখ এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও এ সরলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে আর শিক্ষা কি? শুধু ইহাই নহে। মাতৃত্ব বোধও অনেকের নাই—প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিবার শক্তিও অনেকের নাই। জীবন এমনি হতভাগ্য যে, একটা ছেলে যাহাকে মা বলিতেছে,—তাহাকে অপর একটা ছেলে মা বলিতে জানেনা, বরং কুপ্রবৃত্তি প্রণোদিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া দেখে। হায়! জীবনকে এতটা অবনত করিয়া তোমরা কি সুখ পাও? কদাচ নহে। বরং সদাই মনে অশান্তির উদ্রেক হয়। ইচ্ছা করিয়া এ অশান্তি কেন পোষণ কর?

ভাই, একবার মুখ ফিরিয়া দাঁড়াও, শ্রীভগবানের পদ-নখ-চ্ছটার আলোক সম্মুখে রাখিয়া সরলভাবে দাঁড়াও, দেখ জীবনে কি আনন্দ, জগৎ কি আনন্দময়। একবার, শুধু একবার, তোমরা কে—কি করিতে আসিয়াছ—তাহা ভাব। একবার প্রকৃত মনুষ্য হও। ঐ সরল শিশুর মত, সাশ্রুপূর্ণ নয়নে সরলভাবে

একবার শ্রীভগবানের প্রার্থনা কর দেখি! করিলে দেখিবে, দয়াময় শ্রীভগবান হাত প্রসারণ পূর্ব্বক ঐ জননীর মত তোমার নিকট আসিয়া বলিবেন—"এই যে আমি এসেছি।"

২—চেয়ে দেখ।

—:০:—

দেখ, দেখ,—একবার চেয়ে দেখ, বিশ্বে আগমন করিয়া মানুষ বেশে আবির্ভূত হইয়া তুমি তো অনেক জিনিষ দেখিয়াছ ও দেখিতেছ, তবু তোমায় বলি—একবার চেয়ে দেখ।

সেই যেদিন, পৃথিবীর প্রথম আলোক রেখা তোমার নয়ন পথে পতিত হইয়াছিল, যে দিন তুমি তোমার সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষা সকল তৃপ্তির আধার স্বরূপ জননীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া ছিলে, তেমনি করিয়া একবার আজ বিশ্ব-প্রকৃতির পানে চাহিয়া দেখ। সেই সরল প্রাণে, অমল চোখে, তরল ভাবে একবার চাহিয়া দেখ, তোমার সে প্রথম জন্ম দিবসের কথা ভাব, তোমার শিশুজীবনের কথা ভাব, আর মিলাইয়া দেখ,—দেখিবে, তখন তুমি বিশ্বে যা কিছু দেখিতে, তাহার সহিত তোমার পৃথক ভাবে কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নির্ণয়ের উপায় ছিল না,—যা করিতে হইত জননীর সাহায্যে সাধিত হইত। চলিতে জাননা, বলিতে পারনা, নিজের প্রাকৃতিক অভাব বা আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির কোন ক্ষমতাই তোমার ছিল না। ছিলেন কেবল তোমার জননী, তিনি তোমার ভাবগুলি আয়ত্ত করিতেন, আর সেই ভাবে ভাবিত হইয়া তোমায় আহার করাইতেন, তোমায় আনন্দিত করিতেন, কৌতুহল বশতঃ তোমায় জন্তু দেখাইতেন; কখনও বা একটী খেলানা আনিয়া তোমার সম্মুখে ধরিতেন। এইরূপে তখন সেই জননীর নির্ভরতায় তোমায় সকল কার্য্য সাধিত হইত; তাঁহার মধ্য দিয়া তোমার বিশ্বজগতের পরিচয় হইত।

এত প্রাকৃত দেহের কথা, জড়ীয় নশ্বর দেহের কথা, কিন্তু এ জড়ীয় দেহের অন্তরালে যিনি আছেন, যিনি আত্মা নামে অভিহিত হয়েন, তাঁহার সম্বন্ধেও এই কথা খুব খাটে। একটু ভাবিয়া দেখ। সে আত্মা যাহার অংশ যাহা হইতে উদ্ভুত, তাঁহারই মধ্য দিয়া বিশ্ব প্রকৃতির পরিচয় গ্রহণ করিতে চায়—

তাহাতেই তার আনন্দ, তাহাতেই তার স্ফূর্ত্তি। স্থূল দেহের সহজ অবস্থায় আমরা যে ভাব বিকাশ দেখিলাম, মূলে সূক্ষ্ম দেহে সেই ভাবের কেন্দ্র স্থাপিত রহিয়াছে, নহিলে এ বিকাশ সম্ভবপর হইত কি? শিশু এবং জননীর যে মধুর প্রাকৃত সম্বন্ধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা শ্রীভগবানে সেই শ্রেণীর নিত্য সম্বন্ধ সেই নির্ভরতা বিরাজমান। প্রাকৃত শিশুর যেমন সর্ব্বস্ব তাহার জননী, তাহার সম্বল যেমন ক্রন্দন, জীবাত্মারও সর্ব্বস্ব সেই শ্রীভগবান, আর সানুরাগ প্রার্থনা-অশ্রু তাহার চিরসম্বল। তাই বলি, শিশু যেমন জননীর ক্রোড়ে থাকিয়া চাহিয়া দেখে, সেইরূপ সরল প্রাণে, আত্মার সেই সহজ ভাবটি লইয়া আজ একবার বিশ্বপ্রকৃতির পানে চাহিয়া দেখ দেখি? কি দেখিবে কি বুঝিতে পারিবে, কি সন্ধান পাইবে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে, সে যে দেখিয়াছে সেই জানে। তবে, সাধু মহাত্মারা অবস্থাটির ভাব যেরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর—

"মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বত্র হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

এতো বড় রহস্যের কথা! বিশ্বের বৃক্ষ লতা, পশুপক্ষী যা কিছু রহিয়াছে, যাহা প্রাকৃত বলিয়া তোমার আমার ধারণ হইতেছে, তাহা ভক্তের চক্ষে সহজ সরল ভাবের চাহনিতে কেবল শ্রীভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ভাব জাগাইয়া দেয়। ঐ যে নীলবর্ণ অসীম আকাশ, ঐ উন্নত গিরি শৃঙ্গ, ঐ বৃক্ষ লতা এ সকলের যেন কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। এগুলি যেন সেই শক্তিমানের আনন্দ শক্তির বিভিন্ন বিকাশ। তাহার লীলা বিলাসের পরিচয় মাত্র। ঐ উর্দ্ধগ্রীব, কলাপ বিকাশী ময়ূরের নৃত্যও যেমন আবার উর্দ্ধফণা, বিষধরের গতি তেমনি ভাব বিকাশক। প্রীতি প্রফুল্লিত ব্যক্তির অধর প্রান্তে মধুর হাসিটিও যেমন, আবার শোকাকুল ব্যক্তির আর্ত্তনাদের মধ্যেও সেই একই অনির্ব্বচনীয় শক্তির অসীম লীলা বিকাশ।

বাস্তবিক, খোলা চোখে চাহিয়া দেখিলে এমনই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এভাব গ্রহণ করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। সে শিক্ষা এই

বিশ্ব-প্রকৃতি পাঠ হইতে, পাওয়া যায়, শিক্ষায় যত অগ্রসর হওয়া যায়, হৃদয়ে ভগবৎ ভাবের বিকাশও তেমনি দ্রুত হইয়া থাকে। তাই বলি, একবার চাহিয়া দেখ, তুমি যে জগতে রহিয়াছ, সেই স্থূল জগতের পানেই একবার চাহিয়া দেখ, শিশুর মত সরল হৃদয়ে চাহিয়া দেখ। যাহা দেখিবে, তাহাতে তুমি মজিয়া যাইবে, বিশ্বের বিচিত্রতা দেখিতে দেখিতে চিত্রকরের চরণতলে আসিয়া উপনীত হইবে। সে চরণ-সরোজ হইতে আর নয়ন ফিরাইতে চাহিবে না, অথবা যে দিকে যাহা দেখিবে, তাহা দেখিলেই সেই চিত্রকরের স্মরণ হইবে, আর তুমি তখন স্বভাবে মগ্ন হইয়া যাইবে।

হে যুবকবৃন্দ! হে নরনারী! তোমরা তো অনেক ভোজবাজী, ম্যাজিক প্রভৃতি দেখিয়া থাক, কিন্তু ঐ পাখীর পালকে বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত করিল কে তাহা বলিতে পার কি? কোন কৌশলে, কাকের বর্ণও কোকিলের বর্ণ কাল হইলেও উভয়ের স্বরের তারতম্য ঘটিল। গোলাপের পাতাটি সবুজ, আর তার ফুলটি 'গোলাপী' বর্ণের হইল কিরূপে? দেখ দেখ, চাহিয়া দেখ, বিশ্বের পানে এইভাবে চাহিয়া দেখ, আর ভাব, এ কোন্ চিত্রকরের কোন শিল্পর রচনা কৌশল! না জানি সে কত সুন্দর, না জানি সে কত মধুর! যাহার রচনা-কৌশলে এত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য মাখানো রহিয়াছে, তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলে, না জানি প্রাণে কত মধুরতর ভাবের আবির্ভাব হইবে। প্রকৃতি পাঠে এই ভাব জাগে, আর এই ভাবের প্রবাহ—প্রাকৃতিক লীলা পরিচয় করিতে করিতে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

বিশ্বের সর্ব্বত্র যে ভগবৎশক্তির বিভিন্ন বিকাশ, বিভিন্ন লীলা প্রকটিত রহিয়াছে তাহা জীব ধারণা করিতে পারিলে আনন্দধামের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। আনন্দেই তাহার সৃষ্টি, আনন্দেই তাহার উৎপত্তি, আনন্দেই তাহার লয়—"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি যায়ন্তে, আনন্দেন যাতানি জীবন্তি, আনন্দেন সংপ্রবিশন্তি।" আনন্দময় শ্রীভগবান, জীব সেই আনন্দের অধিকারী। তাই তার প্রাণ কেবল আনন্দ চায়, সুখ চায়, তৃপ্তি চায়,—তাহা পাইবার জন্য সর্ব্বত্র ছুটিয়া বেড়ায়। কিসে সে আনন্দ লাভ, কেমনে এ প্রাকৃতিক জগতের মধ্য দিয়া সেই ভাব ধারণা করা যায়, তাহা জীবকে, মলিন-

চিত্ত জীবকে শিখাইবার জন্যই শ্রীভগবান শ্রীগৌররূপে অখিল-রসামৃত মূর্ত্তিতে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

চেয়ে দেখ, একবার সেই শ্রীমূর্ত্তির পানে চাহিয়া দেখ, সেই "চিন্ময় রস ভাবিতাভিঃ" মূর্ত্তির পানে চাহিয়া দেখ,—আর বিশ্ব-প্রকৃতির নিত্য লীলার সহিত সেই মূর্ত্তির সম্বন্ধ স্থাপন কর। দেখ, যে দিকে দেখিবে, যে চিত্র পানে চাহিবে, যে স্বর শ্রবণ করিবে, সর্ব্বত্র সেই শ্রীগৌরের করুণাময়ী শক্তির পরিচয় পাও কি না? ঐ উর্দ্ধবাহু বৃক্ষ তোমায় বলিয়া দিবে, আয় ভাই এমনি করিয়া বাহু তুলিয়া গৌরনাম কীর্ত্তন কর, প্রভু যে এমনি করিয়াই তোদের উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন! ঐ কুসুমরাশির পানে নয়ন ফিরাইলে তখন তোমার কাণে কাণে কে যেন কহিয়া দিবে,—'ভাই, এইরূপ সে রূপনাথের দ্যুতি বিকাশের আংশিক পরিচয়—নে ভাই আমায় নিয়ে যা, সেই অপরূপ গৌরসুন্দর বিগ্রহের চরণে আমায় অর্পণ কর, আমি তাঁরই, তাঁহাতে অর্পিত হইলে আমার সার্থকতা লাভ হয়।' ঐ শিশুর হাসিটি দেখিলে তখন মনে হইবে, এ হাসি যেন ফুরায় না, আহা শ্রীগৌর আমার এমনি সস্মিত বদনে একদিন নবদ্বীপের নর-নারীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। এইরূপে সর্ব্বত্র কেবল শ্রীগৌরলীলার বিকাশ বোধ হইবে—আর তোমার হৃদয় আনন্দের প্রবাহে তরঙ্গায়িত হইবে। সেই আনন্দই প্রকৃত জীবন, সে ভাব ছাড়া হইলে প্রাকৃত মরণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় মাত্র। তাই বলি চাহিয়া দেখ। অনেকদিন ধরিয়া তো প্রকৃতির পানে নানাভাবে চাহিয়া দেখিয়াছ। কিন্তু এবার একবার এই নবভাবে ভাবিত হইয়া চাহিয়া দেখ, সরল প্রাণে, আন্তরিক অনুরাগে চাহিয়া দেখ। দেখিতে দেখিতে তুমি স্তব্ধ হইয়া যাইবে, শ্রীগৌরপ্রেমে মত্ত হইয়া যাইবে—যাহা দেখিবে, যাহা শুনিবে, তাহাতে শ্রীগৌরের স্ফুরণ হইবে—আর তখন গৃহে বা অরণ্যে থাক, সংসারী হও বা সন্ন্যাসী হও, বিষয়ী হও বা বিরাগী হও—যে অবস্থায় থাক না কেন, তোমার হৃদয়ে সে অবস্থার পারিপার্শ্বিক প্রভাব স্পর্শ করিবে না; তুমি আপন ভাবেআপনি বিভোর হইয়া থাকিবে, আর আনন্দাশ্রু প্রবাহে বক্ষ ভাসাইয়া বলিবে—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥'

আনন্দ নগর।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত উকীল।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

প্র। ভগবান নারায়ণ চন্দ্রের রাজ্যে।

না। সে স্থান এখান হইতে কত দূর।

প্র। একটী নদী পার।

না। নদীর নাম কি?

প্র। ভব নদী।

না। নদীটী কিরূপ?

প্র। অতি বিস্তীর্ণ ও বড়ই বিঘ্ন সঙ্কুল।

না। পার হইবার উপায় কি?

প্র। ঐকান্তিক ভক্তি নৌকা।

না। সে কি আমাদের এই কাষ্ঠের নৌকার মতন?

প্র। না, একান্ত মনে ভালবাসার সহিত ভগবান্‌কে আশ্রয় করিলে ঐ নৌকা প্রস্তুত হয়।

না। বুঝিলাম না। ভগবান্ কি?

প্র। যিনি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

না। আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা ত প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্র। পিতার ঔরসে এবং মাতার রক্তে তোমাদের জন্মের সূত্রপাত। পিতামাতা নিমিত্ত কারণ মাত্র। ভগবান্ ঐ ঔরস এবং মাতার দেহস্থ রক্ত এই দুইটী পদার্থ লইয়া তোমাদের মুখ, চক্ষু, নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এবং মন বুদ্ধি প্রাণ তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া তোমাদিগকে মনুষ্যাকারে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কিছু মৃত্তিকা লইয়া তদ্দ্বারা পুত্তলিকা গড়ে তবে মৃত্তিকা কি সেই পুত্তলি-

কার সৃষ্টিকর্ত্তা না যাহার মাটী সেই সৃষ্টি কর্ত্তা? মৃত্তিকা বা যাহার মৃত্তিকা তিনি যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না পরন্তু যিনি পুত্তলিকা গড়েন তিনিই পুত্তলিকার সৃষ্টিকর্ত্তা। পিতা মাতার দেহস্থ রস পদার্থ হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি। সেই রস পদার্থের সাহায্যে পিতামাতার মনুষ্য গড়িবার সাধ্য নাই অব্যক্ত মহাশিল্পী একজন আছেন তিনি মনুষ্য নির্ম্মাণ করিতেছেন। সেই অব্যক্ত মহাশিল্পীই ভগবান্ তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা—

না। আচ্ছা ভগবান মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতাদির কি রূপে সৃষ্টি হইল?

প্র। মনুষ্যের ন্যায় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতাদি একই নিয়মে সৃষ্ট হইয়াছে মনুষ্যের জন্মও যেমন ভাবে ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতিকেও ঐরূপ দুইটী রস পদার্থ হইতে ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন। বৃক্ষলতাদি যে রস আছে সেই রসের সহিত মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ রস মিশ্রিত হইয়া বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তির নিমিত্ত কারণ হইয়াছে। ফলতঃ সেই মহাশিল্পী ভগবান সর্ব্বত্র দ্বিবিধ রস সংযোগে মনুষ্য পশু লতাদি নিত্য সৃষ্টি করিতেছেন।

না। ভগবান্ সৃষ্টি করিতেছেন একথা কেন বলিব। ঐ সকল আপন আপনি হইতেছে এরূপ বলি না কেন?

প্র। কোন কার্য্য আপনাআপনি হয় না। প্রত্যেক কার্য্যেরই কর্ত্তা আছে। জীবাদি যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করাই যখন তাঁহার কার্য্য তখন বুঝিতে হইবে এই সকল কার্য্যের কর্ত্তাই একমাত্র শ্রীভগবান্।

না। যখন প্রথম মনুষ্য বা পশু পক্ষী প্রভৃতি বা বৃক্ষ লতাদি সৃষ্ট হইল তখন তো পিতা মাতা ছিল না। পিতা মাতার দেহস্থ দুইটী রস পদার্থ ত ছিল না কিরূপে তবে এই সকলের সৃষ্টি হইল?

প্র। এই প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিতে হইলে কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ স্বরূপতঃ কি ইহা জীব মাত্রেরই জানা উচিত। সাধু পণ্ডিতগণ এই জাগতিক প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক কার্য্য ধ্বংশ শীল ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। থাকে কেবল সেই পদার্থের এবং কার্য্যের জ্ঞান। এই জ্ঞানের সহিত আর একটী পদার্থ থাকে সেইটী আনন্দ ঐ আনন্দ জ্ঞানের সহচর।

একজন সঙ্গীত গাইতেছেন যিনি সঙ্গীত বুঝেন তিনি সঙ্গীতে আনন্দ উপলব্ধি করিতেছেন যিনি সঙ্গীত বুঝেন না তিনি কি সঙ্গীতে আনন্দ পান? কখনই পান না। যদি একটী পদার্থ কোন ব্যক্তি পায় তবে যদি সেই ব্যক্তি বিশ্লেষণাদি দ্বারা সেই পদার্থের গুণ ও শক্তি প্রভৃতি অবগত হইতে পারেন তাহা হইলে সেই গুণ ও শক্তির জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, জাগতিক যাবতীয় পদার্থ ও কার্য্যের পরিণামে এক মাত্র জ্ঞান থাকে এবং সেই জ্ঞানের সহচর আনন্দ সেই জ্ঞানের সহিত একত্রীভূত থাকে। সাধু তত্ত্বদর্শীগণ এইরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জাগতিক সমস্ত পদার্থ ও কার্য্যের শেষ পরিণাম জ্ঞান ও আনন্দ। এক একটী পদার্থ এক একটী কার্য্য লইয়া ক্রমে সমস্ত জাগতিক পদার্থ ও কার্য্যের জ্ঞান এবং আনন্দ অতি বিশাল। সেই জ্ঞান এবং আনন্দ কবে আরম্ভ কবে শেষ তাহার অবধারণা হয় না সেই কারণে সেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ উঁহাদিগকে নিত্যকাল স্থায়ী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং সেই সমস্তের পরিণাম জ্ঞান আনন্দ নিত্যকাল স্থায়ী। নিত্যকাল স্থায়ীর আর একটী নাম সৎ এবং জ্ঞানের আর একটী নাম চিৎ। সাধু তত্ত্বদর্শীগণ এই পরিণামকে সচ্চিদানন্দ কহিয়া থাকেন। জ্ঞানের মধ্যে পদার্থের গুণ ও শক্তি বোধ অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং এই বিশাল সচ্চিদানন্দের মধ্যে বিশাল গুণ ও শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। যে পদার্থের মধ্যে গুণ ও শক্তি থাকে তাহা সজীব অর্থাৎ ক্রিয়াশীল এই সচ্চিদানন্দ জীবকে নানাবিধ গুণযুক্ত করেন এবং কার্য্য করিবার শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখুন এই সচ্চিদান্দ কি কোন পদার্থের মতন? না তাহা হইতে ভিন্ন?

জাগতিক পদার্থ ও কার্য্য সমুদায়ের পরিণাম সচ্চিদানন্দ। জগৎ ব্যতীত যে অনন্ত পদার্থ আছে তৎসম্বন্ধে তত্ত্বদর্শী সাধুগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহার ও পরিণাম সচ্চিদানন্দ। বস্তুতঃ যে কিছু কার্য্য যে কিছু পদার্থ হউক না তৎসকলেরই পরিণাম সৎ চিৎ এবং আনন্দ। সুতরাং এক সচ্চিদানন্দের মধ্যে সর্ব্ববিধ পদার্থ ও কার্য্যের পরিণাম অন্তর্নিবিষ্ট। এই সচ্চিদানন্দ জগৎ ও জগৎ ব্যতীত তাবৎ পদার্থ মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। এই সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দকে তত্ত্বদর্শীগণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান এই আখ্যা

প্রদান করিয়া থাকেন। প্রত্যেক পদার্থের পরিণাম সচ্চিদানন্দ তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রত্যেক পদার্থ মধ্যে ইহা বিদ্যমান। এই সচ্চিদানন্দ অতীন্দ্রিয় পদার্থ; ইঁনি প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন।

এই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থের যখন ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল তখন তিনি তাহার সর্ব্বব্যাপী শরীরের এক অংশ অবলম্বন করিয়া তদুপরি একটী অতি সূক্ষ্ম বস্তু সৃষ্টি করিলেন। ঐ অতীন্দ্রিয় পদার্থ বা ভগবানের ঐ ইচ্ছাই মায়া বা প্রকৃতি। ইহাতে ভগবানের গুণ শক্তি বর্ত্তমান। এই প্রকৃতি ঐ সূক্ষ্ম পদার্থ লইয়া ক্রম বিকাশ পরম্পরায় বুদ্ধি মন পঞ্চ সূক্ষ্মভূত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পরমাণু সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে পূর্ব্ব কথিত দ্বিবিধ রসের ও সৃষ্টি হইলেন। এইরূপে ক্রম ব্যাবৃত্তি নিয়মানু-সারে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতাদির সৃষ্টি হইল। সকল জীব স্ত্রী পুরুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। এইরূপে প্রকৃতি জগৎ ও তৎস্থিত স্থাবর পদার্থের সৃষ্টি করিতেছেন।

না। কি বিশাল ব্যাপার, ভগবান্ অনন্ত। এক্ষণে ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি এবং আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা দয়া করিয়া বলুন।

প্র। সেই সুবিশাল সচ্চিদানন্দরূপী ভগবানের এক কণিকা মাত্র অংশ জীবদেহে অবস্থিত। সেই কণিকার বলে জীবের আহার বিহার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। এখন প্রত্যেক জীব সেই চিন্ময় ভগবানের অংশ। তিনিই আমি। এ জ্ঞান বদ্ধমূল হইলে জীব অপর জীবকে আপনার আত্মীয় ভাবিবে, কেহ অন্যের প্রতি কোনরূপ দ্রোহাচরণ করিলে যে ভগবানের প্রতি দ্রোহাচরণ হইবে। তাহার অংশ স্বরূপ জীবকে সেবা করিলে ভগবৎ সেবা হইবে। অপর জীবের সুখ স্বচ্ছন্দ আপনার সুখ স্বচ্ছন্দ বলিয়া বিবেচিত হইবে। অপিচ আমি বলিলে যাহা বুঝায় তাহা সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ আমার আত্মীয় তিনি বিশাল সর্ব্ব ব্যাপী আমি সামান্য কণিকা মাত্র। তিনি উপাস্য আমি উপাসক, তিনি প্রভু আমি দাস, তিনি প্রাণপতি আমি তাঁহার প্রিয়তমা, তিনি আমার পরম বন্ধু তিনি পিতা মাতা আমি সন্তান এইরূপ সম্বন্ধ জীব

ভগবানের সহিত স্থাপন করিবে এবং সেইরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া জীব কার্য্য করিবে।

না। আচ্ছা এরূপ জ্ঞানে কার্য্য করিলে আমাদের কি হইবে?

প্র। জীব শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করিবে সাংসারিক ক্লেশ দুঃখে জীবকে মুহমান হইতে হইবে না। স্বার্থের জন্য জগতে অশান্তি অত্যাচার প্রভৃতি ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে যদি জীব স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিতে অভ্যস্ত হয় এবং পরের সুখ স্বচ্ছন্দে আপনার সুখ স্বচ্ছন্দ হইবে এই ভাবে যদি কার্য্য করে তবে আর কিসের দুঃখ কিসের ক্লেশ।

ক্রমশঃ।

প্রেমাবতার।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর।)

(পুর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

—:o:—

"অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদিয়ায়॥"

জগৎ তারিতে আজ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপে উদয় হইলেন। ১৪০৭ সকে ফাল্গুনী পুর্ণিমার সন্ধ্যায় ভুমিষ্ঠ হইলেন। ধর্ম্মেন্দু কাম রাহুগ্রস্ত ছিল, রাহুর সেই ঘোর আঁধারকেও আলোকিত করিয়া শ্রীশ্রীগৌর পুর্ণেন্দু আবির্ভুত হইলেন। চাঁদকে আঁধারে গ্রাস করিয়াছিল কিন্তু আবার এমন চাঁদের উদয় হইল যে সেই আঁধারকেও গ্রাস করিল। চাঁদের গুণ রাহু গ্রাসে ক্ষয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সুধাউদ্গীরণ করে, কিন্তু গৌর বিধুর অলৌকীক ও অমিত গুণ প্রভাবে পাপের বহ্নি ও ইন্ধন পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রেমসুধা ছড়াইতে লাগিলেন। স্বয়ং কলিও নিষ্পাপ হইল। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস বলিয়াছেন,—

"চৌদিকে পারিষদ তারা, দূর কয় কলি আঁধিয়ারা।
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ, উয়ল শ্রীনবদ্বীপ মাঝ॥"

গোরা মুখে "মা" সুধায় পারা
সে মুখে "মা" শুনি শচী ভোরা॥

"মা" শব্দে কত না অমৃত!—তাহা আবার চাঁদ মুখে উদ্গারিত! আহা, কি মধুর! কি মধুর!! কি মধুর!!! অহো, তচ্ছ্রবণে শচী মাতার প্রাণে আনন্দের কতই লহর! শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তাধীন তাই ভক্তির জোরে আজ শ্রীভগবান্ শচীমাতার কাছে পুত্ররূপে ধরা পড়িয়াছেন।

ভক্তি মূলে বিকি যায়,—ভক্তি ডোরে বাঁধা রয়।

তিনি পাণ্ডব রথের সারথি কেন? ভক্তি বশ্যতায়। তিনি বিদুরের ক্ষুদ্ খাইলেন কেন?—ভক্তি বশ্যতায়। তিনি গুহক চণ্ডালকে কোল দিলেন কেন?—ভক্তি বশ্যতায়। যশোদার করে বাঁধা পড়িলেন কেন?—ভক্তিবশ্যতায়। আজ ব্রজগোপীর প্রেমবশ্যতায় ভক্ত বিগ্রহ ধারণ করিলেন—ঘরে ঘরে অযাচিতভাবে মাগিয়া প্রেম দিলেন।

মধুময় গোরাশিশু কিবা নাচেন! নদীয়া-নারী "বোলহরি বোলহরি" বলি করতালি দিয়া কত না নাচান!—"নিমাই নাচ; নিমাই নাচ," তালে তালে পা ফে'লে নাচনাচ নাচ।" নিমাই শিশু সুধা তরঙ্গবৎ উঠে, নাচে আবার পড়ে।—কিবা মধুময়ী শোভা!—যেন সকলের, সর্ব্বজীবের মূর্ত্তিমান সুখ! আনন্দধনি গোরাচাঁদেরে দেখিয়া প্রাণী মাত্রের তাপ থাকে না। সবারই বাঞ্ছা এমন চাঁদ ধরিয়া তুলিয়া বুকে রাখিয়া রাখে। নিমাইর মুখ দর্শনে সকলের হৃদয় বাৎসল্যরসে ভরিয়া যায়। প্রভুর নৃত্যবিকাশে ভূরি কল্যাণ মধুর ধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল।

"কৃষ্ণবিস্মৃতির নাম সংসার বা দুঃখ।"

শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে কলির কৃষ্ণবিস্মৃতি অন্ধকার ঘুচিয়াছে; সুতরাং সংসার দুঃখ ঘুচিয়াছে। কলির জীবের ভাগ্য প্রশস্ত; যেহেতু;—

কলের্দোষনিধেঃ রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তো বন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্।)

হে রাজন্! কলির নিখিল দোষ সত্ত্বেও তাহার এই একটি মহদ্গুণ দৃষ্ট হয় যে, লোকে শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করিয়া থাকে।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

পূর্ণ স্বরূপ রসৈক বিগ্রহ সেই সাক্ষান্নামী অবতীর্ণ হইয়া কলির মস্তকে জয়মুকুট পরাইলেন।

বৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জ কুটীরে সখীগণ যে উপাদেয় সামগ্রী সকল বহন করিয়া অতি যত্নে কৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়াছিলেন সেই প্রসাদ ইতরজনে বিলাইতেই কৃষ্ণ ভক্তরূপে প্রকট হইলেন। নিকুঞ্জ বাহিরে সর্ব্বত্র সে প্রেমের সন্ধান ও উদ্দেশ পৌছিল।

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বিযুক্তাভাবাৎ ছন্নঃ কলৌ।"
"অন্তঃ কৃষ্ণর্ব্বহি র্গৌরঃ"

প্রভু নিজ ভগবত্তা লুকাইয়া মানুষের সঙ্গে গলাগলি কোলাকোলি করিয়া ধুলায় লোটাইয়া নাচিয়া গাহিয়া নিজ মাধুরীদানে কোটি কোটি জীবকে মুগ্ধ ও মধুর করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ছন্ন অর্থাৎ প্রচ্ছন্নতাই প্রেমাবতারত্বের নিদান। একজন মহারাজ রাজবেশ না লুকাইলে যেমন জনসাধারণে মিশিতে পারেন না, এ সূত্রে কৃষ্ণলীলা চেয়ে গৌরলীলায় প্রভু বেশী নামিয়াছেন। তাই মহাজনবর্গ বলেন এমন দয়াল অবতার আর নাই।

দীন কাঙ্গালাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ সকল দেশের ধূলিকেই পদধূলি বা ব্রজের ধূলি করিয়া রাখিয়াছেন। জীবের ভাগ্য অসীম।

অঙ্গাভরণ হরণোদ্দেশ্যে চোর বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরাঙ্গকে স্কন্ধে বহন করিয়া ঘুরিল। বিশ্বম্ভরের মায়াচক্রে চোর অবশেষে শচী গৃহ দ্বারেই উপস্থিত। চোরের অভিসন্ধি দুষ্ট হইলেও প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে ও প্রভুকে স্কন্ধে বহন করিতে পাইয়া, চোরের বুদ্ধি নির্ম্মল হইল তস্কর, তৃণাবর্ত্তবৎ প্রভুর মায়াবর্ত্তে তৃণবৎ আবর্ত্তিত হইয়া ধন্য! এই অবতারের নাম "চৈতন্য।"—এই অবতারে প্রাণে মারিয়া মুক্তিদান নাই। তৃণাবর্ত্ত হত হইয়া মুক্ত, এই তস্কর না মরিয়া ততোঽধিক ধন্য। প্রভু কৃপায় তাহার চৈতন্যোদয় হইল—সুতরাং মুক্ত, ও ততোধিক ভক্ত হইল। চিরনিদ্রিত ভগবদ্দাস্যের জাগরণই যথার্থ মুক্তি, উহা জীবন থাকিতেই ঘটে; তখন ভক্তি দ্বার উন্মুক্ত হয়। যে অবতারের কৃপায় বর্ত্তমান জীবনেই চৈতন্য ফোটে, তিনি চৈতন্যাবতার।

পৌনে ষোল আনা লোকে মুক্তি লোভে যোগ, তপস্যা সাধন, ভজন করিতেন। মোক্ষ বাঞ্ছারূপ ঘোর কুসংস্কার ধর্ম্ম জগতে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছিল। দুই একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গাভিঘাতে তদ্ব্যত্যয় ঘটে নাই। অন্ধ আঁধারের পরতে ঢাকা এই ভ্রমটি শাস্ত্রবাক্যের কদর্থতা লতার ফল। এখনও অনেক অধিকারী এই কুহকে বিহ্বল। অনেক গৈরিক বাবু মোক্ষ ব্যাখ্যা করেন, গৌরাঙ্গকে ঈশ্বর বলেন না। তাঁহারা মোক্ষের খদ্যোতালোকেই বিচরণ করেন, ভক্তি চিন্তামণির আলোকের সন্ধান পান নাই। বন্ধন ও মুক্তি জৈবধর্ম্মান্তর্ভুক্ত। মুক্তিবাদ দ্বারা ভক্তি আচ্ছাদিত হয়। মুক্তি এক দিব্যাবস্থা ভক্তি এক দিব্য বস্তু। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপালোকে মুক্তি ও ভক্তির পার্থক্যের বিষয় লোকে জানিয়াছে, নয়নের ধাঁধাঁ মিটিয়াছে।

বাৎসল্যের কর্ণোৎসবে নূপুরও মধুরে বংশী তালই বাজে। গোপালের নূপুর, শ্যামের বংশী। আজ শ্রীশচী জগন্নাথের বাৎসল্য মন্দির সেই মধুর নূপুর ধ্বনিতে উৎসবময়। শচী গর্ভ-সিন্ধুর ইন্দু গোরা শুধু শচীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াই নিরস্ত নহেন, তাঁহার কিরণে জগতের অন্তর্ব্বাহ্যঃ উদ্ভাসিত হইয়াছে জগজ্জীব-রূপ সাজ্ঞ্য-আকাশ আজ গৌর-চাঁদের সুস্নিগ্ধ সুধা ছটায় উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। আজও ভাগ্যবান জনে সেই লীলা মাধুর্য্য দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হয়।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

হে দয়াময় গৌরসুন্দর! যে কিরণে জগজ্জীবকে একদিন উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, আবার সেই ভাবে ব্রহ্মাণ্ডস্থ তাবৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়ে সেই আস্বাদের শক্তি সঞ্চার কর। জীব তোমার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হউক। দয়াময় কবে দীনের এ আশা পূর্ণ হইবে?

অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে।
রোমহর্ষ কম্প হেল চরণ দর্শনে॥
সর্ব্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেম ভক্তি প্রচারের করিল আরম্ভ॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ।

জ্ঞান—বীজ; পুষ্প—ভক্তি; ফল—প্রেম। প্রেমভক্তি—চরম বিদ্যা।

'বিদ্যাবধূ জীবনম্'—

প্রেমভক্তি বিদ্যার প্রাণ। দেহ গঠিত হইয়া যেমন উহাতে প্রাণ সঞ্চার হয়, তেমন বিদ্যা দেহে প্রাণ স্বরূপ প্রেম ভক্তির সঞ্চার হয়। যদি বিদ্যানু-শীলনের ফল ভক্তিতে না দাঁড়ায়, তবে সে বিদ্যা বিদ্যাই নয়, সে কেবল মূর্খতার আড়ম্বর। জল বাষ্প হইয়া গগনে মেঘ রচনা করিল; ভীষণ গর্জ্জন, কিন্তু বর্ষণ নাই। বিদ্বজ্জনের বিদ্যা-মেঘ অবর্ষণে নিষ্ফল। যাঁহার বিদ্যা অমৃত বারি বর্ষণ করিয়া চিত্ত-ক্ষেত্র উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করে, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্। বিদ্যা পুষ্পবতী পরে ফলবতী হইয়া প্রেমভক্তি প্রদান করে। যাঁহার বিদ্যা ফলিতা, তিনি ধন্য। সার ও যত্নভেদে বা অদৃষ্ট দোষে কাহারও বিদ্যা-লতার ফুল দলাগ্র কণ্টকবৎ,—চোখা হয়। এমন ফুলের তেমন অভাব নয়, যাহার হার গাঁথিয়া পরিলে গলায় বিঁধে। তাহার ফুলও কণ্টক জাতীয়।

নবদ্বীপের বহু মানিনী ভূরিবিদ্যা কণ্টকলতা বৈ বেশী নয়। তাই পণ্ডিত বিদ্যারত্ন সমাজের চক্ষুরুন্মীলন মানসে অগাধ বিদ্যার অভিনয় দেখাইয়া আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ উহা কণ্টকলতা নয়, কল্পলতা প্রমাণ করিতে বিদ্যার একমাত্র সারভূত লক্ষ্য এবং সিদ্ধিস্বরূপ প্রেমফল প্রকট করিলেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তাহার গতি কোন দিকে, জগৎ আজি দেখিয়া শিখিয়া মানুষ হউক্। আজি বিদ্যাদিগ্‌গজগণের গর্ব্ব চূর্ণ হউক্। পণ্ডিত! আজ বুঝিয়া লও তুমি মূর্খ,—বুঝিয়া লও তুমি শুধু এতকাল কণ্টকলতার মূলে জল সিঞ্চন করিয়াছ।

"কৃষ্ণ ভক্তি বিনা জীবের বিদ্যা নাই আর।"

অর্থাৎ বিদ্যা মৃণাল মাত্র, কমল উহার বিকাশ, মধু গন্ধ তাহার পূর্ণ-পরিণতি। কমল হীন মৃণাল, আর ভক্তিহীন বিদ্যা তুল্য জানিবেন।

"বিদ্যার" যথার্থ ব্যাখ্যা জগতে আজ খুলিয়া ধরা হইবে।—পরম বিদ্যাবান গৌরহরির বিদ্যাময়ী তনু ভক্তিফুলভরে নোঙাইয়া পড়িল, আনন্দহিল্লোলে দোদুল্যমানা হইল এবং নেত্রধারায় মধু বহিল।

বিদ্যার প্রয়োজন কি?—চরিত্র গঠন করা অর্থাৎ নিরপরাধ হইতে শিক্ষা করা।

সাবধানে নরোত্তম শুন এক কথা।
অন্তর্ব্বাহ্যে অপরাধ না জন্মে সর্ব্বথা॥ প্রেমবিলাস।

বিদ্যা বা দর্শন ; উহার চর্চ্চা দ্বারা চিত্ত ও চরিত্র গঠিত, মার্জ্জিত ও রঞ্জিত হয়, চিত্ত সতত সত্বপূর্ণ থাকে, উহাতে রজস্তমঃ ক্রিয়া করিবার অবকাশ পায় না। সুতরাং চিত্তে কি লোক ব্যবহারে কোনও অপরাধ ঘটে না। নিরপরাধ ব্যক্তির চিত্ত নিয়ত প্রসাদ পূর্ণ থাকে। তাই, তাহার চিত্তে নিত্য নবনব আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় না। ইহাই বিদ্যার বিশুদ্ধ গতি বা ভগবৎপ্রপন্নতা।

"এইরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।"

বিজ্ঞজন নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা প্রেম লাভ করেন। মূর্খজনের পদে পদে অপরাধের বেড়ী লাগা থাকে। নিরপরাধ মানবই প্রকৃত পণ্ডিত।

বিদ্যাদেবীর অভিনয় সমাপ্ত হইল। এখন ভক্তিদেবীর অভিনয়ারম্ভ। গগনে চাঁদ সতত পূর্ণভাবে বিরাজমান্, অথচ ক্রমশঃ তাহার কলা বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। তদ্রূপ প্রেম-সুধাধার গৌরচন্দ্রের গয়ায় এই প্রথম প্রেমকলা প্রকাশ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-নেত্রে বিচিত্র গঙ্গাধারা! কি দয়া, পদকমলের গঙ্গা নেত্রকমলে পদ পাইল। গোরাচাঁদ কাঁদেন কেন?—বিদ্যা-ক্ষীরোদ হইতে ভক্তিইন্দুর প্রকাশ! ও নয়নধারা নয়, সুধাক্ষরণ! জীবগণ, বন্ধুগণ, লক্ষ্য ঠিক্ রাখিয়া বিদ্যোপার্জ্জন কর এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত পদবীর অনুসরণ কর এবং অশোক-কান্নার বিচিত্র লীলা হৃদয়ঙ্গম কর। একবার ভাব শ্রীগৌরাঙ্গ কাঁদেন কেন, এবং এই প্রশ্নের উত্তর সিদ্ধান্ত নির্ণয় কর।—গৌরায় পুরবের ভাব জাগিয়াছে।

ক্রমশঃ—

সদ্ভক্তি-কুসুম।

—:•:—

[প্রেম-পাগল শ্রীল রাধা মাধবের লিখিত পত্রাবলী হইতে অবচয়িত।]

মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ।

—:•:—

ঐশ্বর্য্য মার্গে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ কেহই করিতে পারিবেন না। এরূপ ভাবে সেবা প্রকাশের চেষ্টা, দোকান বৃদ্ধির আয়াস মাত্র। ইহাতে, ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করা হয়। রাগ-মার্গ, পূর্ণ মাধুর্য্যময়; উহাতে সর্ব্ব বর্ণের সমান অধিকার আছে; কোন ভকতি বিশেষতঃ একচেটীয়া ধর্ম্ম, ইহা নহে।

শ্রীবৈষ্ণব ও নর লীলায় বিশ্বাস ব্যতীত কোন প্রকারে মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ হয় না, হইবে না। "মানুষ ভজন অতি সোজা। নাইকো তায় যোগ উপবাস্, কেবল বিশ্বাস, ক'রে দেখ কত মজা।"

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ। এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া যিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিই সেবা প্রকাশের অধিকারী; অন্যের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীভগবানের পূজা।

—:১:—

জগতের প্রতি অনু শ্রীরাধাময় জগৎ; শ্রীবিষ্ণু প্রিয়া অভেদ্ স্বরূপ শক্তি; নাগরীর ভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব সম্বন্ধ স্থাপন বা পূজা হইতে পারে না। "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কাম বীজ কাম গায়ত্রী যাঁর উপাসন॥"

"সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র সুত ইথে নাহি আন।"—অজ্ঞান জীবের লুচী মণ্ডা, বাদ্য ঘণ্টা দ্বারা, স্বয়ং ভগবানের পূজা হইতে পারেনা। আত্মদানে সখী ভাব অবলম্বন ব্যতীত এই লীলা জানিবার উপায় নাই।

"অতএব সর্ব্ব পূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্ব পালিকা, সর্ব্ব জগতের মাতা॥

অবিশ্বাসে—অপরাধ।

—:০:—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, কাশীধামে, প্রকাশানন্দ ও নীলাচলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট সমুদয় বেদ ও বেদান্তের বিচার করিয়া, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব বুঝাইয়া গিয়াছেন; যাঁহাদের, ইহাতে বিশ্বাস নাই, তাঁহারাই পুনরায় বেদান্ত পাঠ পূর্ব্বক তর্ক করিয়া ঘোর অপরাধ করিতেছেন। অবিশ্বাসে, এরূপ অপরাধ প্রেমের পথে কণ্টক্ স্বরূপ।

ঐশ্বর্য্য সেবা, না, পোষাদারি?

—:০:—

"শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায়" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, প্রভৃতি চারি লক্ষ বৈষ্ণব গ্রন্থ বর্ত্তমানে, লোকের ঘরে ঘরে প্রেম-অন্বেষণের

প্রয়োজন নাই। ব্যবসা বুদ্ধি দ্বারা ঐশ্বর্য্য সেবা বজায় রাখা যায় না। পূর্ণ মাধুর্য্য লীলা, অদ্যাপি বর্ত্তমান, বর্ত্তমান উপেক্ষা পূর্ব্বক অনুমান ও তর্ক, দুষ্ট ভাব।

নামে রুচি ও বৈষ্ণব চিনিবার শক্তি কখন হয়?—আত্ম রক্ষা দ্বারা কামের বেগ ও রতি উর্দ্ধস্থ হইলে, যখন উন্নত উজ্জ্বল রসের সঞ্চার হয়, তখন, নামে রুচি হয় এবং বৈষ্ণব চিনিবার শক্তি জন্মে।

সিদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা,—

—:০:—

স্বয়ং বৈষ্ণবাচার পালনে অক্ষমগণ, কেবল সিদ্ধ বৈষ্ণব সেবার ফলে, সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, প্রেম-ধনে ধনী হইতে পারে।

অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ,—

—:০:—

অনায়াসে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম ও রস তত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য স্বয়ং ভগবান ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, স্বশক্তি সাঙ্গোপাঙ্গ দ্বারা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি চারি লক্ষ বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন; অভিনব কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিলে সেই সমুদায় আচ্ছন্ন করা হয়। তজ্জন্য শ্রীল নরোত্তম বলিয়াছেন—

ওরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল।
গরলে কলস ভরি, মুখে তার দুগ্ধ পূরি,
তৈছে দেখ সকলি বিটাল॥
প্রাচীন প্রবীন পথ, তাহা দোষে অবিরত,
করে, দুষ্ট কথার সঞ্চার।
গঙ্গাজল যেন নিন্দে, কূপজল যেন বন্দে,
সেই পাপী অধম সবার॥"

প্রাচীন প্রবীন মহাজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্র প্রকাশ ভিন্ন নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। মহাজনগণ, যত সহজে শ্রীনাম প্রচার করিয়াছেন, তত সহজে প্রচার করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। সেই সমুদায় গ্রন্থ অবিকল নির্ব্বিকার প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। রসলীলা বর্ণনে পুরুষেরত অধিকারনাই।

ভক্তি ১৬শ বর্ষ, ৯ম, ১০ম, সংখ্যা, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩২৫।

কি চাহিব আমি ?

কি চাহিব আমি নাথ, কি চাহিব চরণে তোমার ?
জানি না তো মূঢ় আমি, ভাল মন্দ কি আমার !
এ সংসার সুবিশাল,
কত প্রলোভন-জাল,
পাতিয়া রেখেছে মায়া, সাজায়েছে চমৎকার,
বিলাস-ভবন কিবা, আকর্ষণ কি তাহার !
কত ধন কত জন,
জগতের কি বন্ধন.
ভুবন-মোহন রূপ রহিয়াছে চারিধার ;
ধায় অন্ধ মুগ্ধ জীব, দেখি তাহে অনিবার।
হয় পূর্ণকাম কেহ ;
কেহ পাত করে দেহ,
মিটেনা পিপাসা তার, দেখে বিশ্ব অন্ধকার !
ছায়ার এ খেলা ওগো, কিবা লাভ ক্ষতি কা'র ?
হেন লাভালাভে নাথ,
অমূল্য এ দেহ পাত
চাহে না করিতে প্রাণ ; করি সব পরিহার
চাহে সদা ঊর্দ্ধ মুখে,—কি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তার !
অন্তর্য্যামী তুমি হরি,
কর পূর্ণ কৃপা করি
আশা তার,—দাও সিদ্ধি কমলের সাক্ষাৎসার।
আমি তো জানি না সত্য ভাল মন্দ কি আমার !

দীন—শ্রীচণ্ডী চরণ মুখোপাধ্যায়।

পথের কাঙ্গাল।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।)

৩—অধমে কর করুণা।

—:০:—

যত না কাঁদি, যত না আকুলি ব্যাকুলি করি, যত না হতাশে ম্রিয়মান হই—এরি মধ্যে একটা শক্তি জাগিয়া উঠে। সেটা অলক্ষ্যে, অজানিতরূপে, অভাবনীয় প্রকারে বিকাশ পায় বটে, কিন্তু সেটি যে তোমারই করুণা, প্রভু! মানুষ পড়ে, পড়িবার সময় তাহার কত না আঘাত লাগে, মাটিতে পড়িয়া হয়তো সে অচৈতন্য হইয়া যায়, কিন্তু যে মাটিতে পতন হয়, সেই মাটি ধরিয়া আবার সে উঠিবার প্রয়াস পায়। তাই প্রবাদ আছে—"যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ'রে।"

আসে,—মানুষের প্রাণে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন সে কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারে না। তাহার সকল চিন্তার দৌড়, যেন দ্রুতগামী পথিকের পথপ্রান্তে গভীর ও বিস্তৃত খাদ দর্শনের মত সহসা নিরস্ত হইয়া যায়। তাহার সকল যুক্তি-তর্ক, যেন ক্লান্ত শ্রান্তদেহের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অভাবনীয় ঘটনাচক্রে পড়িয়া, এমন একটা মানসিক চঞ্চলতা হয়, যে অবস্থায় সে আপনাকে সাম্‌লাইতে পারে না; অসহায় ও উপায়হীন বোধে, যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত স্তম্ভিত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় তখন, স্বাভাবিকরূপে এই ভাবটি জাগিয়া উঠে—"ওগো! যদি কেহ দয়াল থাক। যদি কেহ ব্যথাহারী থাক, যদি কেহ অন্তর্য্যামী থাক, তবে এস, একবার এস। আসিয়া আমায় উদ্ধার কর। শুনেছি, তুমি নাকি করুণাময়! জীবের প্রতি তোমার অপার করুণা। তোমার করুণায় যে আমরা চলিয়া-বলিয়া বেড়াই, একথা পূর্ব্বে শুনিলেও তাহা তেমন করিয়া বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এখন তোমার করুণাতে বুঝিয়াছি, তোমার করুণা বিকাশের এ অপূর্ব্বকৌশলে বলিতে শক্তি পাইয়াছি যে—

"যদিও মোরা পতিত, (তবু) তুমি মোদের পতি ত?"

মনে একথা জাগে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ্ ফাটিয়া জল ঝরে। চক্ষে আগেও জল ঝরিয়াছিল—সে তখন পতনের ভয়ে, আঘাতের চোটে, আত্ম

অতৃপ্তির জন্য। এখন কিন্তু প্রভু তোমার করুণা দেখিয়া প্রাণ গলিয়া গেল। অধমকে, পতিতকে, ভ্রান্তকে উদ্ধার করিবার জন্য তোমার এ বিচিত্র কৌশল দেখিয়া প্রাণ যে গলিয়া গেল। নয়ন যে দরদর বেগে ঝরিতে লাগিল। অবশ বাহু কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে উর্দ্ধ বাহু হইল,—রসনা যেন কি অপূর্ব্ব আস্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিল। তাই না তখন বাষ্প গদগদ কণ্ঠ হইতে প্রতিধ্বনিত হয়—

অধমে কর করুণা।

করুণা কর, করুণাময়! দারুণ হৃদি যন্ত্রণা॥
তোমার আদেশ ভুলে, বিপথে এসেছি চলে।
বুঝি নাই, ভাবি নাই হইবে এত লাঞ্ছনা॥
কম্পিত শঙ্কিত কায়, পরিত্রাণ নাহি পায়,
বিভীষণ রিপুগণ সবলে করে তাড়না।
অতৃপ্ত চঞ্চল প্রাণ, হতাশেতে ম্রিয়মান,
দেখি চোখে চারিদিকে আঁধার ঘন বরণা॥
তাই গো পতিত জন, কাতরে করে রোদন,
দাও তারে পদধূলি করিয়ে ত্রুটি মার্জ্জনা॥

এমনি করিয়া যখন প্রাণ কাঁদে, তখনই যে করুণাময়ের অপার করুণার সন্ধান পাওয়া যায়। তখনই এই বিশ্ব মধুময় হইয়া উঠে। সকল অভাব দূর হইয়া যায়, সকল অসম্ভব লয় হইয়া যায়। জ্যোতির্ম্ময়ের পদনখচ্ছটায়—অন্ধকার কোথায় পালাইয়া যায়; পূর্ণানন্দে—অবসাদ ও নিরানন্দকে গ্রাস করিয়া ফেলে। অতৃপ্তির উচ্ছৃঙ্খল ভাব কাটিয়া যায়—তৃপ্তির নয়নানন্দকর—চিত্র ফুটিয়া উঠে। তখন সে চিত্র যে দেখে, সেই মুগ্ধ হইয়া, যুক্তকরে অবনত-মস্তকে বলিতে থাকে—

"নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি, অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি,
অন্তরে বাহিরে হেরি নিরখি তব রূপ মনোহর।"

এ জগতে এভাব জাগাইবার জন্য তো এসেছিলে প্রভু এই বঙ্গে। সে তো ৪৩২ বৎসর মাত্র। পতিতকে, ভ্রান্তকে, কি করিয়া নিজবক্ষে টানিয়া লইতে হয়, তাহা দেখাইবার জন্য তো করুণাময়—তুমি অনর্পিত করুণা বিতরণ

করিয়াছেন। জগতের অসদ্ভাব দূর করিয়া তুমি না সতের প্রতিষ্ঠা করেছিলে প্রভু! তাই বলি আজ আবার কাতরপ্রাণে বলি,—ওগো! যে যেখানে আছ,—সকলে সমস্বরে প্রাণে প্রাণে তেমনি করিয়া একবার বল—"প্রভু! অধমে কর করুণা!" জগতের অসদ্ভাব দূর হউক, সতের প্রতিষ্ঠা হউক। আর প্রভুর অনর্পিত করুণার পরিচয় পাইয়া তৃপ্ত শান্ত জগৎবাসী, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার জয়োচ্চারণ করিতে করিতে ঘোষণা করুক :—

এ কি অপূর্ব্ব জীবের ভাগ্য নদীয়া-নিধি সম্ভব ;
আপনি কেঁদে পাপী তরায় এ কি লীলা অভিনব।
তাঁহারে ভুলি মাখিয়া ধূলি মানব মোহে মাতিল—
দেখিয়া নিজে কাঙ্গালী সেজে তাহারে প্রেম যাচিল।
সাধ্য-সাধন নিগূঢ়তত্ত্ব অনর্পিত করুণা সে—
গৌর না এলে এ মহীমণ্ডলে সে রস পাইত কে ?

৪—"আমায় নিয়ে চলো।"

—:•:—

শুনেছ কি কেহ শ্রবণে, যখন কোন বালক পথের পাশে দাঁড়াইয়া, গমনোদ্যত-পিতার হাতখানি ধরিয়া আধ আধ, সুধামাখা-স্বরে বলিতে থাকে—"বাবা! আমায় নিয়ে চলো।" দেখেছ কি কেহ নয়নে,—মুমূর্ষ প্রায় কোন কোন ভক্ত যখন, সানন্দচিত্তে, সহাস্যে, ভগবানের নাম করিতে, করিতে পরিপার্শ্বস্থ পরিজনগণকে ক্ষীণকণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলেন—"এইবার আমায় পতিতোদ্ধারিণী সুরধুনীতীরে নিয়ে চলো।" বুঝেছ কি কেহ প্রাণে প্রাণে সে বেদনা, যখন কোন পতিব্রতা, প্রবাসযাত্রী স্বামীর করধারণ করিয়া বাষ্প গদ গদ কণ্ঠে আবেদন করে—"আমায় তোমার সাথে নিয়ে চলো!"

যদি কেহ ইহা দেখিয়া থাক, যদি কেহ ইহা শুনিয়া থাক, যদি কেহ ইহা বুঝিয়া থাক, তবে ইহা কি বলিয়া দিতে হইবে যে, মানুষের প্রাণে এমন একটা না একটা অবস্থা আসে, এমন একটা না একটা ভাব আসে, এমন একটা না একটা আকুলি-ব্যাকুলি উপস্থিত হয়—যখন সে আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কূল-কিনারা না পাইয়া, ঐ বালকের মত, ঐ ভক্তের মত, ঐ পতিব্রতার মত, তদ্গত

প্রাণে, যেন কোন্ আপনার জনকে, কোন্ চিরপরিচিত অতি প্রিয়জনকে, কোন্ অসহায়ের সহায়, নিরুপায়ের উপায়, হতাশের আশা, নিরানন্দের আনন্দকে—উদ্দেশ করিয়া বলিতে থাকে—"ওগো! কে আছ দয়াল, কে আছ দীননাথ, কে আছ পতিতপাবন, আমার তোমার সাথে সাথে নিয়ে চলো।"

"শুনেছি তুমি দয়াময়! ভাবি নাই তব অপার করুণার কথা। শুনি নাই, তোমার মধুর পবিত্র নাম। মানি নাই তোমার আদেশ, তাই আজ নাথ এমন করিয়া বিপথে চ'লে এসেছি। আপন ইচ্ছায় এপথে আসি নাই, সঙ্গদোষে চক্রান্তে পড়িয়া, মন্ত্রণায় ভুলিয়া, দলে মিশিয়া—এপথে আসিয়াছি। যতক্ষণ আলো ছিল, ততক্ষণ জনতার স্রোতে নানারূপ লীলাখেলায় বেশ ভুলিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমে সন্ধ্যা আসিল, রজনীর অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিল। এখন তো আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। তাই এখন বাহিরের আকর্ষণ ছুটিয়া গেল, নিজের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম—একি? এযে পথ ভুল হইয়াছে। কোথা যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম—আর এখন কোথায় আসিয়াছি? আলো থাকিলে না হয় পথ দেখিয়া যাইতে পারিতাম, এযে দারুণ অন্ধকার! হায় হায়! সঙ্গ দোষে পড়িয়া—আত্মজ্ঞান ভুলিয়া, একি হইল? সঙ্গীরা তো এখন গা-ঢাকা দিয়াছে—তবে আর কাহার সহিত চলিব? কে আমায় পথ দেখাইবে?"

রজনী সমাগমে এ কি পরিবর্তন! দিবা ও নিশার মধ্যভাগে এমনই একটা সচকিত ভাব নিত্য জাগিয়া উঠে। বালক খেলা ছাড়িয়া মার কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ধায়, পশুগণও আপন আপন আবাসে ফিরিয়া যায়। কর্ম্মক্লিষ্ট মানব ঘরে ফেরে। সর্ব্বত্রই একটা সচকিত ভাব এমনি করিয়া নিত্য জাগিয়া উঠে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করিয়া কি কেহ তত্ত্বচিন্তা করিয়াছেন?

যদি করিয়া থাকেন তো বুঝিবেন যে, জীবন ও মরণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি, একথা যখনই স্মরণ হয়, তখনই ঐ দিবা ও নিশার মধ্যবর্ত্তী সন্ধ্যার ন্যায় সচকিত ভাবটা জাগিয়া উঠে। তখন বাহিরের আকর্ষণ ভুলিয়া আপনার কথা, আপন আবাসের কথা মনে পড়ে। দিনের আলো মেঘঢাকা পড়ে, গতিশীল জগতের গতিতে সূর্য্যকে আর দেখা যায় না। তাই অন্ধকার আসে, মনের পরিবর্ত্তনশীল গতিতে যখন জ্যোতির্ম্ময়ের শুভ্র জ্যোতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া

উহার বিপরীত গতিতে চলিতে থাকি, তখনও তো ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে পড়িয়া যখনই মানবের প্রাণে এই সচকিত ভাব জাগে, তখনই তার আপনার কথা মনে পড়ে—আপন আলয়ের কথা মনে পড়ে—আর. আপনার তিলমাত্র স্বাধীনতা নাই বুঝিয়া যিনি বিশ্বচালক, যিনি বিশ্বপালক, যিনি অগতির গতি তাঁহার উদ্দেশে বলিতে থাকে—"ওগো! আমায় নিয়ে চলো।" আর তার সঙ্গে সঙ্গে, তাহার মর্ম্মের মাঝে, দারুণ অনুতাপবাণী শেষ চৈত্র মাসের বিকট প্রান্তরের মত যেন হাহারব উত্থিত করিয়া ঘোষণা করে—

কি দশা হয়েছে দেখ আজি নাথ তোমারে ভুলেছি বলে।
কি কটু বিষের বিষম জ্বালায় জীবন যেতেছে জ্বলে॥
নিমেষে নিমেষে শত বিক্ষত বিরাম না পাই কভু।
চঞ্চল প্রাণ আহ্বান করে শত যন্ত্রণা তবু॥
পারিনা পারিনা পারিনা রোধিতে এই অসহন ক্লেশ।
শত ধিক্কারে বুক ফেটে যায় আপনারে করি শ্লেষ।
রূঢ় বাসনার আপাত মধুর কুহক সলিল পানে।
মিটিয়া যেটেনা দারুণ পিপাসা দ্বিগুণ করিয়া আনে।
আর কতদিন বহিব এমন বেদনা পূর্ণ-প্রাণ?
হবে নাকি শেষ এ মোহ বিকার পাবনা কখন ত্রাণ?
জান যদি প্রভু আমার মতন অসার অধম প্রাণী,
ছলনায় ভুলে ভুলিবে তোমায় সহিবে অশেষ গ্লানি,
তোমার অসীম জগত মাঝারে কেন গো আনিলে ভবে।
পতিত যেজন চিরদিন সে কি আঁধারে পড়িয়া রবে?

* * * *

নানা—প্রভু তুমি দীন দয়াময় তুমি যে নিখিল-প্রাণ।
আমি অবহেলে ধরি নাই শিরে তোমার পূজার দান।
শ্রবণ করিনি তোমার নিষেধ ক্ষণিকের সুখ আশে।
সতত হৃদয় তাই গো এখন নয়ন সলিলে ভাসে।
মনে করি প্রভু ডাকিয়া তোমায় কহিব সকল কথা।
বলিব তোমায় যে দশা হয়েছে পেয়েছি যে কত ব্যথা।

বলিতে বলিতে বলিতে পারিনা এমনি বিকৃত মন।
ক্ষণেকের তরে নাহি রহে ধীর পরে নীচ আবরণ॥

*　　*　　*　　*

তাই হেন দশা হয়েছে গো আজ রয়েছি তোমায় ভুলি।
কতকাল আর রহিব এমন পাবনা চরণ ধূলি?
আলয়হীনের তুমি যে আলয় তৃষিত জনের বারি।
তার' তার' প্রভু অধম তাপিতে হে চির-করুণা-কারী!
লও তারে আজি তোমার করিয়ে যে জন তোমাতে নহে।
দেখো যেন আর ভোলে না কখন তোমার হইয়া রহে॥
প্রতি পলে পলে সর্ব্বথা যেন সন্ধান পায় প্রাণ।
আছ তুমি প্রভু বিশ্বব্যাপিয়া হ'য়ে "অণোরণীয়ান॥"
পূর্ণ হউক তোমার ইচ্ছা তোমার জগত মাঝে।
যেন এ মহান্ তত্ত্বরাগিনী নিশিদিন হৃদে বাজে।

৫—একি হ'ল প্রভু।

—:•:—

এ আবার কি হ'ল প্রভু? এ তোমার আবার কোন্ পরীক্ষা? এ কি ছলনা,—না, পায়ে ঠেলা? হে দয়াল! হে! ভাবনিধি বল, এ আবার কেমন খেলা? হায়! কি অপরাধ করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারি নাই—কিন্তু আমি যে শত অপরাধী ইহা যে প্রাণে এখন জাগিতেছে। আর ভাবিতেছি—হায়! কি করিলাম। কি ছিলাম—আর কি হইতে চলিলাম। ঊর্দ্ধমুখে উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে করিতে—পশ্চাৎ ফিরিয়া এ কোথায় পড়িলাম। অধঃপতিত, আজ আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারেনা, নিজজনের নিকট তেমন করিয়া আর প্রকাশ করিতে সাহস পায় না—বলিতে কি, মাথা তুলিয়া, চোখ মেলিয়া চাহিতেও ভয় পায়। অপরাধীর মত, অবনত মস্তকে, যুক্তকরে, সচকিত অন্তরে, সাশ্রুনয়নে—তাই আজ প্রাণের ভিতর হইতে ফুকারিয়া উঠিতেছে—মনে মনে সদাই এ আর্ত্তনাদের ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হইতেছে—

"আমি কি আর ক'ব।
যদি অপরাধ কিছু করে থাকি পদে
যদি না কর প্রভু, ক্ষমা;
তবে দিও হে দিও, পরাণ প্রিয়
বেদনা নব নব।"

বল, বল, প্রভু! দয়া ক'রে বলে দাও আমায় কেন এমন হ'ল। মনে পড়ে, একদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমায়, উচ্ছ্বলিত ভাগীরথীতটে, কোটিকণ্ঠের মধুরোল,—"হরিবোল"—এনেছিল প্রাণে কি নব আনন্দ, দিয়াছিল নয়নে আঁকিয়া কি শান্তোজ্জ্বল মধুর চিত্র! দেখেছিনু প্রভু! দেখেছিনু যাহা, দিয়েছিনু প্রভু ঢেলে তাহে প্রাণ,—আর গলেছিল মোর হৃদয় পাষাণ! সেই দিন, প্রভু সেই দিন, বিজনে বসিয়া বিরলে, হৃদয় ভাসায়ে আঁখিজলে,—গদগদ কণ্ঠে গেয়েছিনু এই গান—

এস, এসহে মম হৃদয়ে—
এস সুন্দর, এসহে শান্ত, এসহে কান্ত হৃদয়ে!
প্রভো! চাহিনা ক্ষণিক সুখের রাজ্য তোমার বিশ্ব মাঝারে,
দিওনা মত্ত চিত্ত বিকার রাখিতে বদ্ধ আঁধারে।
কর সমর্থ করিতে ব্যর্থ ইচ্ছা স্বার্থ নাশিনী,
যেন দন্ত প্রহারে করে না ভ্রান্ত রিপুর বিষম নাগিনী।
প্রভো! জীবন প্রদীপ নিভিবে যখন কালের বক্র বাতাসে,
যেন শূন্য হৃদয় মন্দির লয়ে না রহি মগ্ন হতাশে।
(তোমার) দিব্যজ্যোতির শুভ্র আলোকে রুদ্ধ আঁধার নাশিয়
অর্গলহীন মুক্ত দুয়ারে দাঁড়াও বারেক হাসিয়া।
এস প্রিয়! এস মঙ্গলময়—
এসহে! কান্ত হৃদয়ে!
এস, এসহে মম হৃদয়ে॥

এ গীত থামেনি এখানে।—বুঝি, ছুটেছিই এ স্বরল ভেদিয়া গগন, প্লাবিয়া পৃথিবী। উঠেছিল প্রতিধ্বনি তার প্রতি কেন্দ্রে কেন্দ্রে। হেসেছিল নব শিশু জননীর কোলে, নিদ্রিত স্বপনে—শুনি সেই স্বর! ফুটেছিল কুঞ্জ কাননে

সে ধ্বনি প্রবাহে, চারুকিশলয় মাঝে, কুসুমকোরক। উঠেছিল শিহরিয়া সে নদ তরঙ্গে, ধ্যান স্তিমিতনেত্রে, সাধক-চিত্ত। দূর কাননের কোলে গেয়ে ছিল পাখী গান—সে মধুমুরলী তানে। গলে গিয়াছিল বুঝি শশী সে বীণা ঝঙ্কারে, ঢেলে দিয়াছিল ধরা প'রে সঞ্চিত যা ছিল তার—অমিয় জ্যোছনা।

আহা! প্রকৃতি এই গীতি চল চল ভাবে যখন বিভোর, তখন এ তরল প্রাণে সরল কথাই জাগিয়াছিল। ভেঙ্গে ছিল তখন তন্দ্রা, দূর হয়েছিল তখন আলস্য; আর তখন থেকে থেকে, কেঁদে কেঁদে, ফুলে ফুলে—চলে ছিলাম—বড় সাধে বড় আশায়, কাতরভাবে বলে ছিলাম—

"হরি! তোমাতে যখন মজে আমার মন
তখনি ভুবন হয় সুধাময়।"

আবার কখন বা উর্দ্ধবাহু হইয়া যেন শূন্যে, সুনীল গগনতলে তোমার পাদোঞ্জল মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া সহাস্য আস্যে—নাচিতে নাচিতে বলিতাম—

"তোমায় ভালবেসে মেটেনা সাধ আরো ভালবাসা চাই।
[আমায়] দাও ভালবাসা পূর্ণ কর আশা একেবারে ভাবে মেতে যাই।
চোকে চোকে বুকে মুখে রাখ সতত,—
(তুমি) আছো তাই আছি, বাঁচাও তাই বাঁচি,
(তুমি) না থাকিলে আমি মরে যাই।'

বাহিরের এভাব যখন ভিতরে প্রবেশ করিত, তখন মুদিত নয়নে, হৃদয় মন্দিরে তোমার মধুর মনোহর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, নয়নজলে অভিষেক করিতে করিতে সানন্দে চিন্তা করিতাম—

"এবার, নাথ! তুমি আছ, আর আমি আছি,
মাঝে কোন বাধা নাই ভুবনে।"

এমনি করে, নিয়েছিলে প্রভু! পতিতে তুলিয়া একদিন। শ্রবণে পশে ছিল তব বীণা-তান—মজেছিল তাহে প্রাণ—সে যে অব্যর্থ সন্ধান্। কিন্তু তারপর। —তারপর, কোন অপরাধে, বল প্রভু আবার আমারে তাড়ালে? ধুলাখেলা নিয়ে ভুলিয়া ছিলাম, পাছে তাহে তোমারে ভুলে যাই তাই না তুমি দয়াময়রূপে একে একে সব আপন কাছে লইলে। একি কম কৃপা? কার ভাগ্যে এত কৃপা-লাভ ঘটে, প্রভু? যদি আমি কভু তোমারে, ভুলে যাই তাই না আমার

খেলার সামগ্রীগুলি তোমার কাছে নিয়া রাখিলে! যদি খেলার স্মৃতি মনে পড়ে তবে তো সেগুলির কথা মনে পড়িবে। আর সেগুলির কথা মনে পড়িলে তোমার রাতুলচরণ চিন্তা করিতেই হইবে, কারণ তোমার সহিত যে সকল স্মৃতিই বিজড়িত—তুমি যে পরাণ-প্রিয়।

এমন করিয়া কাছে লইয়া, আবার কেন বিদায় দিলে প্রভু! আবার কেন নব সাজে নব খেলায় ভুলাইবার প্রয়াস পাইলে প্রভু! একি ছলনা—না, পরীক্ষা! যদি ছলনা হয়—তো বলি, প্রভু! অতি কাতরভাবে বলি, এ ছলনা কি তোমার লীলাময় নামের স্বার্থকতা, না একেবারে পায়ে ঠেলা? যদি ইহা পরীক্ষা হয় তো জিজ্ঞাসা করি, একি বিষম পরীক্ষা! একি শুধু পরীক্ষা, না দুর্ব্বল চিত্তের দুরবস্থা সাধন? ইচ্ছাময়! একি তোমার ইচ্ছা? এও কি তোমার মনে ছিল? এত যদি মনে ছিল প্রভু! তবে কেন দয়া ক'রে ছিলে? এখন যে ভয় হয়, প্রতিপদে পদে শঙ্কা হয়—এবার বুঝি তোমার করুণায় বঞ্চিত হ'লেম। তাই বলি, করযোড়ে বলি, মিনতি পূর্ব্বক বলি—

"এ খেলায় ভুলাতে যদি চাওহে এ দীনে,
না ভুলিয়া দীন থাকিবে কেমনে,
আমি বুঝিব খেলিব, খেলনা ছাড়িব
পাইলেও সেই তোমা ধনে।
(খেলা বুঝি না নাথ, খেলা বুঝায়ে দাও!)
(তোমায় আমায় করি খেলা, তেমন খেলা বুঝায়ে দাও!)

আনন্দ নগর।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত উকীল।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

না।—অতি সুন্দর কথা। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, প্রত্যেক জীব ভগবানের অংশ এ জ্ঞান কিরূপে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে? এবং তিনি উপাস্য আমি উপাসক প্রভৃতি জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার উপায় কি?

প্র। ভগবচ্চিন্তায় একান্তমনা হইলে এইরূপ জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে, এবং প্রাণে শান্তি পাইবে।

না। আপনার এই ভাল কথা শুনিতে থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে আমার মন যখন স্বার্থের চিন্তায় দৌড় দিতেছে তখন ভগবচ্চিন্তায় একান্ত মনা হইবার কি কোন উপায় নাই?

প্র। হুঁা আছে বৈ কি। সর্ব্বদা ভগবানের নাম জপ করা।

না। নাম করিলে কি হইবে।

প্র। এক স্থানে বহুলোক বসিয়া আছেন, যদি তুমি তাহাদের মধ্যে যদু নামক ব্যক্তিকে ডাক তাহা হইলে সেই যদু তোমার ডাকের উত্তর দিবে অপর কেহ দিবে না। আর যদু এই নাম বলিলে যদুর রূপ, বয়স প্রভৃতি যদুর সম্বন্ধে তোমার যাহা কিছু জ্ঞান আছে সমস্ত তোমার মনে পড়িবে, ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, নাম ও নামী কোন ভেদ নাই নাম বলিলে যে ব্যক্তির সেই নাম তাহাকে বুঝায়। সেইরূপ জীব যে নামে ভগবানকে ডাকেন সেই নাম লইলে সেই নামের সঙ্গে ভগবান্‌কে বুঝিবেন। সুতরাং ভগবানের নাম ও ভগবান্ এই দুইএর মধ্যে প্রভেদ নাই।

না। নাম যখন করিব তখন যে অন্য চিন্তা আসিয়া মনে পড়ে। তখন নাম মুখে উচ্চারিত হইতেছে কিন্তু মন অন্য চিন্তা করিতেছে। অন্য চিন্তা আসিলেত একান্ত মনে ভগবচ্চিন্তা হয় না। তাই বলি মন ভগবচ্চিন্তায় নিবিষ্ট রাখিবার উপায় কি?

প্র। অনেক অনেক সাধু মহর্ষি প্রভৃতি অনেক অনেক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তবে আমি একটী সহজ উপায় জানি। যাঁহার ইচ্ছা হইবে তিনি সাধু মহর্ষিগণের নিকট হইতে সেই সকল উপায় সংগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু যে উপায়টী আমি জানি তাহা এই—যখন মনে মনে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিবে সেই সময়ে তোমার কাণ এরূপ খাড়া করিয়া রাখিবে যে প্রত্যেক উচ্চারিত নাম কাণ শুনে। যদি কখন বিপর্য্যয় ঘটে অমনি আবার কাণ খাড়া করিয়া শুনিবে নাম উচ্চারিত হইতেছে কি না; কাণকে প্রহরী স্বরূপ রাখিবে। এইরূপ করিলে মনে আর অন্য চিন্তা আসিবে না। এইরূপে নাম জপে অভ্যস্ত হইলে একান্ত মনে ভগবানের নাম জপ সম্পাদিত হইবে।

না। এইরূপে নাম জপ করিলে তাহাতে কি ফল হইবে ?

প্র। ভগবানে শ্রদ্ধা তৎপর রতি এবং তৎপর ভক্তি ক্রমান্বয়ে উদয় হইবে। তৎপর হৃদয় ভগবৎ প্রেমে গলিয়া যাইবে। সতত ভগবৎ সান্নিধ্য হৃদয়ে অনুভব করিয়া কখন হাস্য কখন ক্রন্দন কখন গান কখন বা নৃত্য করিতে থাকিবে।

না। আচ্ছা নাম জপে ঐরূপ আনন্দ লাভ হইলে অপর জীবের প্রতি তাঁহার আচরণ কিরূপ হইবে।

প্র। তিনি নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দের জন্য অপরকে সামান্য রূপ ব্যতিব্যস্তও হইতে দিবেন না। প্রত্যুত অপরের সুখ-স্বচ্ছন্দ নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ বিবেচনা করিয়া যাহাতে অপরের সুখ-স্বচ্ছন্দ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। যদি জীব অপরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয় তবে জগতে কি কোনরূপ অত্যাচার অবিচার পাপ তাপ প্রভৃতি ক্লেশকর ব্যাপার আর ঘটিতে পারে ? তখন আনন্দ শান্তি জগতে বিরাজ করিবে, তখনই প্রকৃত ভগবৎ প্রেম ভগবৎ সেবার কার্য্য সাধিত হইবে। ভগবান্ মহা-জ্ঞানী, মহা-বিবেচক, মহা দয়ালু ইত্যাদি অশেষ গুণ-রাশির আধার। সামান্য মনুষ্যের সেবা করিলে সেবককে সেই মনুষ্য কতনা উপকার করেন এক্ষণে ভগবান্‌কে জীব যদি ভালবাসেন, সেবা করেন পরম মঙ্গলময় ভগবান্ রাশি রাশি মঙ্গল তাঁহার জন্য বর্ষণ করিতে সদা প্রস্তুত।

না। আপনার সুমধুর উপদেশে বুঝিতে পারিয়াছি ভগবান্ সচ্চিদানন্দ। এ মূর্ত্তি নিরাকারের সামিল। এ মূর্ত্তি আয়ত্ত করিবার উপায় কি ?

প্র। অবশ্য এ মূর্ত্তি দর্শন যোগ্য বা কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। তিনি অতীন্দ্রিয় এ কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। তিনি অনুভবের বিষয়। মনুষ্য সাধনার বলে এইরূপ আয়ত্ত করিতে পারেন।

না। ওকথা বড় দূরের কথা। বুঝিলাম ভগবানের দর্শন যোগ্য রূপ নাই। নিরাকার ভগবানের গুণ কার্য্য ভাবিতে পারা যায়। যদি কোন লোকের ভাল গুণ ভাল কার্য্য জানিতে পারি তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ মন কি ব্যাকুল হয় না ? শুদ্ধ গুণ ও কার্য্য ভাবিয়া ভগবানের সম্বন্ধেত পূর্ণ জ্ঞান হয় না। সেই অতীন্দ্রিয় দর্শন যোগ্য না হইলেত প্রাণ মনের ব্যাকুলতা নিবারণ হয় না। আর যদি মনুষ্য বুঝিতে পারে যে এই রূপবান পুরুষ সকল গুণ ও

কার্য্যের আশ্রয়। তবে সেই পুরুষের সাধনা বা চিন্তা কি জীবের সহজ সাধ্য নহে? নিরাকার ভগবানের চিন্তা অপেক্ষা এইরূপ সাকার উপাসনায় জীবের চিত্ত কি অধিকতর বদ্ধমূল হইবে না? যদি অধিকতর বদ্ধমূল হয় তবে তাহা হইতে অধিকতর মঙ্গল অধিকতর সুফল কি ফলিবে না? আর বুঝিয়াছি ভগবান্ মহা-জ্ঞানী, মহা-বিবেচক, মহা-দয়ালু। তিনি কিসে জীবের মঙ্গল হইবে তাহার জন্য সতত সচেষ্ট। মনুষ্যের মন বুদ্ধি যেরূপ সামান্য তাহাতে সর্ব্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় পদার্থের ধ্যান কিরূপে করিবে?

প্র। বাপু তোমার কথায় বড় প্রীতি পাইলাম। সময় মত কথা কহা উপযুক্ত; এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া আমার প্রাণের কথা কহিবার অবসর পাইলাম। ভগবান্ জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন মনুষ্য তাঁহার সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে তাঁহার অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তির কিছু কিছু আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ এই জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি এই জীবের যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় তাহার জন্য নিত্য চেষ্টাশীল। জীব তাঁহার জিনিষ। তাঁহাতে জীবের নির্ভরতা থাকিলে জীবের কোন ক্লেশ হয় না কোন দুঃখ হয় না। কিন্তু জীব এই সংসারে থাকিয়া নানা কারণ বশতঃ সেই নির্ভরতা হারাইয়া থাকে। মনুষ্য তাঁহার অধীন, তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতেছে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতে তাঁহার কার্য্য করিবার সাধ্য নাই এ জ্ঞান হারাইয়া আপনি কর্ত্তা, আমার চেষ্টায় সকল কার্য্য হইতেছে এইরূপ সংস্কার বদ্ধ হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ এই সংস্কারে এরূপ জড়ীভূত হইয়া পড়ে যে তাঁহার চিত্ত ভগবানের দিকে আর ধাবিত হয় না। ভগবান্ আলোক স্বরূপ। সেই আলোকের সাহায্যে মনুষ্য আপন গন্তব্য সুপথ সকল দেখিতে পান। গাঢ় সংস্কারে ঐ আলোক যখন আচ্ছন্ন হয় তখন জীব ঘোর অন্ধকার মধ্যে পড়ে। অন্ধকার মধ্যে আপন গন্তব্য সুপথ চিনিতে পারে না। সুপথ হারাইয়া নিরন্তর বিপদ মধ্যে পতিত হয়। তখন জীবের রক্ষার উপায় নাই। স্ব সুখের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া অধর্ম্ম, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সময় সনাতন ধর্ম্মের অবসাদ হইতে থাকে অধর্ম্ম আপন দলবল সহ জীব রাজ্যে আপন অধিকার পূর্ণ রূপে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়ে ভগবান্ স্বয়ং প্রকট না হইলে সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার হয় না। মনুষ্য মধ্যে শান্তি স্থাপন হয়

না অধর্ম্মের নাশ হইয়া মনুষ্যের দৃষ্টি সেই পূর্ণ আলোকের দিকে ধাবিত হয় না। এই বৃহৎ ব্যাপার তিনি নিজে সম্পন্ন করিতে পারেন, অন্যের দ্বারা সম্ভব হয় না। বহু বহু বার সংসারে এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক বারে তিনি এক এক রূপে পৃথিবীতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। সকল বারে যে পৃথিবী সমান দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা নহে। কোন বারে অধিক কোন বারে বা তদপেক্ষা স্বল্পরূপে দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন সেই সময়ে পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। মনুষ্যগণ পরস্পর অসূয়া পরবশ। স্বার্থ রক্ষাই তাহাদের একমাত্র চেষ্টা। এই চেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া জীবগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্রোহাচরণে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইত না। সনাতন ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম্ম নাশকারী অসুরগণ অধর্ম্ম সঙ্কুল কার্য্য দ্বারা মনুষ্যগণের অতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। জীব সংহারকারিণী অস্ত্র বিদ্যার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছিল। অধার্ম্মিকের সংহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজ আচরণের দ্বারা সনাতন প্রেম ধর্ম্ম পৃথিবীতে স্থাপন করা প্রয়োজনীয় হইয়াছিল এ ধর্ম্মের প্রসারে সংসারে অসূয়া দূরীভূত হইবে, অধর্ম্ম দলবলসহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অপরকে সুখী করিবার চেষ্টা জীবের একমাত্র কার্য্য হইবে। ভগবান ইচ্ছাময় তিনি মনুষ্য দেহ অবলম্বন করিয়া অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। অধার্ম্মিকগণের সংহার করিলেন। বেদ ব্যাসাদি মহর্ষিগণে শক্তি সঞ্চার করিয়া সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার করিলেন নিজ আচরণ দ্বারা পরম দুর্লভ প্রেম ধর্ম্মের সূত্রপাত স্থাপন করিলেন। তিনি চিদংশে শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং আনন্দ অংশে শ্রীরাধারূপে প্রকট হইলেন। এই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মধ্যে যে প্রেমভাব প্রকটিত হইয়াছিল তাহা অতি দুর্লভ। এতথ্য প্রকাশ করা তাঁহাদেরই সাধ্য অপরের পক্ষে অসাধ্য। যাঁহার হৃদয়ের ঐ প্রেমের আভাস মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে তিনিই ধন্য তিনিই আনন্দে মাতোয়ারা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই সংসারে প্রত্যেক পদার্থে প্রত্যেক জীবে সেই চৈতন্য-রূপী ভগবানের অংশ বিরাজ করিতেছে। অজ্ঞান ও সংস্কার গাঢ় অচ্ছাদনরূপে সেই চৈতন্য পুরুষকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অজ্ঞান বা সংস্কার যে জীবের কম, চৈতন্য পুরুষের প্রকাশ সেই জীব মধ্যে অধিক, যাঁহার অজ্ঞান বা সংস্কার

বেশী চৈতন্য পুরুষের প্রকাশ সেই জীব মধ্যে স্বল্প। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতে যখন প্রকটিত হইলেন অজ্ঞান বা সংস্কার তাঁহাকে কোনরূপে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। ভগবান্‌কে আচ্ছন্ন করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাঁহার মায়িক দেহ মধ্যগত চৈতন্য বা সচ্চিদানন্দ আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধ্যগত চৈতন্য বা সচ্চিদানন্দ এক। ঐ দুই চৈতন্যের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান বা আচ্ছাদন নাই সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধ্যগত চৈতন্য বা সচ্চিদানন্দের যে শক্তি যে গুণ মায়িক দেহাবলম্বী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যগত সেই শক্তি সেই গুণ। এই হেতু তত্ত্বদর্শীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ এই আখ্যা প্রদান করিবার অন্যতম কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তি অবলম্বন করিয়া অশেষ প্রকার অলৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন। এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ। তাঁহাকে চিন্তা বা সাধনা করিলে চিত্ত তন্ময়াত্মক হইবে, অপার আনন্দ লাভ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার যদিও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দেহ ভেদ তথাপি উভয়েই যখন সচ্চিদানন্দ তখন উভয়ে এক। জগতে প্রেমলীলার আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য ভগবান্ দুই মুর্ত্তিতে জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ হইতে নীলাভা সমুদ্গীর্ণ হইয়া শরীরটী যেন নীল বর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে। মুখশ্রী এরূপ সুশোভন যে জীব যে কেহ হউন না তাঁহাকে দেখিলে বিমোহিত হইতে হইবে। নেত্রদ্বয় বিশাল, রক্তপদ্মের বর্ণযুক্ত মধ্যে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ তারা দুটী বিরাজিত। অধরোষ্ঠ লোহিতবর্ণ। করতল পদতল যেন রক্ত উদ্গার করিতেছে। দেহটী অতীব সুকোমল সুঠাম। মস্তকের কেশ কুটিল, তরঙ্গায়িত এবং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। পীত বসন পরিহিত। মস্তকে ময়ূর পুচ্ছের চূড়া। গলে বনফুলের অতি মনোহর মাল্য। হস্তে মধুর মুরলী। রাধা সঙ্গে ত্রিভঙ্গ। শ্রীরাধার দেহখানি অতি সুকোমল, সুঠাম, সুশোভন এবং পীতবর্ণ। অধরোষ্ঠ করতল ও পদতল লোহিত বর্ণ। শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য অতুল অপরূপ জীব সংমোহক। মস্তকের কেশ কুটিল কৃষ্ণবর্ণ সুন্দর বেণী পরিণত। চক্ষু দুটী বিশাল,, নীলাভা, মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ দুটী তারা দেখিলে বোধ হইত যেন উহা সরলতা ও প্রেমে মাখান। পরিধান নীল বসন। ইহাঁরা উভয়েই সুন্দর ও সুন্দরীর আদর্শ। যখন শ্রীকৃষ্ণ মধুর মুরলী ধারণ করিয়া রাধা-গুণ গান করিতেন পার্শ্বে

প্রেমময়ী শ্রীরাধা জগন্মোহন প্রেম রসে শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় আপ্লুত করিতেন তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া উঠিতেন তাঁহার দেহের প্রধান গ্রন্থি গ্রীবা ও কটিদেশ শিথিল হইয়া পড়িত। পায়ের উপর পা জড়াইয়া শ্রীরাধার পাশে দাঁড়াইতেন। পায় পায় না জড়াইলে দেহ খানি যেন স্থির রাখিতে পারিতেন না শ্রীরাধার প্রেমের অতুল শক্তি। এ প্রেমে যিনি যখন অভিষিক্ত তাঁহার দেহের গ্রন্থি তখনি শিথিল হইয়াছে। এ প্রেম অপূর্ব্ব জিনিষ। ইহার এক কণায় জগৎ মোহিত, প্রেমময়ীর পূর্ণ প্রেম রস পানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে এইরূপ দেহের বিপর্য্যয় হইবে তাহা বিচিত্র নহে। এইত ভগবানের রূপ কহিলাম। এই রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিলে চিত্ত স্থির হইবে ভগবৎ প্রেম উপলব্ধি করিতে পারিবে।

না।—অতি সুন্দর কথা। এখন বুঝিলাম ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদের উদ্ধার করিবার জন্য আপনাকে আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের এই ঘোর সন্তাপ পূর্ণ জীবনে আজ শান্তির উৎস সৃষ্টি হইল। আঃ প্রাণ জুড়াইল। আপনার আদিষ্ট উপায় অনুসারে আমরা ভগবৎ সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমরা আপন আপন স্ত্রীকে যে ভালবাসি সেই ভালবাসা কি প্রেম?

প্র।—সাধারণতঃ ঐরূপ ভালবাসা প্রেম নহে ঐরূপ ভালবাসার মূল কাম বা স্বসুখের ইচ্ছা। প্রেম ও কামে বিস্তর প্রভেদ। প্রেম নিষ্কাম সুনির্ম্মল, কাম স্বার্থমূলক ঘোর মায়াচ্ছন্ন। প্রেম আস্বাদন করিতে করিতে ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়, কাম আস্বাদনের পর নিবৃত্তি লাভ করে তৎপর নূতন কাম আসিয়া পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে। প্রেম স্বপ্রকাশ কাম স্বার্থ প্রকাশিত। প্রেম অন্ধ নায়কের রূপ গুণ লক্ষ্য করে না, কাম নায়কের রূপ গুণ দেখিয়া থাকে প্রেম অতি সন্তর্পণে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত। কাম নিগ্রহেও নিবৃত্তি লাভ করে না। ভগবানের প্রতি দৃষ্টি যতই কম হইবে মায়া ততই প্রবল হইবে এই মায়া ও স্বার্থের দাস হইয়া মনুষ্য স্ত্রী পুত্রাদির জন্য লালায়িত হয় সুতরাং স্ত্রী পুত্রাদির ভালবাসাকে প্রেম বলা যায় না।

না। আমরা দেখিতে পাই যে যেমন লোক তাহার একটী দল আছে সেই দলের নিকট সেই ব্যক্তি আপন কার্য্যের পোষকতা উৎসাহাদি পাইয়া

থাকেন বস্তুতঃ সমর্থনকারী ব্যক্তি ব্যতীত কার্য্যের পুষ্টি সাধন হয় না। রাধা-কৃষ্ণের ঐরূপ রসাস্বাদন করিবার ও তাঁহাদের প্রেমরস পানের সাহায্য পাইবার কোন দল ছিল কি ?

প্র। হঁা শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ গোপাল এবং শ্রীরাধার আট জন সখী ছিলেন। ইহঁাদিগকে নর্ম্ম সখা ও সখী কহিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যেমন আত্ম সুখ বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ শ্রীরাধিকার নর্ম্ম সখীগণও সেইরূপ শ্রীরাধিকার জন্য স্বসুখ বিসর্জ্জন দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিতা নহেন। এই সকল সখা সখীগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেম-পরিপোষক।

ক্রমশঃ।

প্রেমাবতার।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর।)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

প্রভু বলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের একটী নবানুরাগ বা বৈরাগ্য। অনুরাগ ও বৈরাগ্য একই ভাব। যাহাকে ধরি তৎসম্বন্ধে যাহা অনুরাগ যাহাকে ছাড়ি তৎসম্বন্ধে তাহাই বিরাগ। অপর দিব্যাকর্ষণ বিনা আয়ত্ত বস্তুতে অনুরাগ সঞ্চার হয় না। পুরুষের-ভাব জাগাইয়া দেওয়াই বিদ্যার অভিপ্রেত। জীব মাত্রই ঈশ্বরের দাস—নিত্যদাস !—এই নিত্যদাসত্ব জাগরিত হইলেই বিদ্যা পরাবিদ্যায় পরিণত হয়। প্রত্যেক জীবের লক্ষ্যই পুরুষের-ভাব জাগ্রত করা, জীবের-আত্মবিস্মৃতির পট উন্মোচন করা।

"পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা।" নবরাগের এ বিরহ বড় উচ্ছ্বাসময়। উহা পূর্ব্বস্মৃতি জনিত, সুতরাং সহজ।

"রাই কেন বা এমন হৈলা। কিরূপ দেখিয়া আইলা॥"
"নয়নে বহয়ে ধারা। কহিতে বচন হারা॥"

সবারই ভিতর কানাইর লুকোচুরি খেলা আছে। গোরাচাঁদ নিজ লীলা দ্বারা এই তত্ত্ব ঘোষণা করিতেছেন।

জীবের হৃদয়ে পুরুষের-ভাব-স্ফূর্ত্তি দিতে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন। পুরুষের-ভাব প্রেমপুরীর একমাত্র প্রবেশ দ্বার। শ্রীগৌরাঙ্গ চিরদিনের পর এই অর্গলিত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। গুরুদীক্ষায় তাঁহার সন্দর্শন হয়। তাহাতে পুরুষের-ভাব জাগরিত। পুরুষের-ভাব জাগরিত হইলে নিগূঢ় প্রেম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গর্ভ প্রবেশ বিনা যেমন জীব জন্মগ্রহণ করিতে পারে না, গুরুদীক্ষা বিনা তেমন সে কানাঞির দর্শন পাইতে পারে না। শ্রীগৌর লীলায় এই অংশে আমরা তৎসম্বন্ধে শিক্ষা পাই। কাহা নাই ?—তিনি জীবের অন্তর্ব্বহি বিদ্যমান অতএব তিনি কানাই। তবে তিনি সচরাচর নয়নগোচর হননা কেন ?—না, দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন। শ্রীভগবানের মূর্ত্তিমতী কৃপাস্বরূপ গুরু সে চক্ষুর উন্মীলন করিয়া দেন। জীব শিক্ষা ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দীক্ষা গ্রহণ কার্য্য অপর কোন অভিপ্রায় নাই।

ঈশ্বরের অপরূপ রূপ মেঘ-মাধুরীর বিদ্যুৎঝলক যাহার চিত্তে সকৃৎ না খেলিয়াছে, তাহার পক্ষে পূর্ব্বরাগ অসম্ভব। শ্রবণে উহার সূচনা মাত্র। "দেখা দিয়া লুকাইল"—ইহাই পূর্ব্বরাগের গাঢোচ্ছ্বাস। শ্রীগৌরাঙ্গ নবরাগের বিরহ বুকে নিয়া নদীয়ায় আকুল প্রাণে আগমন করিলেন। লক্ষ্যহারা বিদ্যা গর্ব্বে পরিণত হয়। নবদ্বীপ বিদ্যা গর্ব্বিত, ভক্তি হীন।

বাষ্প-বিরচিত মেঘ সলিল ও শিল উভয় মূর্ত্তিই ধারণ করে। সলিল প্রায়ই শস্যের অনুকূল, শিলা শস্যের প্রতিকূল, নাশক। সলিল পতিত হইয়া মস্তক সিক্ত করে, শিল মস্তক ভাঙ্গে। সলিল সুশীল, শিল দুঃশীল। শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যা সলিলত্ব লাভ করিয়াছে, নবদ্বীপবাসী তদিতর পণ্ডিতগণের বিদ্যা শিলাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু শিলাও মৃদু তাপে সলিল হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বরাগ বিরহের মৃদুস্ফূর্ত্তায় লক্ষ্যভ্রষ্ট বিদ্যামেরা গলিতে আরম্ভ করিল—পথ ধরিল। পণ্ডিত গলান বেশী নয়, কত অজগজ মূর্খ-পাহাড়-শিলাই না জল হইয়া গেল।

"কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি।"

তিলে যেমন তৈল, প্রতি পদার্থে যেমন বিদ্যুৎপ্রবাহ তেমন তদতীত চিদানন্দ প্রেম প্রতি জীবের প্রাণে প্রাণে, এমন কি তরুলতার শিরায় শিরায় প্রবাহিত আছে। প্রেমানুভূতির সহজ সঙ্কেত যথা:—শান্ত সুধীর চিত্তে প্রেম স্মরণ পূর্ব্বক দশ বিশবার উচ্চারণ করুন্—"প্রেম। হা প্রেম। হা প্রে-এ ম্! হা প্রে-এ-এ-এ-ম্!! হা প্রে-'এ-এ-'এ-এ-'এ-ম্।!!—এই ক্রম-দীর্ঘপ্লুতস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে, তৎফলে দেখিবেন আপনার ভিতরে এক চমৎকার আনন্দ লহরী উঠিয়াছে। প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ অশ্রুকম্পপুলকাদির অনুভবে তখন আপনি স্বতঃই বিহ্বল হইবেন। প্রেমের এই সহজ চিত্রটি সিদ্ধপুরুষের মুখাকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

প্রেমস্মরণে যাদৃগ্ভাব, প্রেমসঞ্চারে তদধিক এবং তারপর প্রেমময়ের নাম, গুণ, রূপ ও লীলা চরিত স্মরণে জীব কেমন হইয়া পড়ে, প্রেম ভাবিত জন বিনা কে বর্ণন করিবে!

রাধান্বেষণে কৃষ্ণ বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। প্রেমময়ের করপদনখচন্দ্র-স্পর্শ-সুধায় গুল্ম পাদপবল্লী মুকুলিত ও কুসুমিত হইতেছেন। মানব তনু তদাবির্ভাবে পল্লবিত পুষ্পিত হয় কথা কি?

তদাবির্ভাবানুভূতির সঙ্কেত ভাবুন:—

"কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।"

এই ভাবনা দ্বারা ভক্ত নিষ্কিঞ্চন এবং বিগলিত হইয়া প্রেমের উদ্দেশ পায়। যিনি জীবকে নিষ্কিঞ্চন বানাইয়া প্রেমে দীক্ষিত করেন তিনি জগদ্গুরু প্রেমাবতার।

ব্রহ্মপীযুষ-সমুদ্রোত্থিত তন্নির্যাস মাখনমূর্ত্তি প্রেমময় শ্রীভগবান্—সৌন্দর্য্যের সারভূত, অতি কমনীয় মধুর—মধুর—মধুর।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

শ্রেয়ঃ শ্রেয়োঽপ্যবমগলং সচ্চিদানন্দরূপং
চিদাহ্লাদ মধুরং মধুরং সংকলং ভক্তিবল্ল্যাঃ।

বিক্রীড়িতমিদমনুচরিতমমৃতং যে পিবন্তি প্রমোদাঃ
জীবন্মুক্তাস্তে ইহ ন পুনর্মৃত্যুসিন্ধৌ বিশন্তি ॥

শ্রীভগবানের নাম মধুর, রূপ মধুর, লীলা মধুর। মধুরের সবই মধুর! যিনি নিজ মাধুরী দিয়া চিত্ত মধুর করেন, তিনি মধুময় প্রেমাবতার। ভক্ষ্য দ্রব্য কোমল গলিত না হইলে রসনা তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। রস ও রসনা, উভয় পক্ষই কোমল। কোমল কোমলের নিজ জন। যিনি কোমল করিয়া নিজের করিয়া লন, তিনি প্রেমাবতার। রস কোমল, প্রেম কোমল, কারণ এ দুই সামগ্রী কোমল চিত্তেরই অনুভবিতব্য। কৃষ্ণ কোমল, রাধা কোমল,—কোমলে কোমল মাখা—শ্রীগৌরাঙ্গ। সর্ব্ব জীবের প্রাণ মন মধুময় বানাইতে এই মধুরসায়ন—প্রেমাবতার। এ লীলায় যুদ্ধ নাই বিগ্রহ নাই, উচ্চ ভাষার উপদেশ বা বাগ্মিতণ্ডা নাই। কেবল নাম রসে মজাইয়া পুর্ব্বরাগ জাগ্রত করা তাই, এই মধুর মূর্ত্তিতে ও ভাবে প্রভুর আগমন!

তিনি লুকাইয়া প্রাণ চুরি করেন এবং জীব ব্রহ্ম সম্বন্ধ জাগাইয়া দেন। প্রাণ যারে চায় তিনি লুকোচুরি দ্বারা ভালবাসাটি গাঢ় মধুর করিয়া দেন। সুতরাং বিরহ অতি তপ্ত মধুময়। যে মধু এতদিন কোন কোন জীবের স্বপ্নবৎ, প্রতিভাত আজ সেই—প্রেম মধুর শ্রীভগবান্ স্বয়ং সাক্ষাদ্রূপে আবির্ভূত। আহা, কলি ধন্য! কলি ধন্য! কলি জীব আমরাও ধন্য!

সজনি! কৃষ্ণ শূন্য বৃন্দারণ্য,
জীবন হলো প্রেমশূন্য
আমার যথা গৃহ তথারণ্য
মরিলে বাঁচি এখনি গো সজনি!

বিরহের ঈদৃশ ভাবনিচয় মধুর। মধুর ভাববিগ্রহ মধুরাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ যিনি যুগে যুগে অসুরবধাদিক্রমে ঐশ্বর্য্য ভক্তির স্বরূপ প্রচার করিয়াছেন তিনি অংশাবতার। মধুর ভাবের শক্তি অতুলনীয়া ও বিস্ময়করী। শিশুপাল জরাসন্ধাদির বধে কৃষ্ণ অস্ত্র ও বলপ্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু বৃন্দাবনে বক অঘাদিকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন।—খেলার মত সংহার করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বিনা যুদ্ধে, বিনা বাক্যব্যয়ে, নিজ মধুর ভাব প্রকটন দ্বারা প্রকাশানন্দ প্রভৃতি বিদ্যাবীরদিগকে পদানত ও বশীভূত করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর মূর্ত্তির তরঙ্গে ভালবাসা ও ভাবের অমৃতচ্ছটা দেখিয়াই তাঁহারা বিমুগ্ধ ও অনুগত হইয়াছিলেন। মধুর ভাবের শক্তি অপরিসীম অনন্ত। তুমি কামানের গোলায় পর্ব্বত ভাঙ্গিতেছ কেন, প্রীতি পরশে ও অশ্রু সোহাগে পর্ব্বতটাকে একবারে গলা সোণা করিয়া ফেল, পরিষ্কার হ'য়ে যাউক্। তুমি এই লোকটাকে ধমক্ দিয়া কাজ লইতে ইচ্ছা কর, তা তত ফলপ্রদ হইবে না। বরং লোকটাকে দুটো মিঠা কথা বল, লোকটা একেবারে লোটাইয়া পড়িবে, তোমার পায়ের কাদা হইবে। যাহা করাইবে, সে সানন্দে করিবে। ভক্তের অঙ্গে যখন প্রেমকণার আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহার শক্তি কত!—

মেদিনী কম্পিত নাটে। ব্রহ্মাণ্ড হুঙ্কারে ফাটে॥

"গড়াগড়ি যায় কেহ মালসাট মারে।
কাহার জিহ্বায় নানামত বাক্যস্ফুরে॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ।

প্রেমে দেহধর্ম্মের বিস্মৃতি ঘটে।

"পাসরিলা দেহধর্ম্ম যত দুঃখ শোক"

অতি ক্ষীণ দুর্ব্বলকায় ব্যক্তিও প্রেম সঞ্চারে মহাবলীয়ান হয়, তাহা আমরা সতত প্রত্যক্ষ করি। প্রেমিক অষ্টপ্রহর অনশনে, আনন্দে নৃত্য করিতে পারে। অপ্রেমিক অর্দ্ধঘণ্টা নাচিয়া ক্লান্ত ও শায়িত হয়। প্রেমিকদেহে অনন্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রবেশ করেন। প্রেমিকের দেহ নিত্যানন্দ-নিকেতন।

"যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে।"

সৈন্যবল প্রেমবল লক্ষ গুণ। কাজীর দশা কেমন!—

"কাজীর ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নাগরিয়া।
মহানন্দে হরিবোলে গায়েন নাচিয়া॥"

প্রেম শক্তির উপর শক্তি নাই। প্রেমবদান্য শ্রীগৌরাঙ্গ অনন্ত শক্তি ধর পূর্ণ পুরুষ। অনন্ত তাঁহার দ্বিতীয় দেহ। প্রেমে উত্তম অধমাদি ভেদ বিদূরিত হয়।

"মিলে মুনিবে চাকরে, ঠাকুরে নফরে,
সবে নাচে গায় বলে হরিবোল।
মিলে রাখাল বালকে ভূপাল কৃষকে
গাইছে পুলকে হরিবোল॥

নামে ছোট বড় সকল সমান করে,

বাঁধে প্রাণে প্রাণে একই তারে"—(দুর্গাপ্রসাদ।)

এমন লীলা, এমন প্রেম, এমন খেলা আর কোন যুগে কুত্রাপি হয় নাই, হবেনা। এমন আনন্দের খেলা, সুখের মেলা আমার গৌরনিত্যানন্দ বৈ অপর কেহ পাতেন নাই।

এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপকূলে

চাঁদের হাট মিলাইত গো।—(রাই উন্মাদিনী)

সেই চাঁদের হাট ভারত ব্যাপী হইল। এ হাটে শুধু প্রেমপসরার বিকি কিনি। রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিলাস-বৈভব এই নূতন হাটে বিনা মূলে বিলান হইল। তাই ভাবি প্রেমাবতার আর কোথায় মিলে!

ধূলির রাজা ব্রজের ধূলি!—অঙ্গে মাখিতে অঙ্গ অমৃতময়মান হয়। ব্রজের ধূলি কি?—উহা ভক্তপদরজ।

মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

আবার "ভক্ত মোর অধিষ্ঠান—"এসব বাণীও সত্য।

"সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।

চিত্তশুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদ্গম॥

কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।

কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥"

শ্রীসঙ্কীর্ত্তন মণ্ডপ ঈদৃশ ভাবপরিব্যাপ্ত। সুতরাং তাহার ধূলি অর্থাৎ ভক্ত মণ্ডলীর সংমিশ্রিত বহুপদরেণু মহাশক্তিশালী হয়। উহাই ব্রজধূলি। যাহার প্রেমদানে বিপুল শক্তি সেই অতুলসম্পদ্ ব্রজধূলি আমার গৌরনিত্যানন্দ সর্ব্বত্র পদব্রজে বিচরণ দ্বারা ও ছড়াইয়া দিয়াছেন। সুদুর্ল্লভ প্রেমপ্রাপ্তির এমন সুলভ সঙ্কেত যিনি জগতে শিখাইলেন, তিনিই প্রেমাবতার। ভক্তপদধূলি চিন্ময়। উহার স্পর্শে সকলকে প্রেমাকুল করে। ব্রজের ধূলি বড়ই স্বাদুসুমধুর—

ভাসবার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস।

প্রেম ভকতি মহারাজ ঠাকুর মহাশয় এ ধূলির কতই বাঞ্ছা করিয়াছেন

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।

ভক্তভুক্ত শেষ তিন ধরে মহাবল॥

ব্রজের মহিমা অবিতর্ক্য। উহার সম্বন্ধে কাহার ধূলি, কোন জাতির ধূলি? এবম্বিধ প্রশ্ন উত্থাপনের হেতু নাই কারণ যে সে হউক্, যে জাতি হউক্, ভক্ত মহিমা, ভক্ত শক্তি ও পদরজ গরিমা জাতিনির্ব্বিশেষে তুল্য। শুদ্ধ বস্তুতত্ত্বে অভিন্ন। প্রেমশূন্য নীরস দেহেরই জাতি। প্রেমক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমান। এই ভাববৈচিত্র্য যিনি ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি প্রেমাবতার।

জগতে দুই জাতি সত্য। তদ্ভিন্ন জাতি ধরিলে, জাতি, স্বভাব ও রুচি ভেদে ব্যক্তি গত। সেই দুই জাতি সুরাসুর বা ভক্তাভক্ত। ভক্ত ও অভক্ত— ভগবদুদ্দেশী ও ভগবদ্বেষী। তদ্ভিন্ন জাতি খোঁসা ভূষী। শ্রীগৌরাঙ্গ এই অত্যুদার স্বাভাবিক জাতি ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং অসাড় ফক্কা সংস্কার ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি স্বার্থের নয়, সত্যের ঘোষণা করিয়াছেন। তাই, তিনিই প্রেমাবতার।

"অমুকের জাতি গেল।"—ইহা দ্বারা কে কি বুঝেন জানিনা। অমুকের কি ছিল কেহ বলিতে পারেন না এবং কি বা তাহাকে ফেলিয়া প্রস্থান করিল, তা কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? ভক্তি রসময়ী ও তেজোময়ী; দেহে অপরাধ আসিলে, ভক্তি হীনপ্রভা হন, তাঁহার সে জ্যোতিঃ ও শ্রী তেমন থাকেনা। নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধ বলিয়া যে সকল অপরাধ বর্ণিত আছে, তাহাদের কোন একটীর স্পর্শেই মানব মলিন, নিষ্প্রভ হয়, চিত্তের ভাবস্ফূর্ত্তি হ্রাস পায়।—ইহার নাম "জাতি-যাওয়া"—পতন (Degradation.)

ভক্তের পুত্র ভক্ত, অভক্তের পুত্র অভক্ত হইলে স্বাভাবিক। বংশ পরম্পরায় ভক্তি প্রবাহিত হয়,—এ সত্যের অনুবলে জাতি পুরুষানুক্রমিক হয়। কিন্তু এই স্বভাব ধর্ম্মের মৌলিকত্ব মানিলেও তদন্তরালে এক সূক্ষ্মলীলা স্রোত চলিতেছে। ভক্ত ও অভক্ত এই দুই জাতি উপেক্ষা করিয়া জাতি কোন পৈত্রিক সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করিলে, জন্মান্তর অস্বীকার করা হয়। কারণ আমরা জানি হিরণ্যকশিপুর বংশে প্রহ্লাদ বলী জন্মিয়াছিলেন। আমরা গোবরে (গোময়ে) পদ্মফুল অনেক দেখিতে পাই। শ্রীভগবান্ কাহারও পুত্র নহেন, অথচ পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, তদ্রূপ জীব (ভক্ত) কাহারও পুত্র নহেন, অথচ পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। জীব উৎপন্ন হননা, আগমন করেন। সুতরাং উহার জাতিত্ব পিতৃ মাতৃ কুলধর্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হিরণ্যকশিপু দৈত্য বা

ঈশ্বরদ্বেষী, কিন্তু তৎপুত্র প্রহ্লাদকে দৈত্য বলা অসঙ্গত। এস্থলে পিতাপুত্রের ভিন্ন জাতিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অতএব জাতি কোন পৈত্রিক বৈভব বা পৈত্রিক ভূষণ নয়। যদি জন্ম হইতে জাতির ব্যুৎপত্তি ও উৎপত্তি ধরা যায়, অর্থাৎ যদি কেবল মানুষের জন্মের সঙ্গে জাতির জন্ম হয়, তবে তাহার মৃত্যু সঙ্গে জাতির মৃত্যু ঘটে। স্থূলদেহ পতনের নাম মৃত্যু। সুতরাং স্থূলদেহের সঙ্গেই জাতি চিতায় ভস্মীভূত হয়। এ জাতির দংশনে ভগবদ্বিস্মৃতিরূপ দারুণ বিষজ্বালা হয়। ভগবৎস্মৃতির অমৃতে রক্ষা বন্ধন হইলে সে বিষ উঠিতে পারেনা বরং জল হইয়া যায়। অতএব জাতির দোহাই ভক্তির দোহা মলিন করে। কিন্তু ইহাও সত্য জাত্যাভিমান ভক্তির অসঙ্কারে ঘুচেনা। যিনি এমনি প্রেমবন্যা বহাইয়াছেন, যৎ প্রবাহে জাতিকুল ধসিয়া গিয়াছে, তিনিই যথার্থ প্রেমাবতার।

শূদ্রান্ন ভক্ষণে ব্রাহ্মণের প্রশংসা নাই, কিন্তু শূদ্রান্নে ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা জন্মিলে তাঁহার সে এক উচ্চাবস্থা। কারণ তিনি এক দিব্যভাব দ্বারা ভাবান্বিত হইয়াই শূদ্রান্ন পবিত্র বোধ করিতেছেন। হীন জাতি বা হীনাচার ব্যক্তির স্পৃষ্টদ্রব্যে আমাদের স্বভাবতঃ ঘৃণা হয়। যতক্ষণ আমরা জৈব ধর্ম্মের দাসত্ব করি। কিন্তু চিত্তে প্রেমাবেগ উদ্বেলিত হইলে সে ঘৃণা ভাসিয়া যায়। শ্রীক্ষেত্র গমনে আমাদের ঘৃণালেশ থাকেনা কেন? ধামে গিয়া আমরা স্বেচ্ছায় ঘৃণা করিনা এমন নয়, ধামের চিদাত্মক মহিমার তরঙ্গ প্রাণে এমনি লাগিয়া যায় যে, চিরাভ্যস্ত ভেদভাব একবারে নিষ্ক্রিয় বা বিলীন হয়! ইহাই প্রত্যক্ষোজ্জ্বল প্রমাণ যে, প্রেমমহিমা কেশরী জাগ্রত হইলেই চিত্তের ঘৃণাদ্বেষাদি কলুষ ভাব ফেরুপাল পলায়ন করে। মনের মলিনতা মাজিয়া দূর করিবার কঠোর ব্যবস্থা আর নাই। কৃত্রিমোপায়প্রয়োগ মার্জ্জন কার্য্যে প্রায়ই ব্যর্থ হইয়া দাঁড়ায়। কেবল হরিনাম মহামন্ত্রোচ্চারেই প্রেমরস উদ্রিক্ত হইয়া প্রাণে প্রাণে মাখায়—ছোট বড় সমান করে। এমন সুখময় মধুময় প্রেমের ঢলাঢলি যিনি শিক্ষা দিলেন তিনিই প্রেমাবতার।

সত্যে একমাত্র জাতি ছিল হংস। ত্রেতায় জাতিভেদ উৎপন্ন হয়,—দ্বিজ ও অদ্বিজ। এই দুই জাতিই প্রামাণ্য।—তদুপাধি কলিতে ভক্ত ও অভক্ত।

সত্যের মন্ত্র প্রণব; ত্রেতায় সংস্কার-ঘটিত বিজাদ্বিজ জাতি বিভাগ সহ গায়ত্রী মন্ত্রের প্রবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ রূপের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। যথাঃ—

সবিতুঃ (ব্রহ্মণঃ) দেবস্য (বিষ্ণোঃ) ভর্গো বা ভর্গস্য (রুদ্রস্য) বরেণ্যাং রূপমিতি ধীমহি।

রূপ যাঁহার, তাঁহার নামগুণ লীলা গান করাই উপাসনা। "গৈ ধাতু গানে। গায়ত্রী "গৈ" ধাতুমূলা। রূপ ও বর্ণ অভিন্ন; বৃহদ্ভেদ জগতে রূপচতুষ্টয়ের কৃষ্ণ রূপই নিত্য স্বরূপ, যথা শ্রুতি—"কৃষ্ণরূপাহি কেবলম্।" ইনি "রুক্মাভং" রুক্ম বা স্বর্ণবর্ণ যাহার আভা এমন ইন্দ্রনীল-মণিমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য এবং ইনি রুক্মবর্ণ আভা দ্বারা পীতবর্ণ প্রতীত হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গই গায়ত্রীর উপাস্য বা "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

ত্রেতাতেই যজ্ঞপ্রবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই যজ্ঞ পরাবস্থ হইয়া হরিনাম মহাযজ্ঞ কলিতে প্রচারিত হইয়াছেন। হরিনাম মহাযজ্ঞের প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই প্রেমদানে কলি ধন্য করিয়াছেন,—ইনি গায়ত্রীর ধ্যেয় রুক্মমূর্ত্তি। সুতরাং স্বয়ং পরম পুরুষ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই সাক্ষাৎ প্রেমাবতার

কলিকাতা "ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলের" ব্যবস্থাপক আচার্য্যগণের প্রযত্নে প্রতি-বৎসরই একটী বিশুদ্ধ "বৈষ্ণবব্রত তালিকা" প্রকাশ হইয়া থাকে, এবারেও আমরা উহা প্রাপ্ত হইয়াছি, সাধারণের সুবিধার্থে আমরা উহা ভক্তি পত্রে প্রকাশ করিলাম। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা (যতিধর্ম্মপরায়ণা) বিধবা দ্বিজপত্নীগণেরও এই বিধানে উপবাস করা কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫; চৈতন্যাব্দ ৪৩৩। ৩৪।

—:o:—

বৈশাখ।

শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রত　　৬ই শুক্রবার।
একাদশী　　৯ই সোমবার।
দমনকারোপণোৎসব　　১০ই মঙ্গলবার।

শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা	১২ই বৃহস্পতিবার।
একাদশী	২৪শে মঙ্গলবার।
অক্ষয় তৃতীয়া (শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা)	৩০শে সোমবার।

জ্যৈষ্ঠ।

জহ্নু সপ্তমী (শ্রীশ্রীজাহ্নবী পূজা)	৩রা শুক্রবার।
একাদশী	৭ই মঙ্গলবার।
নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত ও উপবাস	১০ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল যাত্রা	১১ই শনিবার।
একাদশী	২২শে বুধবার।

আষাঢ়।

একাদশী	৬ই বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা	১০ই সোমবার।
একাদশী	২০শে বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা	২৬শে বুধবার।

শ্রাবণ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা	২রা বৃহস্পতিবার।
শয়নৈকাদশী	৩রা শুক্রবার।
রাত্রের প্রথমযামে শ্রীশ্রীহরির শয়ন, চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ	৪ঠা শনিবার।
একাদশী	১৮ই শনিবার।

ভাদ্র।

একাদশী (শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রারম্ভ (১)	১লা রবিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ	২রা সোমবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা সমাপন	৫ই বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত	১২ই বৃহস্পতিবার।
একাদশী	১৫ই রবিবার।
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত	২৭শে শুক্রবার।

(১) দ্রষ্টব্য—১০।৪০।৪০ দণ্ড পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে গন্ধর্ব্বা সূচিত হিন্দোল যাত্রারম্ভ।

পার্শ্বৈকাদশী ও শ্রবণাদ্বাদশী (বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ)　　৩০শে সোমবার।
শ্রীশ্রীবামন দ্বাদশী শ্রীশ্রীবামনদেবের পূজান্তে পারণ সায়ংকালে শ্রীশ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন　　৩১শে মঙ্গলবার।

আশ্বিন।

একাদশী　　১৩ই সোমবার।
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব　　২৮শে মঙ্গলবার।
একাদশী　　২৯শে বুধবার।

কার্ত্তিক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসযাত্রা　　২রা শনিবার।
একাদশী　　১৩ই বুধবার।
গোবর্দ্ধন যাত্রা ও অন্নকূট　　১৮ই সোমবার।
গোপাষ্টমী (গোপূজাদি)　　২৫শে সোমবার।
উত্থানৈকাদশী (ভীষ্মপঞ্চকারম্ভ)　　২৮শে বৃহস্পতিবার।
পূর্ব্বাহ্নে শ্রীহরির উত্থান, শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা (চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপ্ত)　　২৯শে শুক্রবার।

অগ্রহায়ণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা (ভীষ্মপঞ্চক সমাপ্ত)　　১লা রবিবার।
একাদশী　　১৩ই শুক্রবার।
একাদশী　　২৮শে শনিবার।

পৌষ।

একাদশী　　১৪ই রবিবার।
একাদশী　　২৮শে রবিবার।

মাঘ।

পুষ্যাভিষেক　　২রা বৃহস্পতিবার।
একাদশী　　১৩ই সোমবার।
বসন্ত পঞ্চমী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন　　২২শে বুধবার।
মাকরী সপ্তমী (শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।)　　২৪শে শুক্রবার।

ভৈমী একাদশী	২৮শে মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব	২৯শে বুধবার।

ফাল্গুন।

একাদশী	১৪ই বুধবার।
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত	১৭ই শনিবার
একাদশী	২৮শে বুধবার।
আমর্দ্দকী ব্রত, শ্রীগোবিন্দার্চ্চন	২৯শে বৃহস্পতিবার।

চৈত্র।

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা
২রা রবিবার।

(এই দিবস হইতে ৪৩৪ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ)।

একাদশী	১৪ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রত	২৬শে বুধবার।
একাদশী	২৮শে শুক্রবার।
দমনকারোপণোৎসব	২৯শে শনিবার।

সৌন্দর্য্য ভাব বিকাশ।

(লেখক—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী।)

—:•:—

ইউরোপের একটী সর্ব্বজন প্রচলিত বাক্য আছে (a thing of beauty and a Joy for ever) তাহার ভাবার্থ "সুন্দর বা সৌন্দর্য্যের কোনও বস্তু হইতে চির আনন্দ লাভ করা যায়।" বাস্তবিক চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝা যায় কথাটীতে কতটুকু গভীর অর্থ ন্যস্ত আছে।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অতি নিকৃষ্ট জীব হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ জীব, মানব পর্য্যন্ত সকলেই নিজ নিজ উপলব্ধির ক্ষমতানুসারে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি দ্বারা আনন্দ লাভ করে।

অতি ক্ষুদ্র কীটানুকীটের সম্বন্ধে প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন সময় বিশেষে, অবস্থা বিশেষে সেই সেই ক্ষুদ্র জীবের বিকাশ অনুসারে তাহারা জাগতিক কোনও না কোনও বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে।' কথা অতি সত্য।

নীরস বিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়া যদি আমরা সাধারণ জ্ঞানেই বিচার করি; দেখিতে পাইব; সারা বিশ্বের চারিদিকে করুণাময় জগদীশ্বর আমাদেরই জন্য, অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। স্বাভাবিক প্রেরণায়, জাতি-স্মরী বুদ্ধি প্রবাহে, অনুশীলনে, জ্ঞানে প্রত্যেক জীবই তাহা হইতে ন্যূনাধিক "রস" গ্রহণ করে, সুখী হয়, আনন্দ পায়, এবং ক্রম বিকাশে, হয়ত বা উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হয়।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ, প্রভৃতি বিধানে জীবমাত্রই সৌন্দর্য্য স্পৃহায় আকৃষ্ট। এ বিধাতার বিধান। ইহা কি নিরর্থক? হইতে পারেনা। বৈজ্ঞানিক গণও ইহার উত্তরে তারস্বরে বলিলেন "জগতের এমন কোনও বস্তু নাই যাহা কোনও না কোনও উদ্দেশ্যে সৃষ্ট না হইয়াছে।" প্রমাণ, অনন্ত।

উচ্চ জীব মানব আদিম অবস্থা হইতে, শিক্ষা, জ্ঞান, অনুশীলন প্রভৃতি দ্বারা যতই আত্মোন্নতি করে তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ ও ঠিক সেই পরিমাণে অগ্রসর হয়। এ বিকাশের মূল সৌন্দর্য্য বোধ।

এই সৌন্দর্য্য বোধ, সাধনার ফলে ক্রমশঃ "রস" রূপে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। সাহিত্যকে সজীব করিয়া রাখিতে হইলে তাহাতে "রসের" অবতারণা করিতেই হইবে; কারণ "রসই" সাহিত্যের প্রাণ; সেই "রসের প্রধান উপকরণ, সৌন্দর্য্য বোধে।

"রস হইতে সৌন্দর্য্য, এবং সৌন্দর্য্য হইতে "রস" বাদ দিবার চেষ্টা করিলে বুঝা যায় সৌন্দর্য্যের জন্য "রস"কে এবং রসের জন্য সৌন্দর্য্যের আবশ্যকতা ওতপ্রোত ভাবে বিজরিত।

বহু গবেষণায় প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, "সৌন্দর্য্য" লইয়া যতই আলোচনা বা 'নাড়াচাড়া' করা যাইবে, ততই "রস" পরিপূর্ণ হইবে, ততই ইহার বিকাশের, প্রকার, আধার, সাধনা, ক্রমানুসারে উপলব্ধি হইবে।

সাহিত্যে আদি, হাস্য, করুণ প্রভৃতি নবম বা অষ্ট প্রকার 'রসের' উল্লেখ আছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উন্মেষ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঐ ঐ রসের পূর্ণতা সম্পাদন করে। অতঃপর আমরা আস্বাদন করিব যে, বৈষ্ণব রসালঙ্কার ঐ পূর্ণতা অপেক্ষা "রস"কে "পূর্ণতম" অবস্থায় অগ্রসর করাইয়াছেন। তাহা না হইলে—

"কিরূপ দেখিনু মধুর মুরতী
পিরীতি রসের সার,
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার।"

প্রভৃতির ন্যায়, বঙ্গের চির গৌরবের পদাবলী দেখিতে পাইতাম না। তাহা না হইলে—"শ্যামলং সুন্দরং রবিকর বসনং" ইত্যাদি প্রাণস্পর্শি ধ্যান রচিত হইত না,—তাহা না হইলে—

বৃষভানু সুতা বপুরেক তনু
কনকোজ্জ্বলতাংজিত পুষ্প ধনুঃ।
কৃত গোপ কুমার বিলাস ভরঃ
পরিভাতি বিধুরজ্জ্বল গৌরবরঃ"—

প্রভৃতির ন্যায়, অতুল্য অমূল্য রত্ন দেখিতে পাইতাম না। এমন কি—

"রসো হ্যেবায়ংলব্ধানন্দী ভবতি" এই বেদ বাক্যও আমরা অজ্ঞাত থাকিতাম।

বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রই "রস"কে পূর্ণতম করিবার নিমিত্ত "ভাবাশ্রয়ে" শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর "রস"কে প্রেম আখ্যা প্রদান করিলেন। এবং সেই জন্যই মধুর হইতে মধুরতম—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল,
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল
না সো রমণ না হাম রমণী
দুহু মন মনোভব পেষল জানি"—

এই সর্ব্বোচ্চ প্রেম-হিমালয়ের অতি উচ্চ শিখর দেশের কথা মানব শ্রবন করিয়াছে। বৈষ্ণব অলঙ্কার ছাড়া, সাহিত্য কোনও দিন ঐ ভাব জানিতেন না।

তাই বলিতেছি সৌন্দর্য্য বোধ হইতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, রসের উৎকর্ষ পরে "ভাবে" তন্ময় হইয়া থাকে।

গুরু-শিষ্য-বার্ত্তা।

—:০:—

শিষ্য। সমাদরে কোন দ্রব্য করিবে গ্রহণ?
পরিত্যজ্য কিবা হয়? গুরু কোন জন?

গুরু। সমাদরে গ্রহণীয় গুরুর বচন;
অকর্ম্ম অসৎ কর্ম্ম ত্যজ্য অণুক্ষণ।
ব্রহ্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত যেই গুণাধার,
শিষ্যের হিতার্থে মন রয়েছে যাঁহার;
সেই দেবতুল্য ব্যক্তি গুরু নামে খ্যাত,
প্রকৃত শ্রীগুরু তিনি জানিও নিশ্চিত।

শিষ্য। কোন কার্য্য শীঘ্র সুধী করিবে সাধন?
মোক্ষরূপ পাদপের বীজটী কেমন?
কোন কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর হয়?
কোন ব্যক্তি সব চেয়ে সুচি সদাশয়,

গুরু। যদ্বারা বন্ধন হ'তে মুক্ত হয় নর।
সুধী তাহা সম্পাদন করিবে সত্বর।
কর্ম্মের সহবৎজ্য সুসম্যাগ্ জ্ঞান;
মোক্ষ পাদপের বীজ ওহে মতিমান।
সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর ধর্ম্ম আচরণ,
বিশুদ্ধ অন্তর যাঁর তিনি শুচি হ'ন।

শিষ্য। বিষবৎ মহাদিষ্ট কোন কার্য্য করে।
পণ্ডিত কাহাকে বলে? শ্রেষ্ঠ কে সংসারে?
গুরু। হিতাহিত বিবেচনা শক্তি আছে যাঁর,
পণ্ডিত তাঁহার নাম খ্যাত ত্রিসংসার।
গুরুগণে অবজ্ঞাই পরিণাম কালে,
বিষবৎ ক্ষতিকর শাস্ত্রাদিতে বলে।
যে ব্যক্তি পরের কিম্বা নিজের কখন,
অহিত করেন নাই তিনি শ্রেষ্ঠ জন।
শিষ্য। মদিরার মত কিবা মত্ত করে নরে?
মহা দাহ্য হয় কারা সংসার ভিতরে?
এই ভব সংসারের হেতু কিবা হয়?
এ দেহের শত্রু কেবা ওহে সদাশয়?
গুরু। স্নেহ, মদিরার মত জীবে মত্ত করে।
হে বৎস, বিষয় সব দাহ্য নাম ধরে।
ভব বন্ধনের হেতু বিষয় বাসনা,
অনুৎযোগ শত্রু হয় ইহা আছে জানা।
শিষ্য। কাহাকে করিবে ভয় সকলের চেয়ে?
কারে শূর বলা হয় বলুন ভাবিয়ে?
অন্ধের অধিক ভবে হয় কোন জন?
আকাঙ্ক্ষা এসব দেব করিতে শ্রবণ।
গুরু। মরণকে প্রাণী মাত্রে ভয় ক'রে থাকে।
অন্ধের অধিক জেনো বিকারী রোগীকে।
যে মানব কামিনীর লোচন ভঙ্গিতে,
মোহিত নহেন তিনি শূর এ মহিতে।
শিষ্য। কর্ণ কাছে সুধা তুল্য হ'য়ে কিবা রয়?
গৌরবের হেতু কিবা? দুর্গম্য কি হয়?
কাহাকে দরিদ্র বলে? চতুর কে ভবে?
লঘুতার হেতু কিবা? বলুন গো এবে।

গুরু। কর্ণ কাছে সুধাতুল্য সাধু উপদেশ,
অপ্রার্থনা গৌরবের কারণ বিশেষ।
নারীর চরিত্র হয় দুর্গম্য নিশ্চয়।
যাহাকে দেহস্থ রিপু চৌর আদিচয়
পারে নাই করিবারে বঞ্চনা কখন।
সেই ব্যক্তি সুনিশ্চয় সুচতুর হ'ন
দারিদ্র এভব মাঝে অসন্তোষ হয়।
লঘুতার হেতু মাত্র প্রার্থনাকে কয়

শিষ্য। কোন প্রাণ শ্রেষ্ঠ হয়? কে সদা জা...
কাহাকে জড়তা বলে? কি নিদ্রা প্রকৃ...?

গুরু। নিন্দা লাভ করে নাই কভু যার প্রাণ
তাহার জীবন হয় সবার প্রধান
কার্য্য মাঝে অপটুতা জড়তা নিশ্চয়,
যে ব্যক্তি বিবেকী তাকে জাগরিত কয়।
প্রকৃত নিদ্রাই হয় নরের মূঢ়তা
মূঢ়তাই মহা নিদ্রা নিশ্চয় বারতা।

শিষ্য। কোন কোন দ্রব হয় সতত চঞ্চল
যেন ঠিক পদ্মপত্র মধ্যস্থিত জল?
কাহারা এ ভব মাঝে চন্দ্রমার মত
স্নিগ্ধ কর বরিষণ করেন সতত।

গুরু। যৌবন, ধন ও আয়ু ইহারা সদাই।
পদ্মপত্র মধ্যস্থিত জলের মতই।
যাঁহারা সজ্জন তাঁরা চন্দ্রমার ন্যায়।
গুণগ্রাম বরিষণ করেন ধরায়।

শিষ্য। নরক কি? সুখ কিবা? কর্ত্তব্য কি ভবে?
সকলের সুপ্রিয় কি? বলুনগো এবে।

গুরু। নরক পর বশ্যতা জানিও নিশ্চয়।
সর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগকেই সুখ ব'লে কয়।

প্রাণীর হিতসাধন কর্ত্তব্য নরের।
নিজ নিজ প্রাণ প্রিয় দেখ সকলের।

শিষ্য। কিরূপ দানকে বলে সুপ্রশস্ত দান?
কাহাকে ভাবিব মনে বান্ধব প্রধান?

গুরু। যেরূপ করিলে দান সন্তুষ্ট গৃহিতা।
তাহাই প্রশস্ত দান ইহা স্থির কথা।
নিবৃত্ত আছেন যিনি পাপ কার্য্য হ'তে,
তাঁহাকেই মিত্র বলি ভাবিও সুমতে।

শিষ্য। কি অমূল্য ধন? কিবা বাক্যের ভূষণ?
কেবা সুসম্পত্তি? কিবা নরের ভূষণ?

গুরু। বাক্যের ভূষণ ওহে সত্যতাকে কয়।
পুরুষের অলঙ্কার সুশীলতা হয়।
সম্মান অমূল্য ধন, সুখদ বন্ধুকে,
সুসম্পত্তি ব'লে থাকে বলিনু তোমাকে।

শিষ্য। কোন ব্যক্তি সর্ব্ব দুঃখ নাশিবারে পারে?
অন্ধ কে? বধির কেবা বলুন আমারে?

গুরু। দুঃখ ত্যাগে সুসমর্থ সর্ব্বত্যাগী নর,
যে অকার্য্যে রত সেই অন্ধ নিরন্তর।
হিত বাক্য শুনিয়া যে না করে তদ্রূপ,
সে বধির, বলিলাম জানি যেই রূপ।

শিষ্য। মূককাকে বলা যায়? মৃত্যু কারে বলে?
অমূল্য সামগ্রী কিবা এ অবনী তলে?

গুরু। যথাকালে প্রিয় বাক্য বলেনা যেজন,
তাহাকেই মূক কহে, মূর্খতা মরণ।
সময় বিশেষে যাকে দান করা হয়,
অমূল্য সামগ্রী ব'লে তাহাকেই কয়।

শিষ্য। আমরণ কালতক্ কোন কার্য্য তাতঃ
হৃদয়েতে ক্লেশ দেয় বিদ্ধ শেল মত?

কোন কার্য্যে নিরন্তর সযত্ন উচিত।
বিবেচনা করি দেব বলুন ত্বরিত।

গুরু। গুপ্ত পাপ আমরণ পর্য্যন্ত সদাই।
হৃদয়েতে কষ্ট দেয় শেলের মতই
যতন করিবে সদা বিদ্যাভ্যাসে দানে,
এবারতা শাস্ত্রাদিতে অনুদিন ভনে।

শিষ্য। কোন কার্য্যে সদাকাল অবজ্ঞা করিবে?
কি চিন্তা করিবে সদা বলুনগো ভেবে।

গুরু। পরধন, খল আর পর রমণীকে,
অবজ্ঞা করিবে সদা বলিনু তোমাকে।
সর্ব্বদা চিন্তিবে মনে সংসার অসার
স্ত্রী চিন্তা ক'রোনা কভু বলিলাম সার।

শিষ্য। কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রিয় ও উচিত?
কে পূজ্য? অধম কেবা? বলুনত্বরিত।

গুরু। মিত্রতা সজ্জন সহ কৃপা দীন প্রতি,
প্রিয় ও উচিত হয় ইহা সত্য অতি।
সচ্চরিত্র ব্যক্তি হ'ন পূজ্য সকলের।
অধম এ আখ্যা সদা চারএ হীনের।

শিষ্য। প্রাণান্তেও কোন ব্যক্তি বশীভূত নয়?
কোন স্থানে বাস করা সুকওবা হয়?
অনন্ত বিশ্বকে কেবা ক'রেছেন জয়?
বলুন করুণা ক'রে গুরু গুণময়।

গুরু। কৃতঘ্ন বিবাদি মূর্খ প্রাণ ওষ্ঠাগত
হইলেও কোনকালে নহে বশীভূত।
অনুনয় বিনয়েও ওরা বশ নয়
ওদের ভাবের কথা কহন না যায়।
সত্য নিষ্ঠা সহিষ্ণুতা যাঁদের আশ্রয়,
তারাই অনন্ত বিশ্ব ক'রেছেন জয়।

সজ্জন সমীপে কিম্বা সিদ্ধ কাশীপুরে,
নিবাস করিতে হয় বলিনু তোমারে।

শিষ্য। দেবতার অপেক্ষাও জীবেরা কাহার
উচিত বোধেতে গুরো! করিবে সৎকার?
সুধী মানবেরা কারে করিবেন ভয়,
বলুন এসব দেব হইয়া সদয়।

গুরু। ভব মাঝে অতিশয় দানশীল যাঁরা,
দেবাপেক্ষা সৎকারের পাত্রহন তাঁরা।
এ ভব সংসার রূপ অরণ্য হইতে,
ভয়ানক ভীতি জন্মে সুধীদের চিতে।

শিষ্য। কার বশীভূত হয় প্রাণীরা সকলে!
সাধুগণ কি ভাবেতে থাকেন ভূতলে?

গুরু। সত্য, প্রজ্ঞ, প্রিয় ভাষী বিনীত যাঁহারা,
তাহাদের বশীভূত হয় মানবেরা।
ন্যায় পথে সাধুগণ করি অবস্থান
রহেন এ ভব মাঝে বলিনু সন্ধান।

শিষ্য। ভগবন্! গুরুদেব! কিবা শোচনীয়,
এবং ভবে কিবা হয় সুপ্রসংশনীয়।
অল্প বিভবশালী এবং মহাধনী
ইহাদের কি কর্ত্তব্য বলুন আপনি।

গুরু। ধনীদের কৃপনতা শোচনীয় হয়।
সুপ্রসংশনীয় সর্ব্বে ঔদার্য্য নিশ্চয়।
ধনীরা নির্ধনী পক্ষে সহিষ্ণুতা সাধ্য।
সবের হওয়া উচিত ইহাই আরাধ্য।

শিষ্য। তড়িতের মত কিবা সদাই চঞ্চল?
ল'য়ে কুলশীল মান কেবা অচঞ্চল?

গুরু। দুর্জ্জন নরের সহ সম্ভবে যুবতী
বিদ্যুতের মত বড় সচঞ্চল অতি।

কলিতেও ভবমাঝে সুপুরুষ যাঁরা.
কুলশীল থাকিলেও গর্ব্ব, হীন তাঁরা।

শিষ্য। চিন্তামনি মত কিবা দুর্লভ এ ভবে?
বলুন করুণাময় কৃপা করি এবে।

গুরু। চতুর্ভদ্রকেই বৎস্য চিন্তামনি মত
দুর্লভ বলিয়া থাকে বলিনু নিশ্চিত।

শিষ্য। গুরুদেব আপনার কৃপাতে আমার,
অজ্ঞানতা নষ্ট হ'ল গেল অন্ধকার।
যে চতুর্ভদ্রের কথা করিনু শ্রবণ
বিস্তারিয়া তাহা গুরো! করুন বর্ণন।

গুরু। প্রিয় বাক্য প্রদানিয়া সমাদরে দান
ক্ষমার সহিত শৌর্য্য, গর্ব্বশূন্য জ্ঞান
দানের সহিত বিত্ত একটী নিশ্চয়,
চিন্তামণি মত বৎস্য সুদুর্লভ হয়।
এই যে রতন মালা করিনু বর্ণন।
যাহা তুমি সমাদরে করিলে শ্রবণ
তাহা সদা কণ্ঠদেশে ধ'রেছেন যিনি,
মণিমুক্তা বিহিনেও মহাধনী তিনি।
বিদ্বান সমাজে তিনি শোভা প্রাপ্ত হন।
অতএব উহা কণ্ঠে করহ ধারণ।
"এইখানে শেষ হ'ল গুরু-শিষ্য-বার্ত্তা
বিজ্ঞানী শঙ্কর এর প্রণেতা বা কর্ত্তা।

ব্রহ্ম হরিদাস।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর।)

—:০:—

ঠাকুর হরিদাসকে ব্রাহ্মণ কুলতিলক বলিয়া সপ্রমাণ করিবার জন্য কেহ কেহ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, সেজন্য জোগাড় তদ্বিরেরও ত্রুটী হইতেছেনা। তাঁহারই পিতা মাতার নাম গোত্রাদিও বাহির হইয়াছে, দুই একটা প্রাচীন পয়ার ও আবিষ্কৃত হইয়াছে, অত বড় একটী ভক্তকে ব্রাহ্মণ্য সমাজে রাখিতে পারিলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের গৌরব বটে; কিন্তু তাহা হইয়া উঠিতেছে কই? শ্রীচৈতন্য লীলার যে কয়খানি প্রামাণিক গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই তাহাতে ঠাকুর হরিদাসের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় না পাইয়া বরং যবনত্বের পরিচয় পাইতেছি। আমরা প্রমাণাদি সমুপস্থিত করিতেছি, পাঠক বিচার করিয়া রায় প্রকাশ করিবেন।

শ্রীচৈতন্য লীলার সর্ব্ব প্রধান লেখক হইতেছেন শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, ইঁহাকে বৈষ্ণব মহাজনেরা "বেদব্যাসের" আসনে বসাইয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্য লীলায় বেদব্যাস বৃন্দাবন দাস" ভভিন্ন শ্রীল কবি কর্ণপুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীলোচনদাস প্রমুখ মহাপুরুষগণের নিকট হইতেও আমরা সেই নবদ্বীপ-সুধাকর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের লীলারসাত্মক ইতি কথা জানিতে পারি। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর পার্ষদ; লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার অতীত, ভগবচ্চরণনিষ্ঠ ভক্ত। ইঁহারা কোনও প্রকারে সত্যগোপন বা অসত্যের প্রশ্রয় দিবার লোক নহেন; বিশেষতঃ বৈষ্ণবেরা অমানীমানদ, আপনাদিগকে তৃণ অপেক্ষা নীচ জ্ঞান করেন অথচ অপরকে সন্মান করেন; সেস্থলে বিপ্র কুলোদ্ভব হইলে কখনই হরিদাসকে ম্লেচ্ছ যবন বংশ প্রদীপ বলিয়া প্রচার করিতে তাঁহাদের মতি বা প্রবৃত্তি হইত না, কিন্তু তাঁহারা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে বার বার ঠাকুর হরিদাসের যবনত্বেরই ঘোষণা করিয়াছেন। লীলা লেখকগণ জীবন চরিত লিখিতে বসেন নাই, কাজেই পিতৃ পুরুষের বিবরণ বা জন্ম মৃত্যুর

সন তারিখের কোন উল্লেখ রাখা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাই আমাদের যোগবিয়োগের যথেষ্ট অবসর হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত কার শ্রীলবৃন্দাবন দাস বলিতেছেন—

"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥
যবন হইয়া যেমন হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এপাপেতে তরে॥"

কাজি সাহেবের এই অজুহাৎ এবং কঠোর নির্দ্দেশ বাণী হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, হরিদাস ঠাকুর পাকাপাকি যবনই ছিলেন নচেৎ কাজি সাহেবের মোকর্দ্দমা, হেতু অভাবে নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহাতে প্রতিপক্ষের কিন্তু একটী সওয়াল আছে। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছিলেন, শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হওয়ায় ও মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় "যবন" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কথাটা শুনিতে বেশ কিন্তু উক্ত গ্রন্থকারগণ সে পথেও কাঁটা দিয়াছেন ঐ গ্রন্থে অন্য স্থানে মুসলমান মুলুকপতি বলিতেছেন—

"আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হ'য়ে মহাবংশ জাত॥"

হিন্দুদ্বেষী যবন রাজ কি ব্রাহ্মণ বংশকে "মহাবংশ" বলিতেছেন! না যবন বংশকে মহাবংশ বলিতেছেন, পাঠক বিচার করিবেন।

কবিরাজ কৃষ্ণদাস আরো স্ফুটতর প্রমাণ লইয়া বলিতেছেন" কৃষ্ণভক্তি করিবার অধিকার সকলেরই সমান, তাহাতে জাতি, কুলের কোন বিচার নাই, শ্রীচৈতন্য লীলায় তাহাই বুঝাইবার জন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছায় হরিদাস অধম কুলেতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে "যবন কুলেতে" পাঠ ও আছে। যাহাই থাকুক ব্রাহ্মণ কুলকে কিছুতেই অধম কুল বলা যাইতে পারে না, ইহাতো ঠিক।

"জাতি কুল সর্ব্ব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥" চৈঃ চঃ

সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ কবিরাজ গোস্বামী পুনরপি বলিতেছেন";—

চণ্ডালোহপিদ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপিশ্বপচাধমঃ॥
"এ সকল বেদ বাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কূলেতে॥ চৈঃ চঃ

ইহার পরে হরিদাসকে কিরূপে বিপ্রকূলোদ্ভব বলা চলে তাহা আমরা বুঝি না। অন্য ঘটনা দেখুন—

নিখিল শাস্ত্রবিদ্ বেদ পঞ্চানন শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র একদা এক অদ্ভুত খেলা খেলিলেন। যাহা সদাচার সম্পন্ন দ্বিজোত্তমের প্রাপ্য সেই শ্রাদ্ধপাত্র কোন বিপ্রকে না দিয়া ঠাকুর হরিদাসকে দিতেছেন। দৈন্যের অবতার শ্রীহরিদাস তাহাতে ঘোর আপত্তি তুলিয়াছেন—ফুলিয়া কুলীন ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ সমাজ সেখানে প্রভু একি করিতেছ? তোমার কি চক্ষু লজ্জাও নাই?

মহা মহাবিপ্র হেথা কুলীন সমাজ।
নীচে আদর কর না বাসহ লাজ॥ চৈঃ চঃ

আচার্য্য মহাশাস্ত্রীয় পণ্ডিত, তিনি কাহারও খাতির করিতে আসেন নাই, শাস্ত্র বাক্য যথাযথ পালন করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন" হরিদাস, তুমি সঙ্কুচিত হইওনা, আমি অশাস্ত্রীয় কিছু করিতেছি না বরং শাস্ত্রের প্রকৃত মর্য্যাদাই রক্ষা করিতেছি। লোকের খাতির করিতে যাইয়াই জগৎ উৎসন্ন যাইতেছে। তুমিত জান, সর্ব্ব শাস্ত্র এক বাক্যে বলিতেছেন কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ নীচ জাতি শ্রেষ্ঠ।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

ক্রমশঃ

ভক্তি ১৬শ বর্ষ, ১১শ, সংখ্যা, আষাঢ় মাস, ১৩২৫।

নিবেদন।

—:০:—

গৌর হে।—

সুখ-মোহে ভুলি অসার সংসারে
ঢেলে দিনু এ জীবন।
ধুলা খেলা করি শৈশব-প্রভাতে
কাটাইনু অনুক্ষণ॥
দূর পরবাসে থাকি সদা পড়ি
কৈশোরে জ্ঞানের আশে।
কতদিন পুনঃ ভ্রমি নানা দেশে
যৌবনে করম পাশে॥
জীবন-পাদপে তারি মধ্যে মম
বেড়িয়া লতিকা নব।
করি আলিঙ্গন কঠিনে কোমলে
ধরি শোভা অভিনব॥
জলদ-মণ্ডলে যেমতি চমকে
সতত চপলা ভাতি।
কিম্বা যতনে তুলি খনি-মণি
দিলা হেম-হারে গাঁথি॥
মোহের বাঁধনে মোহাসক্ত হ'য়ে
মোহময় মরবাসে।
কিছার সুখেতে খেলি' নিতি নিতি
ভুলিলাম পীতবাসে॥

কেমনে কাটিব সে মোহের ফাঁস
কেমনে হইব পার।
(গৌর!) তব পাদপদ্মে না হইল মতি
পড়ে কি রব এবার?
এদীন অধমে কে করিবে পার
দিন যে বিফলে যায়।
গৌরা গুণমণি। এই নিবেদন
ভুলনা যেন তোমায়॥

দীন—

"আমাদের বক্তব্য।"

কয়েক মাস যাবৎ শ্রীপত্রিকা প্রকাশে বড়ই বিলম্ব হইতেছে, তজ্জন্য অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিযাছেন, প্রত্যেককে পৃথক ভাবে পত্র না দিয়া সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, কয়েক মাস যাবৎ প্রেসের কর্তৃপক্ষগণ আমাদিগের কাজ কর্ম্মে বড়ই শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন, তারপর আবার আমার কার্য্যের প্রধান সহকারীর আজ কয়েক মাস যাবৎ শরীর খুবই অসুস্থ, এ সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও যথেষ্ঠ চেষ্টা করিয়াও আমরা যথাসময যে গ্রাহকগণকে পত্রিকা দিতে পারিতেছিনা তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত। এই সকল কারণে আমরা গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের কাগজ একত্রে বাহির করিয়াছি, ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব যাহাতে আর কোনরূপ বিলম্ব না হয়। এক্ষণে সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরই বলিতে পারেন কি হইবে।

ইউরোপীয় মহাসমরে মুদ্রণ সরঞ্জাম ও কাগজ কিরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন, পূর্ব্বের মূল্যের চতুর্গুণ মূল্য দিয়াও যথাযথ কাগজ সকল সময পাইবার উপায় নাই তারপর যদিও পাওয়া যায় তাহাও প্রচুর নয় যে একেবারে কিনিয়া রাখা যায়, কাজেই মাসে মাসে কাগজ কিনিয়া যত দুর্ম্মূল্যই হউক পত্রিকা প্রকাশ করিতে হইতেছে।

এরূপ অবস্থায় পত্রিকা প্রকাশ যে কতদূর ব্যয় সাধ্য তাহা একমাত্র ভুক্ত-ভোগীই বুঝেন, তবে সকল দিকেই সুবিধা হয় যদি গ্রাহকগণের নিকট হইতে সেইরূপ সহানুভূতি পাওয়া যায়। আমাদের বহু পুরাতন গ্রাহকই টাকার তাগাদা করিবামাত্র পত্রিকা লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এ যে কিরূপ বিচার আর কিরূপ ভদ্রতা তাহা বুঝিতে পারিনা। আমরা কাহাকেও জোর করিয়া পত্রিকা দিতে চাহিনা তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এখনও ভক্তির যত গ্রাহক আছেন তাহারা অন্ততঃ সকলে যদি ১টী করিয়াও নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন তাহা হইলেও যথেষ্ঠ সাহায্য করা হয়, আর আমরাও ভরসা করিয়া ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারি।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ বচন আছে যে, "দশের লাঠি একের বোঝা" সেইরূপ দশজনে সামান্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিলেও যথেষ্ঠ হয়। ইহাতে একদিকে যেমন ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করা হয় অন্য দিকে তেমনি শ্রীভক্তি পত্রিকার জীবন রক্ষা হয়, আমরা খুবই আশা করি ধর্ম্ম-প্রাণ সহৃদয় গ্রাহক-গণের নিকট হইতে এরূপ সাহায্য পাইতে কখনই বঞ্চিত হইব না। আর যাঁহাদিগের নিকট এখনও ভক্তির মূল্য বাকী আছে দয়া করিয়া এই সময় পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

করুণাময় শ্রীভগবানের অপার করুণায় নানা প্রকার ত্রুটী বিচ্যুতির মধ্য দিয়া ভক্তির আর একটী বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল। আগামী শ্রাবণ মাসে ভক্তির ১৬শ বর্ষ পূর্ণ হইয়া ভাদ্র মাস হইতে ১৭শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে জানান সত্ত্বেও অনেকে আমাদিগকে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া ক্ষতি গ্রস্থ করিয়াছেন এবারে তাই দুইমাস পূর্ব্ব হইতে সকলের নিকট বিনীত নিবেদন করিতেছি যা একান্তই তাঁহারা ভক্তি লইতে অনিচ্ছুক হয়েন তবে আমাদিগকে একটু পূর্ব্বে জানাইবেন। আমরা ভক্তির চির-প্রথানুসারে ভাদ্র মাসের পত্রিকা সকলের নিকট ভিঃ পি করিতে চাই, যাঁহার আপত্তি থাকিবে তিনি ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন, আর যদি ভিঃ পিতে লইতে কাহারও অসুবিধা হয় তিনি ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে নিজ নিজ নাম ধাম ও গ্রাহক নম্বর সহ টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, অথবা কখন সুবিধা হইবে জানাইবেন।

আর একটী সুসংবাদ এই যে, ভক্তির পুরাতন লেখক সাধক প্রবর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আগামী ভাদ্রমাস হইতে আবার নিজ লেখনী প্রসূত অমীয় উপদেশাবলি দ্বারা গ্রাহকগণকে পরিতৃপ্ত করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক পণ্ডিতগণ রীতিমত লিখিবেন একণে সহৃদয় গ্রাহকগণের সহানুভূতিই বাঞ্ছনীয়।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

—:০:—

ভক্তি গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধান কল্পে গত পৌষ ও মাঘ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকারের পরে নিম্নলিখিত সাহায্য পাওয়া গিয়াছে;—

শ্রীমতী—	১৲
মাং ভক্তি সম্পাদক	২৲
জনৈক স্কুলের ছাত্র	॥০
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ঘোষ	৫৲
পূর্ব্বের	৩৫৲
মোট	৪৩॥০ টাকা।

এতদ্ভিন্ন অনেক মহাত্মা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, গ্রন্থাগারের উন্নতীকল্পে যিনি দয়া করিয়া যাহা সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইয়া যথাসময় ভক্তি পত্রে প্রাপ্তি স্বীকার হইবে। যিনি যাহা পাঠাইবেন নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

"ম্যানেজার ভক্তিগ্রন্থাগার"

গ্রাম—মাসিলা,

পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া।

(বি, এন, রেলওয়ে।)

পথের কাঙ্গাল।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।)

৬—সন্ন্যাসী।

———:০:———

সন্ধ্যার পর গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখি শেষ খেয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা আবার ফিরিলে তবে পারে যাওয়া যাইবে। সে অনেক দেরী! কিন্তু উপায় নাই। দায়ে পড়িয়া অপেক্ষা করিতে হইল।

শুধু চুপ করিয়া থাকাতো ভাল লাগে না? তাই একটু এদিক ওদিক পদচারণা করিলাম। দেখি ঘাটের এক পার্শ্বে একজন ব্রাহ্মণ বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছেন। সাধু সঙ্গের এমনি প্রভাব এ দৃশ্য দেখিয়া আমারও মনের যেন একটু পরিবর্তন হইল। জুতা খুলিয়া ব্রাহ্মণের অদূরে বসিয়া গঙ্গাবারি স্পর্শ করিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে জয়মাপতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে!" বলিয়া একটা প্রণাম করিয়া ফেলিলাম। সাড়া পাইয়া ব্রাহ্মণ একটু ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। বুঝিলাম তখনও তাঁহার জপ শেষ হয় নাই। তখন চন্দ্র উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে কেমন একটু তন্ময় হইয়া গেলাম, আর সেই অবস্থায় যেন মনের ভিতর হইতে এই গীতটী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

মা আমায় কেন রাখ্‌লি বাকি?
মোর সকল দেনা হয়নি শোধ,
(তোর) পাওনা আরো আছে নাকি?
ওমা! কোন্ যুগেতে একটি কণা,
দিয়েছিলি ভাব দেখি;
তার আশী লক্ষ আদায় ক'রেও
রেহাই দাওনা এখন একি?

ওমা। দৃষ্টিতে তোর সৃষ্টির হিসেব,
নিমেষ মধ্যে নিকেশ দেখি .
আর। আমার নিকেশ, হয় নাকি শেষ,
তোর্ সৃষ্টি-ছাড়া আমি না কি?

গীতটি শেষ হইয়াছে, দেখি ব্রাহ্মণ আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি তাহার দিকে চাহিবামাত্র তিনি হাসিয়া বলিলেন—'তোমার আবার কি হ'লো গো?"

আমি ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বলিলাম। ঠাকুর আমরা সংসারী মানুষ কত রকম জ্বালা যন্ত্রণা সইতে হয়, তাই মা, পতিতোদ্ধারিণী পাপ-তাপ-হারিণী সুরধুনীর নিকটে আসিয়া দুটো মনের কথা বলিতেছি। ব্রাহ্মণ একটু স্থির হইয়া রহিলেন, পরে একটী দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার কেমন কৌতুহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঠাকুর অমন করিয়া রহিলেন যে?"

ব্রাহ্মণ তখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন—"বাবা! তোমার কথা শুনিয়া আজ আমার.প্রাণে অনেক পুরাতন কথা জাগিয়া উঠিল। ছেলে বেলায় ভুলে যাওয়া স্বপনের কথা, অতীতের অতি প্রিয় গাঁথা—সব যেন মনে পড়িয়া গেল। বাবা! আমারও একদিন এমন ছিল, যখন তোমার মত সংসারী ছিলাম। আর এখন, যদিও গৈরিক বসনে অঙ্গ ভূষিত নয়, যদিও গলায় মালা ও হাতে কমণ্ডলু নাই—তবু আমি সন্ন্যাসী।"

ব্যথার ব্যথী পাইলে প্রাণের তাপ শীতল হয়। সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথায় আমার প্রাণটার ভার কমিয়া গেল। নিজের বোঝা হাল্‌কা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম! ঠাকুর আপনার এ অবস্থার পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিল?

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বাবা! শুনিতে চাও তো বলি শুন, আর যদি ইচ্ছা হয় তো সংসার তাপে তাপিত আর পাঁচ জনকে শুনাইও। তখন দেখিবে, এ জগতে শুধু বুক-ভাঙ্গা শোকে তুমি একা মাত্র কাতর নও, তোমার অপেক্ষা বা তাদের অপেক্ষা আরও অনেক রকমের ধাক্কা অনেকের উপর দিয়া হইয়া গিয়াছে।

"বাবা! এই গঙ্গাতীরে, এই সন্ধ্যাবেলায় আসিতাম্, একা নহে আরও অনেকের সহিত, আসিতাম্। হায়, তাহারা আজ কোথায়? আর আমিই বা কোথায়? তখন প্রাণের মধ্যে কেমন মধুর ভাব ছিল। দুনিয়ার সকল দুঃখ কষ্ট যেন দূরে ফেলিয়া কেবল আনন্দের সাধক হইবার জন্য প্রাণ মাতিয়া উঠিল। এই সন্ধ্যাবেলায় এই গঙ্গাতীরে বসিয়া সহচর ও বন্ধুজনে কত কথাই আলোচনা করিতাম। দুনিয়াটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজেদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইব, জগতের যাহা কিছু সৎ তাহারই প্রতিষ্ঠা করিব, নিরানন্দকে, অভাবকে হাহাকারকে জীবন নাটকের অঙ্ক হইতে মুছিয়া ফেলিব—সে আলোচনার যেন এমনি একটা উদ্দেশ্য ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু, তার পর।

"তার পর যখন সংসারে প্রবেশ করিলাম তখন এ সব কোথায় গেল, হাওয়ার মত, ধোঁয়ার মত, স্বপনের মত, যেন একে একে উড়িয়া গেল। তখন বুঝিলাম,—সংসার বিপাকে পড়িয়া বুঝিলাম—

বরং বনং ব্যাঘ্র গজাদি সেবিতম্,
জলেন হীনং বহু কণ্টকাবৃতম্,
তৃণানি শয্যা পরিধান বল্কলম্,
ন বন্ধু মধ্যে ধন হীন জীবিতম্।

"তখন দেখিলাম, সৌভ্রাতৃ প্রেম কোথায়? তার মূল্য কি? যত দিন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন প্রাণ ভরিয়া "দাদা" বলিতাম; হাসি মুখে, "বৌদিদির" কাছে গিয়া কত আব্দার করিতাম। কিন্তু যখন পিতৃ বিয়োগ হইল, তখন একি হইল? 'দাদা" বলিয়া ডাকিলেও আর তেমন সাড়া পাওয়া যায় না, বৌদিদির কাছে যেন হঠাৎ "পর" হইয়া গেলাম। তার পরই এটর্ণী বাবুর পত্র আসিল। বিষয় ভাগের—বাস্তু ভিটা ভাগের সালিশি বসিল। আজন্ম বন্ধন এই ভাগাভাগিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল

"তখনও কলেজে পড়ি। তখনও সংসার কি তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই। লোকে কত কথাই বলিল, কত কথাই শুনিলাম। কেহ বলিল—আহা! "ভায়ের চেয়ে বন্ধু নাই যদি না থাকে ভাল, আর চাকুরীর চেয়ে আরাম নাই যদি না থাকে কাজ।" আবার কেহ বলিল—"ভাই, ভাই—ঠাঁই ঠাঁই।" এ সব শুনিলাম—এসব বুঝিলাম। কিন্তু আমি বুঝিলেও

জননীর চক্ষের জল মুছিল না। আর বিধবা-ভগিটি উদাস নয়নে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। দাদার শাশুড়ি ছিলেন, শালী ছিলেন, শ্যালক ছিলেন—সুতরাং ইঁহাদের আকর্ষণে, দাদা ভ্রাতৃ-ভক্তি, ভগিনী স্নেহ ও ভ্রাতৃপ্রেম চিরতরে বিসর্জ্জন দিলেন। কিন্তু আমি কি করি আমার ত তখন "মা" বই আর ডাকিবারও কেহ ছিল না।

"কাজেই, লেখাপড়া ছাড়িতে হইল, চাকরীর চেষ্টায় ফিরিতে হইল; কিন্তু চাকরীর বাজারে যে এমন দুর্ভিক্ষ তা কি জানিতাম? প্রথমে পিতৃ-বন্ধুদিগের নিকট বড় আশা করিয়া গেলাম, কিন্তু হায়! যাঁহারা পূর্ব্বে আমাদের বাটীতে নিত্য যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা আমায় এখন আর চিনিতে পারিলেন না। উঃ জগৎ কি মজার! ভাবিলাম হাঁ, বাঙ্গালী শিক্ষিত ও সুসভ্য হইয়াছে বটে। পরে পরিচিত বন্ধু ও জ্ঞাতিদের নিকটে সুপারিশ ধরিলাম। তাঁহারা মুখে আমায় কত না আশা দিতেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেই তাঁহারা বলাবলি করিতেন যে, "ছোঁড়াটা কেবল ঘ্যান ঘ্যান্ ক'রে রোজ জ্বালাতে আসে কেন? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একদিন এই গঙ্গা-তীরে বসিয়া মনের আবেগে গাহিয়া ছিলাম।—

কি হবে মা তারা আমার।
অর্থ শূন্য ব্যয় অগণ্য কর্ম্ম হীন আছি বেকার॥
ওমা, বাল্যাবধি যে বিদ্যাধন,
করিয়াছি আহরণ,
দেখি, তা'তেও হয় না এখন ইষ্ট সাধন আপনার।
ওমা, অভাবের ভাবনায়,
ভেবে ভেবে প্রাণ যায়,
ভাব ভাবিনীর পায়, পাবে না কি অধিকার।

"জানি না, ভব-ভাবিনী একথা কর্ণ গোচর করিলেন কি না, কিন্তু সেই দিন এই গঙ্গাতীরে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, তিনি আমার এই কাতর প্রার্থনা শুনিয়া দয়া করিয়া একটি কর্ম্ম জুটাইয়া দিলেন। তাঁহার সে অযাচিত স্নেহ দেখিয়া ভাবিলাম, যদি মানুষ থাকে, যদি মনুষ্যত্ব থাকে, যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি ভগবৎ বিশ্বাস থাকে তো দরিদ্রের ঘরে তাহা

আছে—দরিদ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে তাহা আছে। যার শাল দোশালা নাই, কোঠা বালাখানা নাই, জুড়ি জমিদারী নাই—তার যাহা আছে, তাহা জগতে অমূল্য, সুদুর্লভ ও সাধন সাপেক্ষ। তাই সেদিন মনে মনে ভাবিয়াছিলাম।—

ভগবন্!

আমায় দুঃখ দিও দুঃখ দিও দুঃখ দিও খালি।
তার মাঝেতে রেখ তোমার প্রেমের শিখা জ্বালি॥

"এই ভাবে যখন সংসারে প্রবেশ করিলাম" তখন জননীর সাধ হইল, গৃহের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। তাঁহার সে সাধ অপূর্ণ রহিল না। বাস্তবিক যাহার উদ্দেশ্য আনন্দ, আনন্দ লাভের জন্য যে অনুষ্ঠান, তাঁহার সংযোগে নিরানন্দ দূর হইল। তখন দেখিলাম কি ভুলই করিয়াছি! জীবনটাকে যেন এতদিন বিশুষ্ক মরুময় বলিয়া মনে হইত, যেন সঙ্গিহীন, ভারময় বলিয়া বোধ হইত, সেটা তখন দূর হইল। প্রাণ হাল্কা হইল, ব্যথার ব্যথী পাইলাম। তখন যেন যত কিছু সৌন্দর্য্য, যত কিছু মধুরতা, সেই একখানি অতীব দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া লইলাম। উভয়ের মিলনে যেন পূর্ণতা, যেন তৃপ্তির পরিপূর্ণ সুর ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল।"

"কিন্তু তার পর! মনে পড়ে এই গঙ্গাতীরে যাহার কর ধারণ করিয়া পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে পূত বারি মস্তকে ধারণ করিয়াছি, তাহার প্রাণশূন্য দেহখানিও এই গঙ্গাতীরে আনিয়া পবিত্র হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে মহাযোগের আয়োজন করিয়াছি। ইহাতেই সেই আনন্দের পূর্ণ পরিণতি হইল। কেন না, এতো একই শক্তির বিকাশ। যে শক্তি বলে ফুল ফুটে, কুসুম-মাধুরীতে যে শক্তির বিকাশ হয়, কঠোর বজ্রনাদের মধ্যেও কি সেই শক্তির বিকাশ হয় না? হয় বৈকি।

"তাই কুসুম বিকাশে যে আনন্দ হয়, বজ্রনাদেও সেই আনন্দের ঝঙ্কার উঠে। যার প্রাণে আনন্দের তরঙ্গ রচিয়াছে, আনন্দের লীলা খেলা অনুভব করিয়াছে, তার প্রাণ যে বিশ্ব-প্রকৃতির অনন্ত নৃত্যের তালে তালে নাচিয়া উঠে। হোক্ না সে ভাল, হোক্ না সে মন্দ—তাহার তো আর ভাল মন্দের জ্ঞান নাই; তার যে সকল অবস্থাই তৃপ্তির অবস্থা। কারণ তার তো আর অতৃপ্তির কিছু নাই। তার চক্ষে যে প্রেমের অঞ্জন লাগিয়া গিয়াছে।

"তাই আসি, আজিও এই গঙ্গাতীরে আসি, এই মহাসিদ্ধির যোগাসনে আসি—আর জীবনের ভগ্নাংশগুলি গ্রথিত করিয়া একটি পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করিবার প্রয়াস পাই। কারণ অপূর্ণ থাকিলে ভূমানন্দের প্রতিষ্ঠান প্রাণে ব্যাপ্ত হইতে পারে না।

"তবে যাহা ছিল জড়ে সীমাবদ্ধ, এখন তাহা সূক্ষ্মে বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ উদার আকাশ, ঐ হাল্কা হাওয়া, ঐ কলনাদিনী ভাগীরথী, ঐ লোলজিহ্বা প্রসারিত চিতাগ্নি, এই তৃণ-গুল্মাদি শোভিত বসুন্ধরা—সবই যেন সেই মনোময়, সেই প্রাণময়, সেই বিজ্ঞানময় আনন্দের সূক্ষ্ম মূর্ত্তির মধুর চিত্র নিত্য নয়ন সমক্ষে আঁকিয়া দিতেছে। নয়ন মুদিলেও তাহার স্মৃতি ফুটিয়া উঠিতেছে। জীবনে এই যে ভাব, জীবন অন্তে এভাব আরও কত বিস্তৃত হইবে। তখন আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়া এই সৌন্দর্য্য সাধনার সিদ্ধি দেখাইয়া দিবে। সে আনন্দের যে বিচ্ছেদ নাই।

"বাবা! তাই আজ আমার অঙ্গে গৈরিক বসন না থাকিলেও আমি সন্ন্যাসী, আমার গলায় মালা কণ্ঠী নাই, তবু আমি উদাসীন, আমার কপালে ত্রিপুণ্ড্র চিহ্ন নাই,—তবু আমি সংসার ত্যাগী। বাবা! সাধক শ্রেষ্ঠ, রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—"কেলে সর্ব্বনাশী বেটি—আমায় সন্ন্যাসী ক'রেছে।"

কিন্তু, বাবা! আমি কোন বেটা বেটীর তোয়াক্কা রাখি না, আমার মনে মুখে এখন এই একমাত্র রব,—

"আমার পরাণে তোমার চরণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি।"

সংসারের লোক আমায় দেখিয়া কত কি বলে, কত কি বোঝায়। আমি সে সব শুনি না বা বুঝি না বলিয়া—আমায় 'পাগল' বলে। কেহ বা আরও কত ভুল করে। আর আমি তাদের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবি—"আমায় কেন পাগল বলে,—পাগলে।" কবিরা আমায় লক্ষ্য করিয়া বলেন—

"ওরে মুগ্ধ উদাসীন!
বিধাতা কি তোরে একা,
সকলের বিপরীত
দিল ললাটের রেখা॥"

দার্শনিক গম্ভীর গলায় বলেন—

"কেহ ডাকে নাই ব'লে
বিশ্বের বিরাগে তাই,
ভাবিছ কি একা বসে
কেহ নাই কিছু নাই।"

পণ্ডিত শাস্ত্র নাড়িয়া বলিতেছেন—

"যেতে হবে সকলেরে কেহ নাহি পড়ে রবে
অনিত্য লাগিয়া কেন মিছামিছি ভাব তবে।
করহ সংসার ধর্ম্ম চিরন্তন রীতি মত।
যথ' বয়' সয়' যাহা তাহাতেই হও রত।"

এই সব অযাচিত উপদেশ কর্ণে আসে; কিন্তু কেবল শুনিয়া যাই মাত্র তবু মনের মাঝে মৌন ঝঙ্কার উঠে—

পূত হব্য ল'য়ে আমি, যুড়িয়াছি মহাযাগ।
এসহে বৈরাগ্য মোর অভিনব অনুরাগ।"

৭—ভুলে যাওয়া কথা।

—:•:—

বৈশাখের কোন এক দিবসে, বৈকালে বিজন পঞ্চবটি মূলে, একাকী বসিয়া বসিয়া—বেলাবসানের গতি পরিদর্শন করিতে করিতে মনে পড়িয়া গেল—সত্যি সত্যি বেলা যে ফুরায়।—আর তখন যেন বায়ু-বিতাড়িত বট-পল্লবগুলি, সকৌতুকে মর্ম্মর ধ্বনিতে মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়া কহিয়া দিল:—

"তুমি, কি ছিলে কি হ'লে　　কি হ'তে চলিলে
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে।"

যে কথা মনে পড়ে পড়ে—পড়েনা, যে কথা শুনিতে ভাল লাগে অথচ শোনাইবার লোক পাই না, যে কথা অতি প্রিয় অথচ স্মরণাতীত—শৈশবের সেই ভুলে যাওয়া কথা যেন স্বপনের মত মাঝে মাঝে মনে উদিত হয়। এখন আমি সত্যানন্দ নামে পরিচিত হইতেছি বটে, কিন্তু সত্য সত্যই একদিন

আনন্দরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলাম—তাতে আর সন্দেহ নাই। হয়তো জগতের না আনন্দ হ'তে পারে, কিন্তু যাঁর অঙ্কে শয়ন ক'রে, আমার সদ্য-জাত-কণ্ঠস্বর করুণরবে, আমার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা ক'রেছিল—অবশ্য তাঁর চক্ষে আমি আনন্দ-মূর্ত্তি বই আর তখন কিছু ছিলাম কি?

তখন আমি কেঁদেছিলাম বটে, কিন্তু সেতো অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আর্ত্তনাদ নয়, সে যে সরল প্রাণের সহজ উচ্ছ্বাস। তাই তাহা বিফল হয় নাই, সে সরল প্রার্থনায়, করুণাময়ী জননীর হৃদয় দ্রব হ'য়েছিল, আর সেই দ্রবীভূত পীযূষ নির্ঝররূপে তখন আমার আত্ম-নির্ভরহীন জীবনে অমৃত সিঞ্চন ক'রেছিল। আমি অনায়াসে শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতাম।

তারপর, একটু একটু যখন বড় হ'তে লাগ্‌লেম, একটু একটু নড়্‌তে লাগ্‌লেম—অমনি সে অচল অবস্থার বিকার হ'ল, অমনি তখন একটু একটু চঞ্চল হ'লেম। মার কাছ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে সরে যেতে লাগ্‌লেম। নড়ি বটে, সরি বটে, কিন্তু তখনও দূরে চলে যাই না। খোঁটার রজ্জুবদ্ধ পশুর মত, আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াই। তখন যে পাশে নড়ি না কেন দৃষ্টি থাকে মার পানে। যখনি সে দৃষ্টি হারা হই, তখনি সরল প্রাণে কাঁদিয়া উঠি, আর অমনি অভয়ার ভয়হারিণী মূর্ত্তি নয়ন সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বিযুক্ত প্রাণকে সংযুক্ত করিয়া দেয়।

আবার ঘুমের ঘোরেও যখন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি, নয়ন মেলিয়া ঘোর অন্ধকার দেখিয়া প্রাণ আকুল হয়, তখন অমৃত আস্বাদের জন্য, ভ্রান্ত ও অজ্ঞানতা বশতঃ মাতৃদেহের আশে পাশে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন পদতলে গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ি—হতাশে, ভয়ে ক্লান্তিতে প্রাণ চীৎকার করিয়া উঠে, তখন দয়াময়ী জননীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তিনি জাগিয়া উঠেন, আমায় কোলে তুলিয়া লন্; অভয়ার ভয়হারিণী কোলে আশ্রয় দেন।

সকল শিশুজীবনে এইরূপ হয়; তা আমার জীবনেও এই সহজ ভাব যে আসে নাই, তা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব। এখনো যেখানে যখন জননীর কোলে শিশু দেখি, সেখানেই তখন এ ভাব জাগিয়া উঠে, সেই অতীতের অতি প্রিয় কথা, সেই ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়ে, আর তখনই প্রাণের সেই সহজ ভাব জাগিয়া উঠে ও মর্ম্মের মাঝে ঝঙ্কার করিতে থাকে;—

ও মা! তোমার এ অঙ্কে আসিলাম যবে
হেরি, তুমি আর আমি আছি মা!
আমার আপন বলিতে তখন
আর ভুবনেতে কেহ ছিল না॥
তখন এ নব হৃদয়ের কথা,
যত স্বভাব, অভাব, বেদনা।
যা কিছু সকল নিয়েছে মা তুমি
সদা করিতে হৃদয়ে ধারণা॥
দিতে মুখে মোর অমৃতের স্বাদ
তব, হৃদয় দ্রবিত করুণা।
দেহ মাঝে প্রাণ পাইত সন্ধান—
আহা! এই ত সুধার ঝরণা॥
ঘুমাইলে কেঁদে, উঠিতাম যেগে
তাহা শুনিয়া জাগিতে তুমি মা।
কতনা যতনে কোলে তুলে নিয়ে
মুখ-চুমিয়া করিতে সান্ত্বনা॥

মাগো!

হেরি, তোমার অমল কমল বদনে দিব্য স্বরগ সুষমা।
আমার কোমল হৃদয় আঁধারে উঠিত কি নব গরিমা।
জড় জগতের কোন পরিচয়, আমিত তখন বুঝিনা,
যা দেখালে তুমি যে কথাটি ব'লে, হ'ল তাই ধ্রুব ধারণা।
তব কর ধ'রে আধ আধ স্বরে বলিতাম সেই কথা মা।
শুনি তাহা তুমি হাসিতে অমনি তাহে, ফুটিত কি মহা মহিমা।

কিন্তু, তারপর! তারপর যখন স্বভাব ছুটিয়া নৈসর্গিক ভাবের আশ্রয়ে অঙ্কে অঙ্কে জড় জগতের সহিত মিলিতে মিশিতে শিখিলাম—তখন অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান হইতে লাগিল। মাটির খেলা ঘরকে প্রকৃত ঘরকন্না ভাবিয়া তাহাতেই ম'জে গেলাম। মা, ভুলিয়া সেই খেলাতেই দিন কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু, যখন ধাক্কা খাই, যখনই খেলাঘর ভাঙ্গিয়া যায়, তখন সে নৈসর্গিক কারণগুলির

অভাব হয়। তাই তখন আবার সহজ ভাব জাগে, আবার প্রাণ আকুল হয়,—আবার "মা—মা" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলি। আর, সেই ভুলে যাওয়া স্মৃতি মনে আনিয়া তখন যেন আবেগ ভরে বলি,—

"জড় জগতের দৃঢ় পরিচয় বাড়িল হৃদয়ে যত মা।
যবে কোল ছাড়ি করি ছুটাছুটী ধূলাখেলা ল'য়ে ভুলি মা,
পাছে তুমি এসে ভেঙ্গে দাও খেলা লুকাইয়া তাই খেলি মা।
কিন্তু হায়! যবে ভাঙ্গে খেলাঘর তখনি তোমায় ডাকি মা!
তুমি ছুটে এসে কোলে তুলে নিয়ে ধুলি মুছাইয়ে দাও মা!
আর বল মোরে রুষ্ট বচনে—"হেন কাজ পুনঃ ক'রোনা।"

আবার তখন স্বভাবে আসি, আবার তখন মায়ের ছেলে, মায়ের কোলে বিরাজ করে, আবার তখন আনন্দ ও আনন্দময়ীর সংযোগ হয়। তখন যেন পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া, আধ আধ স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া ধন্য হইতাম,—

"জেনেছি যে মাগো! জননী সন্তানে করুক যতই তাড়না,
কাতরে তনয় করিলে রোদন মার প্রাণ স্থির থাকে না।
আপনি ছুটিয়া আসিয়া আবার যে করে দিয়েছে বেদনা,
সেই করে পুনঃ নয়ন মুছায়ে আদরে করিবে সান্ত্বনা।"

এই ভাবেই সকল শিশুর শৈশব অতিবাহিত হয়, আমারও হইয়াছিল। কিন্তু তারপর! তারপর, এভাব ছাড়া হইয়াই তো গোল। সেই ভুলে যাওয়া কথাগুলির জন্যই ত পরিণত বয়সে প্রাণে যত অবসাদ। নয় কি?

জগতের প্রত্যেক নর নারী, একবার সেই ভুলে যাওয়া কথা, স্মরণ কর দেখি? যদি না মনে পড়ে, তো একবার তোমার শিশুর প্রাণের ভাবটুকু অনুভব কর দেখি? যে তোমার নয়নের আনন্দ হইতে পারে, কিন্তু তার নয়নানন্দকর কি বল দেখি? যে আনন্দদর্শনের ব্যবধানে তার অবসাদ, তার পূর্ণতার জন্যই তার আকুলতা। আহা! সারাটা জীবন যদি শিশুর মত সরল ভাবে থাকিতে পারিতে বা পারিতাম, তাহা হইলে ঐ মধুর শৈশব-স্মৃতিকে আজ "ভুলে যাওয়া কথা" বলিয়া অভিহিত করিতে হইত কি? তাহা হইলে প্রতি হৃদে জননী মূর্ত্তির মধুর বিকাশ দেখিতাম, প্রতি ঘটে সে আনন্দময়ী মূর্ত্তির ছায়া

ধরিতে পারিতাম, নিরানন্দের ভাব দূর হইত। আর পরিণত বয়সে আক্ষেপ করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে হইত না :—

একদিন ছিল আগে, মাঝে মাঝে মনে জাগে,
রঞ্জিত সুবর্ণরাগে এ জীবন যাবে রে
নাহি ছিল কোন ক্লেশ, না ছিল দুঃখের লেশ
তখন কে জানে শেষ হেন দশা হবে রে।
সদা থাকি হাসি মুখে সদা ভাসিতাম সুখে
বাজিতনা কভু বুকে চিন্তার বেদনা রে।
আশার মোহিনী ছায়া মোহের দারুণ মায়া
সম্মুখে প্রসারি কায়া দেখা নাহি দিত রে।
শোক তাপে দগ্ধ নয় সুকোমল এ হৃদয়
কিসে পাপ পুণ্য হয় নাহি বুঝিতাম রে।
নাহি ছিল অপমান নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান
না ছিল অস্থির প্রাণ ইন্দ্রিয়ের বিকারে।
হৃদয় উদ্বেগ শূন্য সদাই আনন্দে পূর্ণ
সংসারের দুঃখ দৈন্য তখন না জানি রে।
না ছিল ধনলালসা, বিলাসিতা বেশভূষা,
অতৃপ্ত সুখের তৃষা চিত্তে নাহি ছিল রে।
সরলতা পূর্ণ মন থাকিত যে অনুক্ষণ
কূটনীতি কদাচন জাগিত না হৃদে রে।
ক্ষুধার উদয় হ'লে ডাকিতাম মা মা ব'লে
জননী যতনে কোলে লইতেন সাদরে।
সে দিন গিয়েছে কবে? জীবনে আর কি হবে
সে আনন্দ সরলতা সে সুখ শৈশব রে?

পরিণত বয়সে, ম্রিয়মান প্রাণে, "ভুলে যাওয়া কথার" ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে এই ভাবই মনে জাগিয়া উঠে। আর আগাগোড়া পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি—সবটাই যেন ভুল হইয়া গিয়াছে। জীবন যে ভাবে যাওয়া

উচিত ছিল, যেন সে সরল ভাব ছাড়িয়া বক্র পথে চলিয়াছে। তাই আবার শিশু হইতে সাধ হয়, আবার নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিব বলিয়া ইচ্ছা হয়, —কিন্তু বেলা যে ফুরায় ? ভুলে যাওয়া কথা—মনে পড়িতে পড়িতেও যে মনে পড়ে না।

উপদেশামৃত।

—:০:—

ওরে মন, অকারণে ভবে এলে।
মাত্র দু'টা দিন, হ'য়ে পরাধীন,
বিফলে কাটায়ে গেলে !!
গুরু না ভজিয়া, কুরসে মজিয়া,
কুকাজ করিলি কত।
কুজনের সঙ্গে, কুকথা প্রসঙ্গে,
সময় করিছ গত ॥
শিয়রে শমন, তবু কিরে মন,
চেতন তোমার নাই !
বাঁধিবে যখন, কোথায় তখন,
রহিবে স্ত্রী, পুত্র, ভাই ॥
'আমার আমার, করিয়া তোমার,
বল কি সুসার আছে !
ক'দিন তোমার, এই অধিকার,
শমন দাঁড়ায়ে পাছে ॥
দু'বাহু তুলিয়া, বদন ভরিয়া
আনন্দে বলহ হরি।
বলিছে বিজয়, নিশ্চয় নিশ্চয়,
জিনিবে শমন অরি ॥

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

ব্রহ্ম হরিদাস।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:•:—

পূর্ব্বোক্তশ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে বলিতেছেন যে, "অন্যের কথাত দূরে থাকুক দ্বাদশ গুণ (ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপ, অদ্বেষ, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি এবং বেদাধ্যয়ন) সম্পন্ন ব্রাহ্মণও যদি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হযেন তাঁহার অপেক্ষা ভগবৎচরণে সমর্পিত দেহ-মন-বুদ্ধি চণ্ডালও সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ ও বরণীয়; যেহেতু তাদৃশ বিপ্রের উক্ত গুণাবলী কেবল মদ-গর্ব্বের কারণ হওয়ায় নিজেকেই পবিত্র করিতে পারেনা, পরন্তু পতিত হযেন; পক্ষান্তরে উক্ত ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি জাতিতে চণ্ডাল হইলেও জগৎকে পবিত্র করেন।

হরিদাস! ইহা আমার মনগড়া উক্তি নহে, সর্ব্ববেদ-বেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দ্দেশ বাক্য। এ সম্বন্ধে আরও পরিস্কার বিধি নিষেধ আমরা স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখেই পাইতেছি—

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্‌॥"

চারিবেদে মহাপণ্ডিত হইলেই যে, সে আমার প্রিয় হইবে তাহা নহে; চণ্ডাল যদি আমার ভক্ত হয় তবে সে-ই আমার প্রিয়। যদি দান করিতে হয় বা প্রতিগ্রহ করিতে হয়, তবে ঐ ভক্ত চণ্ডালের নিকট করিবে; সেই নীচ জাতি ভক্ত আমারই ন্যায় সর্ব্বথা পূজনীয়। সুতরাং যদি শাস্ত্রের আদেশই মানিতে হয়, তবে আমি যাহা করিতেছি তাহাই করিতে হয়। হরিদাস ইহাতে কোন বাদ বিচার নাই।

অদ্বৈতসিংহ, হরিদাসের প্রতিবাদ শুনিলেন না, ব্রাহ্মণ সমাজের ভ্রূকুটীও মানিলেন না, প্রকাশ্যে যবন হরিদাসকে পিতৃশ্রাদ্ধ পাত্র ভোজন করাইলেন।

ফুলিয়া বিখ্যাত কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ। তাঁহারা ইহাতে অপমানিত মনে করিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া আহার না করিয়াই চলিয়া গেলেন। দলে দলে কমিটি বসিয়া গেল, অদ্বৈতচন্দ্রকে সকলে একঘরে করিলেন। অদ্বৈতপ্রভু অচল—অটল হিমাচলের স্থায় রহিলেন বরং হরিদাসকে নানা প্রকার ব্রাহ্মণাপেক্ষা সম্মান করিতে লাগিলেন। হরিদাস দীনতার সহিত আপত্তি করিয়া বলিলেন,—প্রভু, অনেক হইয়াছে এখন রেহাই দেও—

"অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া॥" চৈঃ চঃ।

বামুনে কোন্দল বড় বেশীদিন চলিল না, শেষে সত্যেরই জয় হইল, শাস্ত্র-মর্য্যাদাও সুরক্ষিত হইল। অদ্বৈতপ্রকাশ লেখক বলেন এই সময়ে একটী অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় যাহাতে ফুলিয়া কুলীন ব্রাহ্মণগণের গর্ব্ব খর্ব্ব হয় এবং তাঁহারা শ্রীহরিদাসকে প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত অপ্রাকৃত গুণ সম্পন্ন বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম হরিদাস উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং সকলে তাঁহাকে সম্মান করিয়া একত্রে পান ভোজন করিয়া কৃতার্থ হয়েন। পাঠকের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য এখানে সেই অলৌকিক ঘটনাটী যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম, পাঠকগণ বিচার করিবেন।

ব্রাহ্মণগণের ঐ দলাদলির ২।৪ দিন পরে একদিন ফুলিয়া শান্তিপুরে সমস্ত গৃহে অগ্নি শূন্য হইয়া পড়িল; কাহারও বাড়ীতে আদৌ অগ্নি নাই। গ্রামান্তর হইতে আগুন আনিলেও ঐ গ্রামে পদার্পণ করিবামাত্রই নিবিয়া যায়। ফুলিয়া শান্তিপুরে প্রায় ৮।১০ হাজার লোকের বাস, সকলেরই ঐ অবস্থা, অগ্নি অভাবে পাক শাক্ সব বন্ধ, মহা হৈ চৈ কান্নাকাটী পড়িয়া গেল, গ্রামবাসিরা বহু চেষ্টা করিলেন কিছুতেই অগ্নি প্রকাশ হইল না, তখন সকলে মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এই মহা দৈব-দুর্বিপাকের কোন উপায়ান্তর না পাইয়া সকলে শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতপ্রভুর শরণ লইতে প্রস্তুত হইলেন, ভাবিলেন আমরা প্রতিবাসী বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রকে চিনি নাই, তাঁহার অবমাননা করাতেই দেশের সকলের এই ঘোর বিপত্তি। বিশেষতঃ তিনি সাগ্নিক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে নিশ্চয় অগ্নি মিলিবে। কুলীন-গর্ব্বিত ব্রাহ্মণগণের উচ্চশির নমিত হইল, সকলে গুটি গুটি শান্তিপুরনাথের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

তিনি হাসিয়া বলিলেন "তোমরা সকলেই ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন তোমাদের মুখেই ত আগুন আছে তবে কি জন্য অগ্নি ভিক্ষা করিতেছ", "শেষে সকলে যখন বিশেষ কাতরতার সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন তখন বলিলেন" "চলো ঐ হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে যাই তিনি নিশ্চয় অগ্নি দিবেন।" কাহারও মুখে আর বাঙ্‌-নিস্পত্তি নাই। সকলে সেই কুটীর দ্বারে যাইতেই ঠাকুর হরিদাস সকলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মহা দৈন্য প্রকাশ করিলেন। শেষে শ্রীঅদ্বৈতের আদেশে ব্রাহ্মণগণের অভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। সকলে বুঝিলেন হরিদাস সাক্ষাৎ ব্রহ্ম; সাক্ষাৎ ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমান। সেইদিনই হরিদাসের নাম ব্রহ্ম হরিদাস হইল।

পাঠক এইবার শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ভঙ্গী দেখুন, শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত আছে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীচৈতন্যদেব যখন গৌর হইতে আগত ভক্ত-সঙ্গে মিলিত হইতেছেন, তখন একে একে সকলকে পাইয়া প্রেমালিঙ্গন করিতেছেন; হরিদাসকে না দেখিয়া অতিব্যগ্র হইয়া "কাঁহামেরা হরিদাস, কাঁহামেরা হরিদাস" বলিয়া ফুকারিতে লাগিলেন। কয়েকজন ভক্ত রাজপথ-পার্শ্বে পতিত হরিদাসকে আনিতে ছুটিলেন। হরিদাসকে ধরিয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, হরিদাস আপত্তি করিতেছেন—

"হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার॥" চৈঃ চঃ।

শেষে ভক্তের ভগবান্‌ নিজেই ছুটিয়া আসিয়াছেন বাহু পসারিয়া হরিদাসকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছেন; হরিদাস পিছু হাটিতেছেন আর বলিতেছেন,—

"হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইও মোরে॥"
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥ চৈঃ চঃ।

ইহা কেবল বৈষ্ণবের মুখের দীনতা নহে, বাস্তবিক তখন নীচ জাতির দর্শন স্পর্শনে হিন্দুকে স্নান করিতে হইত। হরিদাস সেই চির প্রচলিত বৈধী-ধর্ম্মের দোহাই দিতেছেন, ধর্ম্ম সংস্থাপক প্রভু কিন্তু সে সব দোহাই মানিতেছেন না, জোর করিয়া প্রেম-বাহু জড়াইয়া বলিতেছেন, আমি অশাস্ত্রীয় কিছু করিতেছি না, যাহা শাস্ত্রের আদেশ তাহাই করিতেছি—

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থে স্নান।"
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন॥
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন। চৈঃ চঃ।

হরিদাস ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব হইলে, "দ্বিজন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন" এই অনর্থক বাক্য শ্রীমুখ হইতে বিগলিত হইত না। ব্রাহ্মণ পুত্র পরে যবনত্ব প্রাপ্ত হওয়া যদি প্রকৃত অবস্থা হইত তাহা হইলে ভাষা ও অন্যরূপে আকারিত হইত।

সুতরাং যবন হরিদাসকে ব্রাহ্মণ করিতে হইলে শ্রীমুখের বাক্য ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকেও আমাদের অগ্রাহ্য করিতে হইবে। শ্রীল বৃন্দাবন দাসও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়ে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সমসাময়িক লোক এবং শ্রীমন্‌নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র শিষ্য। স্বয়ং মহাপ্রভুকে দেখিবার ভাগ্য না হইলেও তাঁহার নিত্য সঙ্গী বহু ভক্ত-মহাজনের কৃপা পাইয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদের উক্তি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। তদনন্তর বাল্যে যাঁহার মুখ মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর পাদাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিয়াছিলেন গৌর-পার্ষদ সেন শিবানন্দের পুত্র সেই পরমানন্দ দাস ওরফে কবি কর্ণপুরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাউক। তিনি গৌর লীলার আদি পণ্ডিত শ্রীল স্বরূপ দামোদরের অনুসরণ করিয়া উড়িয়া ও গৌড়িয়া মহাজনগণের মত গ্রহণে সুবুদ্ধি দ্বারা যে গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে হরিদাস ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ এইরূপে বর্ণন করিতেছেন। ঋচিক নামক মুনির মহাতপা নামে যে পুত্র ছিলেন তিনিই পিতৃশাপে অভিশপ্ত হইয়া যবন হরিদাস হইয়াছেন তবে তাঁহার মধ্যে দৈত্যকুলোদ্ভব প্রহ্লাদের যোগ আছে। আবার শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রিয়সঙ্গী আদি চরিত লেখক মুরারি গুপ্ত উক্ত মতেরই সমাধা করিয়া বলিয়াছেন কোনও মুনি কুমার তুলসী পত্র আহরণ করিয়া প্রক্ষালন না করিয়া পিতাকে দেওয়ায় পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যবন কুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন তিনিই হইতেছেন আমাদের হরিদাস ঠাকুর।

এই সমস্ত প্রামাণিক উক্তি পরিহার করিয়া কোন্ এক বহ্বা তর্ক কবির লিখিত পয়ারকে অবলম্বন করিয়া পাঠক কি হরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ বলিবেন? এক সময়ে গৌড় মণ্ডলে শ্রীচৈতন্য গাথা পাঁচালি প্রবন্ধে গীত হইত; অদ্যাপিও কুষ্টিয়া অঞ্চলে পৌষ পার্ব্বণের সময় বালকেরা এই "নিমাই চরিত" গাইয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। সেই সব পাঁচালি প্রণেতৃগণ লোকরঞ্জন দ্বারা অর্থো-পার্জ্জন লালসায় পালা সুমিষ্ট ও সর্ব্বজন প্রিয় করিতে অনেক যোড়া তাড়া দিয়া নূতন ধরণের মনগড়া গৌর লীলা করিয়া নিয়াছেন; তাহার সরল ভাষা ও ভাবের খাতিরে আমরা যদি প্রামাণিক গ্রন্থকে উপেক্ষা করি তবে মৌলিকত্ব হইতে আমরা অনেক দূরে যাইয়া পড়িব। বৈষ্ণব মহাজনগণের সম্পর্ক সাধু ভক্তের সহিত; লৌকিক সম্বন্ধের আদর তাঁহাদের কাছে ছিল না, তবে বংশে কেহ সাধু ভক্ত থাকিলে তাহার পরিচয়ের পরিচয় দিতেন। হরিদাস ঠাকুরের পিতা মাতার সেরূপ কোন খ্যাতি হইলনা, সেই জন্য তাঁহাদের নামের কোন উল্লেখ আমরা প্রামাণিক গ্রন্থে পাইনা। "কেবল বুঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।" ইহাই পাওয়া যায়। এই বুঢ়ন নাম পরগণার নাম হইতে আসিয়াছে। পরগণে বুঢ়ন বর্ত্তমান সাতক্ষিরা মহকুমা ও খুলনা জেলার মধ্যে। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি তাহারই মধ্যে স্বর্ণ নদী (সোনাই) তীরে ভট্টকনাগাছি গ্রামে আমাদের নামাবতার হরিদাস ঠাকুর মুসলমান বংশে অবতীর্ণ হয়েন। শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হওয়ায় তিনি অনৈক আত্মীয়ের আশ্রয়ে যাইয়া প্রতিপালিত হয়েন, সেই আত্মীয়ের বাস ছিল বেনাপোল, বর্ত্তমান বনগ্রাম ষ্টেশনের সন্নিকট। এইখানে অদ্যাপি হরিদাস ঠাকুরের ভজন টুলির স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহা অদ্যাপিও তুলসী-সেবিত হইয়া ভক্ত-মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। দুষ্ট জমিদার রামচন্দ্র খাঁনের বাড়ীরও ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। এখনও তাহাকে রাজবাড়ী বলে। ইহাও প্রবাদ যে, মুসলমানের ভয়ে রামচন্দ্র খাঁন ভূগর্ভস্থ কোন ঘরে সপরিবারে ধন রত্ন লইয়া পলাইয়া ছিলেন মুসলমানেরা রামচন্দ্রকে না পাইয়া শেষে ঐ ভূগর্ভস্থিত অট্টালিকা প্রবেশের সুরঙ্গ দ্বার রুদ্ধ করিয়াদেন, বৈষ্ণবাপরাধে এইরূপে তিনি সপরিবারে জীয়ন্ত প্রোথিত হইলেন। পুরাতন জমিদারী কাগজে আজও ঐ স্থানের অনেক চিহ্ন লক্ষিত হয়। "হীরানটীর ভিটা" "সদানন্দের বৈষ্ণবোত্তর" প্রভৃতির সহিত হরিদাস

ঠাকুরের লীলা সংমিশ্রিত হইয়া আছে। কিম্বদন্তী যে, সদানন্দ নামে জনৈক ভজনশীল বৈষ্ণবের আখড়ার নিকটে যখন শিশু হরিদাস থাকিতেন তাঁহার-ভজনানুরাগ ও নাম-নিষ্ঠাদর্শনে ও শ্রবণে হরিদাসের প্রথমানুরাগ হয় তৎপরে তাঁহার কৃপায় হরিদাস নাম মন্ত্র লাভ করেন।

কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, যবনকে মহাবৈষ্ণব চুড়ামণি করায় শ্রীচৈতন্য দেবের মহিমা আরও বৃদ্ধি হইবে বলিয়াই শ্রীচৈতন্যভাগবত কার শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁহাকে যবন কুলোদ্ভব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; যশোহর খুলনার ইতিহাস লেখক সতীশ চন্দ্র মিত্রের এই গম্ভীর গবেষণাদ্ভুত যুক্তি দর্শনে আমরা ব্যথিত হইলাম। হরিদাস ঠাকুরকে বৈষ্ণব করিয়া কোন প্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্যদেবের হইতে পারে না। তিনি প্রামাণিক লীলাগ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পঁয়ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, এবং হরিদাসের অকাট্য নাম নিষ্ঠা, অর্থাৎ বাইশ বাজারে প্রহার, এবং ঘোর অগ্নি পরীক্ষা অর্থাৎ বেনাপোলে অবস্থান সময়ে বেশ্যার কামভিক্ষা ও তাহার উদ্ধার ইত্যাদি অমানুষিক কার্য্য যাহা দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে সুরতাং হরিদাসকে ভক্তি পথে আনয়ন করা বা ঐরূপ ঐকান্তিক ভজন শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সংস্রব নাই তবে হরিদাস তাঁহার সমসাময়িক একটী অত্যুজ্জল রত্ন, তাঁহার নিত্য পার্ষদ। বৈষ্ণব মহাজনেরা তাঁহাকে ব্রহ্মার এবং প্রহ্লাদের অবতার বলেন। ব্রহ্মা কৃষ্ণলীলায় অবিশ্বাসী, গোবৎস হরণ করিয়া গোপ বালকরূপী পরব্রহ্মকে পরীক্ষা করিয়া অপরাধী হইয়াছিলেন তাই এই অবতারে নীচ যবন কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে মহাপরাধী অধম বলিয়া দৈন্য করিয়াছেন, হরিদাস মহাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত, নাম প্রচার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য তাহাই শ্রীহরিদাসের দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদিত হইয়াছে। আচার ও প্রচার এই দুই কার্য্যে হরিদাসের দৃষ্টান্ত অতুলনীয়।

আর এককথা, হিন্দু ধর্ম্মটী ব্রাহ্মণ বংশীয়েরা এক চেটিয়া করিয়া রাখিয়া ছিলেন। শাস্ত্র নাই, যুক্তি নাই ছিল কেবল লোকাচার তাহাতেই সমস্ত কার্য্য আবদ্ধ ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতের কল্যাণ জন্য সেই গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিলেন,

তিনি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা দেখাইলেন, উচ্চ আভিজাত্যে বা কুলশীলে প্রকৃত ধর্ম্ম আবদ্ধ নহে বরং তাহাতে নানা বিঘ্ন—

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত জ্ঞানীর বড় অভিমান॥

হরিদাসকে দিয়া সেই চিত্রটী ভাল করিয়া ফলাইয়াছেন। নাম বলে হরিদাস অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন। শিব ব্রহ্মা ইন্দ্রচন্দ্র যে কামদেবের নিকট নির্জ্জিত ও পরাস্ত, যবন হরিদাস নামবলে সেই মহাদর্পিত কামদেব বিজয়ী! শাস্ত্র বিচারে ব্রাহ্মণত্বের উচ্চ অধিকার শ্রাদ্ধ পাত্র লাভ তাহাই হরিদাসের হইয়াছিল। প্রথমে নদীয়ায় ঘরে ঘরে নাম প্রচার কার্য্যে যে দুইজন মহাপুরুষকে আমরা দেখিতে পাই তাহার অন্যতম ঠাকুর হরিদাস, হরিদাসের কঠোর নাম নিষ্ঠা ও বৈরাগ্য দাস রঘুনাথের বৈষ্ণবতার মূল ভিত্তি, যে কুলীন গ্রামীর গুণ গাহিতে অষ্টমুখ হইয়া স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কুলীন গ্রামীর কথা কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম কৃষ্ণ গুণ গায়॥

সেই কুলীন গ্রামীর ঐ ভাগ্য যবন হরিদাস হইতে। শেষে শ্রীপুরুষোত্তমে ঠাকুর হরিদাসের মহিমা চরম সীমা প্রাপ্ত হয়, তাহা হরিদাসের নির্য্যাণ, সাক্ষাৎ নাম সাধনের সিদ্ধিলাভ। স্বয়ং ভগবান্ কল্পতরু হইয়া ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। অন্তিম সময়ে ভক্তের অভীষ্ট মূর্ত্তিতে দর্শন স্পর্শন করাইয়া নিত্যধামে পাঠাইলেন। তারপর ভক্ত-বিরহে ভগবান্ ক্ষেপিয়া গেলেন। সেই ভক্ত দেহ লইয়া অপূর্ব্ব তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বিমানে উঠাইয়া উচ্চ কীর্ত্তন সহ নগর পরিভ্রমণ করিলেন, শেষে যাহা হইল তাহা হিন্দু সমাজে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য সমাজে শুনিতে নাই, সেই হরিদাসের মৃত দেহের চরণোদক পান ;—আঃ সর্ব্বনাশ বেদ বিধি কোথায় রহিল ঐ দেখো সকলেই মহাবিষ্টের ন্যায় সেই চরণোদক পান করিতেছেন আর কৃতার্থ মানিতেছেন। দৈন্যের মূর্ত্তি হরিদাস কখন কাহাকেও শ্রীচরণের নিকট আসিতে দিতেন না তাই আজ সময় পাইয়া সকলে সেই আচার্য্যের ভক্তি রত্ন লুঠিতেছেন। বৈষ্ণবের দেহ যে অপ্রাকৃত, তাহার আবার জীবন্ত মৃত কি? শেষে একেবারে চরম হইল স্বয়ং শ্রীভগবান্ উক্ত হরিদাসকে বালুকা মধ্যে শায়িত করিয়া নিজে শ্রীকরে বালু দিয়া সমাধি দিলেন। সর্ব্বশেষে

নিজে ভিক্ষা করিয়া বিরহ মহোৎসব করিলেন। ঠাকুর হরিদাসের মহিমা স্থাবর জঙ্গমে কোটি কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, সমুদ্র উচ্চ কণ্ঠে হরিদাসের গুণ গাইতেছে, আর সিদ্ধ বকুল অদ্যাপি সেই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু এরূপ মহিমা প্রচার করিবার জন্য মহাপ্রভুকে কোনরূপ যোড়াতাড়া দিবার প্রয়োজন হয় নাই যিনি স্বয়ং সর্ব্বেশ্বর তাঁহার ইচ্ছা মতে সকল সম্পাদিত হইতে পারে তজ্জন্য যোড়াতাড়ার কোন আবশ্যক করেনা। ঠাকুর হরিদাসের আর দুই একটী কথা আমাদের বারান্তরে বলিবার অভিলাষ রহিল এক্ষণে কৃপাময় ভক্ত পাঠকগণের কৃপা।

পথের কাঙ্গাল।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।)

৮—ছায়ার-ছবি।

—:•:—

সন্ধ্যা হইল; জন-কোলাহল থামিল; কর্ম্মক্লান্ত লোকে বিশ্রামার্থ গৃহে ফিরিল। আকাশে চাঁদ উঠিল দক্ষিণের হাওয়া ফুর্ ফুর্ করিয়া বহিতে লাগিল—পথের পাশে, মধু-মালঞ্চে কত বর্ণের কত আকারের, কত না সুগন্ধি পুষ্পরাজী ফুটিয়া উঠিল। হাওয়ায় দেহ শীতল, আলোয় জগৎ উজ্জল ঢল ঢল, সৌরভে প্রাণ যেন ভরপুর হইয়া উঠিল।

নবকিশলয় শোভিত বৃক্ষের কুসুম ফুটিল; মৃদু মারুত-হিল্লোলে সেই সদা প্রস্ফুটিত কুসুম হেলিয়া দুলিয়া না জানি কি এক অভিনব আকর্ষণে পথিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। কেহ ফুলের বাহার দেখিয়া মজিল, কেহ ফুলের বর্ণ, ফুলের রূপ দেখিয়া ভুলিল। কেহবা তাহার সৌন্দর্য্যে তন্ময় হইয়া ভাবিল, আহা! ফুল এ সৌন্দর্য্য কোথায় পাইল? যিনি ফুল সৃজন করিয়াছেন, না জানি তিনি কত সুন্দর, কত মধুর, কত কোমল। তাঁহারই সৃজিত একটি কুসুমে মন যখন এত আকৃষ্ট হয়, তখন না জানি তাঁর দেখা পাইলে কি হয়।

কুসুমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ত্রিবিধ ভাবের ভাবুক ত্রিবিধ কার্য্য করেন। যিনি কেবল ফুলের বাহার দেখিলেন, যতক্ষণ ফুল গাছে রহিল, যতক্ষণ উহার

বাহার রহিল, ততক্ষণই তাঁর দেখা। কিন্তু যখন ফুলটি ঝরিয়া পড়িল, তিনি আর তখন সেখানে রহিলেন না। আবার অন্য কুসুম-কোরকের প্রতি তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হইল। যিনি ফুলের রূপ দেখিয়া ভুলিলেন, প্রখর রবিকরে সে রূপ ম্লান হইলে আর তাঁহার রূপলালসা থাকে না। অন্য কোথায় সে রূপের বিকাশ আছে, তাহাই সে তখন খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু যাহার হৃদয়ে কুসুমের সৌন্দর্য্য বোধ হইয়াছে, সে তাহাতে মজিয়াছে, তাহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে—আর অমনি সকল তৃপ্তির আধার, সকল আনন্দের আকর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের রাতুলচরণে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আনন্দের ভাবতরঙ্গকে আনন্দ-সাগরে লয় করিয়া দেয়। কুসুমের রূপ, সৌন্দর্য্য, বাহার, সৌরভ—এ সকলের সার্থকতা কোথায় তাহা দেখাইয়া দিয়া কুসুমটিকে ধন্য করে, আপনিও ধন্য হয়, আর যাঁহারা আশে পাশে দাঁড়াইয়া ভাবুকের এই ভাবলহরী প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারাও ধন্য হয়েন।

জগতে নরনারীর হৃদয়ও এই কুসুমসদৃশ। একটি আধার অপরটি আধেয়, একটি লতা অপরটি আশ্রয়, একটি কায়া অপরটি ছায়া। নরনারী পরস্পর এমনই ভাবে এমনই একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, দু'টি হৃদয়ের মধ্যে এমনই একটা প্রবাহ সদা প্রবাহিত, তাই একটি কায়া অপরটি ছায়া। কুসুম ফোটে, কুসুম ঝরিয়া যায়। নরনারী জগতে আসে আবার ইহ জগৎ হইতে চলিয়া যায়। কুসুমের যেমন ত্রিবিধ অবস্থা ত্রিবিধ ভাব, মানব-হৃদয়-কুসুমেরও সেইরূপ ত্রিবিধ ভাব তিনটি অবস্থা, মধ্য দিয়া বিকাশিত হয়। সে অবস্থাত্রয়—কাম, রূপ ও প্রেম।

নরনারী পরস্পর যখন পরস্পরের বাহ্যিক বাহারে মোহিত হয়, তখন তাহারা ক্ষণতরে আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাহার ছুটিলে আর সে আকর্ষণ প্রবল থাকে না। যখন পরস্পরে পরস্পরের রূপ দেখিয়া মজে, তখন সে আকর্ষণ আরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় বটে, কিন্তু যেমন সে রূপের জ্যোতিঃ ম্লান হয়, তখন অতৃপ্তি বাড়ে, ক্ষুব্ধ বাসনা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। সৌন্দর্য্যবোধ যাহার হইয়াছে, তাহার কিন্তু এমন হয় না, তাহার চক্ষে প্রেমের অঞ্জন লাগিয়া যায়, তাহার চক্ষে রূপ অরূপের বিচার নাই, আত্ম-উপভোগের বাসনা নাই, আছে কেবল আনন্দ। সৌন্দর্য্যের সাধক আনন্দে আত্মহারা হয়, জগতে যা কিছু দেখে সকলই তাহার আনন্দময় বলিয়া মনে হয়। সে তখন

ভাবে, আনন্দে জগতের উৎপত্তি, আনন্দে জগতের স্থিতি, আর আনন্দেই জগতের লয়।

এই ত্রিবিধ ভাবের ভাবুক নরনারী সংসারে বিরাজ করিতেছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য তৃপ্তি সুখানুসন্ধান। তাই যে যাহাকে আত্ম সুখের উপায় বলিয়া মনে করিতেছে, সে তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছে। ছায়া স্নিগ্ধ, ছায়া শীতল; কিন্তু ততক্ষণই এই স্নিগ্ধতা, এই শীতলতা বোধ হয়, যতক্ষণ ছায়া অচঞ্চল বা স্থির থাকে। যে মুহূর্ত্তে ইহার বিপর্য্যয় ঘটে, তখনই বাসনার খরতাপে অঙ্গ ঝলসিয়া যায়। তখন ছুটিয়া অন্য ছায়ার সন্ধানে যাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল ছায়া দেখিয়া বেড়ায় না, সূর্য্যের গতিবিধির প্রতি যার স্থিরলক্ষ্য আছে, সে কখনও এক পদার্থের ছায়া সরিয়া গেলে, অন্য পদার্থের ছায়া অবলম্বন করিতে যায় না। সূর্য্য যেমন ঘুরিতে থাকে, সেও এই পদার্থের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই যখন যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থাতেই সে পরম শান্তি পায়।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, জীবনও পরিবর্ত্তনশীল। প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার ন্যায় জীবনেরও পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং এ পরিবর্ত্তনশীল জীবনের মধ্যে এমন কিছু আছে কি যাহার ক্ষয় বা ব্যয় হয় না। শাস্ত্র বলেন, আত্মা অবিনশ্বর। দেহ নষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না। এ জগতের সহিত জড়ীয় সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আত্মা নিত্য বস্তু।

তবেই বলিতে হয়, এই নিত্যবস্তু প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে আধেয়রূপে বিরাজমান। নরনারী যে সুখ চায়, যে আনন্দ চায়, তাহা নিত্যবস্তুর উপযোগী বা গ্রাহ্য না হইলে, তাহাতে দুঃখ আসে। নিত্যবস্তু যদি নিত্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধস্থাপন না করিতে পাইল, তাহা হইলে তাহার অতৃপ্তিতো হইবেই। সম-বিষমে কখনও মিলন হয় না। কিন্তু প্রেমের অঞ্জন চক্ষে লাগিলে, সম বিষম সমস্ত পদার্থই তাহার আনন্দের উপযোগী হয়।

সাংসারিক নর-নারীর মিলন বিবাহবেদীতে হইয়া থাকে। সুতরাং বিবাহ বেদী সংসার আশ্রমের তোরণ দ্বারে উচ্চ-চূড় মন্দির সদৃশ। যে কেহ সংসারে প্রবেশ করে তাহাকে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিতে হয়, মঙ্গল-চিহ্নাঙ্কিত বেদীতে বসিয়া পুরুষ [illegible] প্রেম [illegible] করিয়া, তবেই

চরণে অঞ্জলি দিতে হয়। চিত্তকুসুমের সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের পদ-নখচ্ছটায় সুশোভিত করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার বিধি প্রচলিত রহিয়াছে।

এ তত্ত্বকথা, এ ভূমিকার পর, এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সংসারে প্রবেশ-উদ্যত নরনারীর অবস্থা আলোচনার ইহা উপক্রম মাত্র। দেখি,—নিত্য আশেপাশে সংসারের বহু চিত্র দেখি; শুনি,—নিত্য বহু শিক্ষিত যুবকের হৃদয়ের ইতিহাস শুনি; পড়ি,—সময়ে সময়ে উপন্যাসে বর্ণিত নায়ক নায়িকা, যুবক যুবতীর প্রেমের বর্ণনা পড়ি। তাহাতে মনে হয়, উপলব্ধি হয় যে, প্রকৃত প্রেমের অঞ্জন অতি অল্পসংখ্যক সংসারীর চক্ষেই লাগিয়াছে, সৌন্দর্য্যবোধও সকলের সম্যক হয় নাই। তাই সংসারে এত হাহাকার, সুখের মধ্যেও অসুখ, তৃপ্তির মধ্যেও অতৃপ্তি। কেন, সাধের আশায় হতাশ হইতে হয়, কেন এমন হয়, ইহার প্রতিকার কি, শিক্ষিত যুবকের কিরূপে হৃদয়ে সেই ভাব আনয়ন করিতে পারেন, সংসার বন্ধনমুক্ত, প্রবীণের সে সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত নহে কি? যাহারা সংসারাশ্রমে অবস্থান করিয়া সংসারের সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের অভিজ্ঞতার ফলে যুবকদিগের যাহাতে মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয়, সে প্রয়াস প্রকৃত জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।

কাঙ্গালের মনের কথা।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য।)

—:০:—

হায় হায়!! অনিত্য সংসারের কেলেঙ্কারী কোলাহলে পড়িয়া কি সর্ব্বনাশই না করিলাম। যাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম, তাঁহাকে ত খুঁজিলাম না, খুঁজিলাম সারাজীবন ভরিয়া কেবল ছাই আর ভস্ম!!

যিনি আমার সঙ্গের সঙ্গী, জীবন সর্ব্বস্ব, বিপদের বন্ধু, অন্তিমের আশ্রয়, ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসার জল, হায়রে! তাঁহাকে এই অসার সংসারের হট্ট-গোলে কোথায় জানি হারাইয়া ফেলিলাম। আমার আমার, করিয়া আমাকেও আর আমি খুজিয়া পাইতেছি না। কি ভয়ানক দুর্দ্দশা! কি অসম্ভব অধঃপতন!!

একবার ভাবিলাম না,—এই পচা গলা রক্ত মাংসের শরীরটা লইয়া কি করিতে আসিয়াছিলাম, আর কি করিলাম। হায়রে! সুখের আশায় দুঃখের উপকরণ সংগ্রহ করিলাম,—পুড়িয়া মরিতে প্রলয়াগ্নির সৃষ্টি করিলাম।

মৃত্যু যে কিছু কিছু করিয়া আমাকে গ্রাস করিতেছে,—সময় যে আমার ফুরাইয়া যাইতেছে,—আমি যে ধীরে ধীরে মহাশ্মশানের দিকে অগ্রসর হইতেছি সেদিকে তিলমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই !!

মহা-মোহে অন্ধ হইয়া, আমি তো বুঝিতেছি,—"আমি অনন্ত কালের জন্য অমর হইয়া আসিয়াছি।"

হায়! হায় !! মাতৃ-গর্ভান্ধকার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এ কি মায়ার মহান্ধকারে ডুবিয়া পড়িলাম !!—যাহা দেখিবার তাহা দেখিলাম না, যাহা শুনিবার তাহা কিছুই শুনিলাম না,—যে পথে চলিবার, সে পথে আদৌ চলিলাম না। জীবনের এমন অধোগতি একা আমি ভিন্ন আর কে করিয়াছে?

জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া কত শত সহস্রবার যাতায়াত করিয়াও আর আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণের উপায় চিন্তা করিলাম না।

মৃত্যু যে কি একটা বিষয়, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিলাম না। মৃত্যুর ২।১ দণ্ড পূর্ব্বে আমার যে কিরূপ অবস্থা হইবে, কি পরিমাণ যাতনা ভোগ করিতে হইবে, তাহা অনুভবে আনিতেছি না। অথচ দিবারাত্রি কেবল সংসার সংসার করিয়া মরণ কথা ভুলিয়া যাইতেছি।

মরা পুড়িবার সময় এক আধটুকু বিবেক ভাব আসিলেও পরক্ষণেই আর নাই। মানুষ যদি জন্ম-মরণ-দুঃখের বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিত, তবে অবশ্যই দুষ্কর্ম্ম হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিতে পারিত।

এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক স্থূলদেহের ভিতর যে কোন সূত্রাবলম্বনে প্রবিষ্ট হইয়াছি, মনে নাই। এখন বাহির হইতে যে কত অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইবে, তাহা মনে করিলেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে,—অন্তরাত্মা শুখাইয়া যায়,—ভয়ে প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। তথাচ মৃত্যু যন্ত্রণা মনে করিয়া, একটিবার জন্ম মৃত্যুহারী শ্রীহরির চরণ যুগলে শরণ লইতেছি না।

এই স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ যে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বপ্ন-রাজ্যের ন্যায় উড়িয়া যাইবে,—আমি যে একবারে অনন্ত কালের জন্য এই মোহময় সংসার হইতে ফুরাইয়া যাইব, এ কথা একবারও ভাবিনা।

চক্ষের সম্মুখে কত শত সহস্র নর-নারী অহরহঃ চলিয়া যাইতেছে,—আত্মীয় স্বজনের স্নেহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া,—বিষয় সম্পদের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, শোকের আগুন বুকের ভিতর জ্বালাইয়া দিয়া চির বিদায় গ্রহণ করিতেছে;—কত শত সহস্র সোণার সংসার কাল প্রভাবে ক্রমশঃ জন শূন্য অরণ্যে পরিণত হইতেছে,—কত শত সহস্র আনন্দের আবাসে নিরানন্দের তামসী নিশার আবির্ভাব হইতেছে,—কত সুখের সংসারে দুঃখের দাবানল জ্বলিয়া উঠিতেছে,—এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াও আর আমার সংসার সম্বন্ধে অনিত্য বোধ জন্মিল না।

এই পরিণাম বিরস, আপাত মধুর সংসারটাকেই সার মনে করিয়াছি।

হায়রে। কে আমাকে টানিয়া খেঁচিয়া এই পাপতাপ পুর্ণ অনিত্য সংসার হইতে ছাড়াইয়া লইবে? কে আমাকে চির জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ ধামের পথে টানিয়া লইবে?

অহো! বড় দুঃখের কথা মনে পড়িল। আমার পরকালের পরম বন্ধু পরম দেবতা শ্রীগুরু তো কৃপা করিয়া আমাকে পরিত্রাণের পরমোপায় শ্রীশ্রীহরিনাম মন্ত্র দান করিয়াছিলেন,—আত্মোদ্ধারের সুন্দর সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কর্ম্মজালে জড়িত আমি নরাধম সে সকল ভুলিয়া গিয়া আশা কুহকিনীর মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া নরকের পথে চলিয়াছি!!

কৃপাসিন্ধু গুরুদেবের অনাবিল কৃপাস্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে আমার দিকে আসিতেছে বটে,—কিন্তু কুমতির প্ররোচনায় আত্মাভিমানে উন্মত্ত আমি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা।

আমি গুরুকে সাধারণ মানুষের মত মানুষ মনে করিতেছি। অবজ্ঞার চক্ষে অবলোকন করিতেছি। গুরুদেব তাঁহার সংসার হইতে (যে সংসার ভ্রমান্ধ হইয়া আমি আমার মনে করিতেছি) কোন কিছু নিতে চাহিলে, তাহা অযত্ন সুলভ কৃপা মনে না করিয়া, বিরক্তি বোধ করি। কুসঙ্গে কুকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া মনটা আমার একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দীন-দুঃখী অন্ন প্রার্থী হইয়া আমার দুয়ারে দাঁড়াইলে, আমার ক্রোধ উপস্থিত হয়। হায়! হায়!! কতদিনে আমি মানুষ হইব। কতদিনে সর্ব্বজীবে সমান দয়া করিতে শিখিব। আর কত দিনেইবা আমার প্রাণের দেবতা গৌরাঙ্গচাঁদকে চিনিয়া লইব।

সুখ দুঃখের লীলা তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া এই দৃশ্যমান্ জড়জগতের মানুষ কোন্ এক কি অজানা রাজ্যে চলিয়া যায়, তাহা আমরা জানিনা। যাহারা যায় তাহারা আর ফিরিয়া আইসে না। তবে শাস্ত্রকার বলেন,—"যাহারা মুক্ত হইয়া না যায়,—কর্ম্মফল ভোগের জন্য সেই সকল জীব পুনঃ পুনঃ এই মর্ত্ত জগতে ফিরিয়া আইসে।"

পূর্ব্ব স্বরূপে আসেনা বলিয়াই,—আমরা বলিয়া থাকি যে,—"যাহারা এই সংসার হইতে চলিয়া যায়, তাহারা আর ফিরিয়া আসেনা।"

মদন পাল কর্ম্ম ভোগের জন্য মরিয়া পরজন্মে একটি গরু হইল। আমরা কেমন করিয়া বুঝিয়া লইব যে,—এই গরুটি পূর্ব্বজন্মে মদন পাল ছিল! সম্প্রতি কর্ম্ম ভোগের জন্য গরু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমরা বুঝিব যে, মদন পাল যে চলিয়া গিয়াছে,—সে অনন্তকালের জন্য;—মদন আর আসিবে না।

তবে জীবের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে,—এই জীবটি গতবারে অতিশয় পাপ করিয়াছিল, তাই এবার এই মহা দুঃখ সাগরে নিপতিত হইয়াছে। অতএব জীবের দুঃখ দুর্গতি দর্শনে সাধু ব্যক্তিরা সাবধান হইয়া থাকেন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

আমি নরাধম এমনি হতভাগ্য যে,—একটিবারও পারত্রিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারিনা। * স্বার্থ চিন্তায় আমার দয়া ধর্ম্ম সকলি বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি ভোগ বিলাসে উন্মত্ত হইয়া কাণ্ড জ্ঞান শূন্য নরাকারে পশু হইয়াছি। হরিনাম করিয়া পরিণামের পথ পরিষ্কার করিতেছিনা। হায়! হায়! আমার পরকালের পথ যে বিষম কণ্টকাকীর্ণ হইল!!

জানিয়া শুনিয়াও দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় আত্মরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছি না। পাপ জানিয়াও পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেছি না,—পুণ্য কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি তো লেখায় পড়ায়, পরম পণ্ডিত, কথায় বার্ত্তায়, পরম

সাধু,—বেশ ভূষায় ব্রহ্মচারী কিন্তু কার্য্যে যে পশু। এমন আত্মঘাতী,—আত্ম-প্রতারক মানুষের পক্ষে কৃষ্ণ কৃপা লাভ সুদূর পরাহত।

সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম যাহা করিবার, করিয়াছি, এখন আর শোচনা করিয়া ফল নাই। তবে এক সাধু পুরুষের একটি গীতের ভাব শেষ জীবনের অবলম্বন করিয়া রহিলাম মাত্র।

"কলির জীব তরাইতে দয়াল অবতার,
এই সে মাত্র এক ভরসা দেখা যায় আমার।"

হে আমার প্রাণবল্লভ!—হে অনাথশরণ! হে পাপীর বন্ধো! আমি তোমার অধম সন্তান। আমাকে দয়া করিয়া সুপথে পরিচালিত কর।

তুমি পাপী তাপীর পরমোপায়। তুমি কৃপা করিয়া সকলকেই তোমার মধুরতম প্রেমামৃত দানে পরিতৃপ্ত কর। প্রভু গো! তবে কি এই ভক্তি-ভজন হীন মহাপাপীটা তোমার এক বিন্দু প্রেমপীযুষে পরিতৃপ্ত হইবার আশা করিতে পারে না? হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!! প্রাণ গৌর! প্রাণ গৌর!! প্রাণ গৌর!!!

আনন্দ-নগর।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত উকীল।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

—:০:—

না।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এই মর্ত্ত্যভূমিতে প্রকট হইয়াছিলেন তখন তাঁহাকে কে কিরূপ ভাবে সেবা বা আরাধনা করিয়াছিলেন?

প্র।—ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ভালবাসিতেন ও তাঁহার সেবা এবং আরাধনা করিতেন। ভগবানের দাস দাসীগণ তাঁহাকে দাস্য ভাবে সেবা ও আরাধনা করিতেন এবং তাঁহাকে ভালবাসিতেন গোপবালক ও অর্জ্জুন প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় সখাগণ তাঁহাকে বন্ধুভাবে সেবা ও আরাধনা করিতেন এবং ভালবাসিতেন। তাঁহার পিতা মাতা বাৎসল্যভাবে তাঁহাকে সেবা ও

আরাধনা করিতেন এবং ভালবাসিতেন। গোপিনীগণ এবং তাঁহার স্ত্রীগণ তাঁহাকে মধুরভাবে ভালবাসিতেন এবং সেবা ও আরাধনা করিতেন।

না।—এইরূপ সেবা আরাধনা বা ভালবাসার মধ্যে কোন ইতর বিশেষ আছে কি ?

প্র।—ঐ সমস্ত বিবিধ প্রকার সেবা আরাধনা ও ভালবাসার প্রত্যেকটী মহান্ ও জীবের আদর্শ স্বরূপ। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানকে গুরু এবং আপনাদিগকে লঘু বিবেচনা করিতেন তাঁহাদের সেবা আরাধনা ও ভালবাসা ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভগবানের দাস দাসীগণের ভালবাসা ও ভক্তির অন্তর্ভূ'ত। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ অপেক্ষা তাঁহার দাস দাসীগণ ভগবানের কিছু বেশী অন্তরঙ্গ। যদি কোন বস্তু দ্বারা তাঁহাদের ভগবানের সেবাদি করিতে হইত তবে তাহারা অগ্রে সেই বস্তর ভাল মন্দ গুণ আপনাদের উপর পরীক্ষা করিয়া যদি সেই বস্তু ভগবানের প্রীতিকর বা মঙ্গলদায়ক হইবে এইরূপ বুঝিতেন তবেই সেই দ্রব্য দিয়া ভগবানের সেবাদি করিতেন। বস্তুর দোষে যদি কোন মন্দ হয় আমাদের হউক ভগবানের উপর কোনরূপ মন্দের আবির্ভাব তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেন না। ভগবদ্ভক্তগণ যেরূপ শান্ত ভাবে ভগবান্‌কে ভক্তি করিতেন, দাস দাসীগণ কি তদপেক্ষা অধিকতর ভাবে ভগবান্‌কে ভক্তি করিতেন না ? ইহা হইতে বুঝা যায় ভগবদ্ভক্তগণের শান্ত ভক্তি অপেক্ষা এই দাস দাসীগণের ন্যায় দাস্য ভক্তি শ্রেষ্ঠ। ভগবানের সখাগণ ভগবানকে আপনাদের সমশ্রেণীর লোক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বন মধ্যে যখন ক্রীড়া করিতেন কখন ভগবান্ তাহাদের স্কন্ধে উঠিতেন কখন বা তাহারা ভগবানের স্কন্ধে উঠিতেন। কোন ফল পাইলে যদি সেই ফল আস্বাদনে মধুরতা বোধ করিত অমনি সেই খাওয়া ফল ভগবান্‌কে খাইতে দিতেন। ভাল লাগিলে নিজে আর খাইতেন না। দাস দাসীগণ ভগবান্‌কে যেরূপ ভাবে সেবাদি করিতেন ইহাঁরা সেইরূপ ভাবে ভগবান্‌কে সেবা করিতেন। ইহাঁদের ন্যায় দাস দাসীগণের অর্দ্ধ ভুক্ত ফল ভগবান্‌কে দিবার সাধ্য ছিল না ইহাদের সহিত ভগবান্ যেরূপ রহস্য ও আলাপাদি করিতেন সেরূপ রহস্য আলাপাদি ও দাস দাসীগণের বা শান্ত ভক্তগণের উপভোগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল কারণে সখাগণ ভগবানের উহাদের অপেক্ষা অধিকতর অন্তরঙ্গ। শান্ত

ও দাস্যের-ভক্তি সখাগণের মধ্যে ছিল। সখাগণের ভালবাসা ভক্তি বা প্রেম নহে, উহাকে সখ্যভাব মধ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। নন্দ ও যশোদা ভগবানের পিতা মাতা; পিতা মাতার সন্তানের উপর কিরূপ স্নেহ তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সন্তানের পিতা মাতার প্রতি যতই ভালবাসা হউক তাহা স্নেহের এক-দেশেও দাঁড়াইতে সক্ষম নহে। সন্তান পিতা মাতাকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি করে সুতরাং সন্তানের ভালবাসাটী ভক্তির অন্তর্ভূক্ত। পিতা মাতা কখন দাস দাসীর ন্যায় সেবা করিতেছেন, ভালবাসিতেছেন, কখন বন্ধুর ন্যায় সৎপরামর্শ দিতেছেন, আলাপাদি করিতেছেন, সেবা করিতেছেন, আবার কখন না বন্ধু না দাসী এরূপ ভাবে সেবা করিতেছেন, ভাল বাসিতেছেন। সন্তানের মঙ্গল কামনায় পিতা মাতার চিত্ত সদাই আকুলিত। পিতা মাতা সন্তানকে লঘু এবং আপনাদিগকে গুরুজ্ঞান করেন। এই গুরু বিবেচনায় সন্তানের সুখের, মঙ্গলের চেষ্টায় তাঁহাদের মন কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। পিতা মাতা এই জন্য উঁহাদের সকলের অপেক্ষা ভগবানের অধিকতম অন্তরঙ্গ। এই পিতা মাতার ভালবাসার মধ্যে শান্ত দাস্য সখ্য এই ত্রিবিধ ভালবাসা আছে; সুতরাং এই ভালবাসা পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ ভালবাসা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট। এই ভালবাসা ভক্তি নহে, প্রেম নহে, সখ্যভাবও নহে; ইহা বাৎসল্য-ভাব নামে অভিহিত। ভগবানের স্ত্রীগণের মধ্যে ও গোপিকাগণের মধ্যে মধুর-ভাবের ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল। এই মধুর ভাবের ভালবাসার মধ্যে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য চারিটী ভাব ও ভক্তি অন্তর্নিহিত আছে। এই মধুর-ভাব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; একটী স্বকীয়া ও অপরটীর নাম পরকীয়া। বিবাহিত স্ত্রীগণের নায়কের সহিত ভাল-বাসার নাম স্বকীয়া, বিবাহিত স্ত্রীগণ ব্যতীত অপর নারীগণের সহিত নায়কের ভালবাসার নাম পরকীয়া। স্বকীয়া হউক আর পরকীয়া হউক যদি ঐ উভয়-বিধ ভালবাসা কামমূলক হয় তবে তাহা কদাপি প্রেম পদবাচ্য হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার বিবাহিত স্ত্রীগণের ভালবাসা স্বকীয়া। এই স্বকীয়া ভালবাসার মূলে কামনা থাকায় ইহা প্রেমপদ বাচ্য নহে। এ ভালবাসাকে প্রণয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। বিবাহিত স্ত্রীগণ আপন পতিকে ভালবাসিতে বাধ্য এবং তাহাদের সন্তানের বাসনা ছিল। গোপিনীগণ

শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতে কোনরূপে বাধ্য ছিলেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা ছিলেন না। ইহাদের ভালবাসা স্বপ্রকাশ, সু-নির্ম্মল এবং কোনরূপ কামনা বিরহিত, এইরূপ ভালবাসাই প্রেমপদ বাচ্য। গোপিকাগণের মধ্যে শ্রীরাধার তুল্য প্রেম কাহারও ছিল না। যমুনা পুলিনের উপর নির্জ্জন স্থানে রাস-লীলা হইয়াছিল সেখানে একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ছিলেন অপর সকলে গোপিকা। এই গোপিকা সকল পরম সুন্দরী ছিলেন। ভগবানের সহিত ইহাঁদের কাম গন্ধ-হীন প্রেম দেখিয়া কামদেব বিমোহিত হইয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহাঁদের লীলা-ব্যাপার দেখিয়া দেবতাগণেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল কিন্তু গোপিকাগণ নিষ্কাম ভাবে ভগবানকে ভালবাসিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। এ প্রেমে মাধুর্য্য এত অধিক পরিমাণে আছে যে, যিনি সে মাধুর্য্য পান করিতে পারিয়াছেন কামের মাধুর্য্য তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ। শ্রীরাধার প্রেমে ভগবান্ বিমোহিত হইতেন তাঁহার শ্রীঅঙ্গের গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া যাইত। শ্রীরাধা পরনারী; শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার দেখা সচরাচর ঘটিত না; শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীরাধার বিরহ হইত। বিরহে বাহ্যিক ক্লেশ হইত কিন্তু ভগবানের চিন্তায় অন্তর পরিপূর্ণ থাকায় শ্রীরাধা অন্তরে মাধুর্য্যের আস্বাদ উপভোগ করিতে পারিতেন। আবার এই শ্রীরাধার প্রেম মহাভাবে পরিণত হইলে তাঁহার অন্তরে বাহিরে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান। যেখানে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইত সেইখানেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ পাইতেন। এই মহাভাবময়ী শ্রীরাধার নিকট আর বিরহ নাই। সচ্চিদানন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শ্রীরাধার হৃদয়-বৃন্দাবনে তিনি নিত্য বাস করেন। শ্রীরাধা ও তিনি উভয়ে উভয়ের মধ্যে বিরাজিত। উভয়ে এক।

না।—এ বিষয় সম্যক্ বুঝিতে না পারিলেও কতক বুঝিলাম; এ বিষয়ে পরে আলোচনা হইবে এক্ষণে আমাকে অন্যান্য বিষয়গুলি বুঝাইয়া বলুন। ভবনগরে কদাচিৎ কোন কোন লোক নাম সঙ্কীর্ত্তন করিত, এক্ষণে উহা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে; ঐ নাম সঙ্কীর্ত্তনে কি জীবের কোন উপকারিতা আছে? এ বিষয়ে একটু উপদেশ দিন।

প্র।—ওঃ খুব আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবানের নাম ও ভগবানে কোন প্রভেদ নাই; নিরন্তর ভগবানের নাম লইলে ও গুণ-কীর্ত্তন করিলে ভগবানে চিত্ত সমাসক্ত হয়। ভগবানে চিত্ত আসক্ত হইলেই জীবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের উৎস গঠিত হয়। সংকীর্ত্তনে গায়কের মন সুর, তাল এবং গানের ভাবে নিয়োজিত থাকে, যদি গায়কের মন সেই সময় অন্যদিকে থাকে তাহা হইলে সুর, তাল ও গানের ভাব ঠিক থাকে না। ভগবানের চিন্তা করিতে বসিলে অমনি কত চিন্তা মনোমধ্যে আসিয়া পড়ে। তখন চিত্ত স্থির করিবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু সংকীর্ত্তন করিলে, ভগবানের গুণ বা লীলা গানে ব্যাপৃত হইলে অতি সহজেই চিত্ত স্থির হইয়া থাকে ইহার আরও একটী গুণ এই যে, বহু বহু লোকে একত্রে এইরূপে ভগবদ্ভজন করিতে সমর্থ হয়।

না। আমাদের যখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য কি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা আবশ্যক?

প্র। প্রার্থনা করিলে বুঝিতে হইবে যে, তোমার যে বিপদ হইয়াছে ভগবান্ তাহা জানেন না, বা তাহা ঘুচাইবার জন্য কোনরূপ মনোযোগ করিতেছেন না; প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক পদার্থের, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছে, হইবে বা হইতেছে সকল জ্ঞান তাঁহার আছে। তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য সদাই কার্য্য করিতেছেন। জীবের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা তিনি যেরূপ বুঝেন এমন আর কেহ বুঝেনা তুমি যাহাতে তোমার অমঙ্গল বুঝিতেছ ভগবান্ হয়তো তাহাই কল্যাণ-প্রদ বলিয়া স্থির করিতেছেন। প্রার্থনা করিলে ভগবদ্বিশ্বাসের কি কিছু খর্ব্বতা সাধন হয় না? যদি ভগবানের উপর জীবের আন্তরিক প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকে যে, যাহাতে আমার মঙ্গল হইবে ভগবান্ তাহা নিশ্চয়ই করিবেন তাহা হইলে বিপদে জীবের ব্যতিবস্ত হইতে হয় না, প্রার্থনারও প্রয়োজন হয় না। ভগবানের উপর জীবের বিশ্বাস যত গাঢ় হইবে ততই জীবের বিপদে মুহ্যমান হইবা মাত্রা কমিয়া যাইবে, ততই প্রার্থনার আবশ্যকতা কম বলিয়া ধারণা হইবে। কিন্তু জীব এই সংসাররূপ মায়ার চক্রে পড়িয়া যেরূপ ব্যতিব্যস্ত তাহাতে ঐরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস সকল জীবের ভাগ্যে ঘটে না। সুতরাং জীব বিপদে পড়িলে ভগবানের নিকট

বিপদ-উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। তিনি দয়াময়, তিনি জীবের ঐকান্তিক প্রার্থনায় কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহার প্রার্থনা মত কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি জীবের ঐ সকাম প্রার্থনায় অপরাধ লন না। কিন্তু তাঁহার উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা থাকিলে তিনি যেভাবে যেরূপে জীবের মঙ্গল বিধান করেন, তোমার প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইলে সে ভাবের ও সে রূপের অন্যথাচরণ কি হয় না? যদি জীব ফলাভিসন্ধান না করিয়া নিষ্কাম ভাবে জগতে কার্য্য করিতে থাকে তাহা হইলে সেই করুণাময় পরমেশ্বরের বিচারিত মঙ্গল সে-ই ভোগ করিতে সমর্থ হয়। ভগবানের নিকট জীব থাকিলে জীব আলোকের মধ্যে থাকে, আপন গন্তব্য পথ সুস্পষ্ট দেখিতে পায় কিন্তু জীব যখন ভগবানের কর্তৃত্ব স্বীকার করে না বা তাঁহাকে বিস্মৃত হয় তখন অহং-জ্ঞানাক্রান্ত হইয়া আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করে ও ভগবদালোক বিরহিত অন্ধকার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খায়। প্রকৃত পথ দেখিতে না পাইয়া বিপদে পতিত হয়। তখন সেই আলোকময়ের নিকট প্রার্থনা করে ও আলোকে পথ দেখিতে পায়, উদ্ধার হয় কিন্তু অনতিবিলম্বে আবার ভুলিয়া বিপদে পতিত হয়। এইরূপই সাংসারিক জীবের অবস্থা।

ক্রমশঃ।

ভক্ত।

(লেখক—শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।)

——:০:——

পদ্ম-পুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত হইয়াছে :—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ, যে সাধক গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়াও তদীয় ভক্তকে অবহেলা করেন, তিনি দাম্ভিক, তিনি কখনও ভাগবত পদবাচ্য নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তিতে স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—

"মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা।"

আমার পূজা হইতেও আমার ভক্ত পূজা বড়। অর্থাৎ, ভক্তের পূজা ভগবৎপূজা হইতেও গৌরবান্বিত। ভক্তের এত আদর কেন? জগতের দিক হইতে দেখিলে বাস্তবিকই ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব অধিকতর রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ভক্তদ্বার দিয়াই শ্রীভগবান জীবের নিকট প্রকাশিত হ'ন। ভক্ত না থাকিলে আজ ভগবানকে কেহই জানিতে পারিত না। শ্রীভগবানের যাবতীয় লীলা বহু পূর্ব্বেই বিস্মৃতির অতলতলে লুক্কায়িত হইয়া থাকিত। শ্রীভগবান যদি তাঁহার স্বপ্রকাশত্ব ভক্তদ্বারে ফুটাইয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে আমাদের মত বদ্ধজীব কখনও শ্রীভগবদনুভূতি স্মরণ ধ্যান ধারণাদি করিতে পারিত না। আমরা শ্রীভগবানের যেরূপ চিন্তা করি, উহা ভক্তেরই দৃষ্ট ছবি, তিনি আমাদেরই জন্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার যে লীলাগুণ স্মরণ করি, উহা ভক্তেরই হৃদয়ের গান, প্রেমের ভাষায় গ্রথিত, একদিন তিনি আপনার ভাবে আপনি গাহিয়া জগৎকে শুনাইয়া গিয়াছেন! আমাদের চক্ষু দিয়া দেখিলে, সত্য সত্যই বলিতে হয়—

"ভক্ত ব্যতীত ভগবান নাই।"

এই ভক্তকে কিন্তু চিনিয়া লওয়া নিতান্তই দুঃসাধ্য। তাঁহারা এমন মহামূল্য অথবা মূল্যাতীত রত্ন হইয়াও সাধারণ দৃষ্টির গৌরব-বেষ্টিত পদে থাকেন না। অতি নীরব নিবিড় আঁধারের মাঝে আপনার জীবন যাত্রার উদ্দেশ্যটুকু সাধন করিয়া চলিয়া যান। তাহার মধ্যেই তাঁহারা জগতকে এত বড় শিক্ষা দিয়া যান যে, সহস্র উপদেশ, সহস্র সহস্র প্রবন্ধ বা পুস্তক, অথবা বহু সহস্র উচ্চনাদে বক্তৃতা তাহার একটী ক্ষুদ্র অংশও সম্পাদন করিতে পারে কি না সন্দেহ। ভক্ত তাঁহার সেই নীরবাতিবাহিত জীবন টুকুতে অনেক চিত্ত নীরবে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া যান যে, সে প্রীতির বন্ধন সারা জীবনেও কেহ খুলিতে চাহে না, খুলিতে পারেও না। ভক্তের আত্মীয়তার তুলনা জগতে মিলেনা। জয় ভক্ত, ভগবান।

ভক্তকে চিনিবার মত চক্ষুই সকলের নাই। তিনি যদি কৃপা পরবশ হইয়া নিজে দর্শন না দেন, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহাকে ধরিতে পারে। তবে

ভক্ত মুখে কীর্ত্তিত ভক্তগুণাবলীই আমাদের নিকট ভক্তের পরিচয়ের নিদর্শন স্বরূপ। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভক্তের পরিচয়ে বলিয়াছেন,—

কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্য সারসম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥

সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈক শরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিত ষড়্‌গুণ॥

মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥—

শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী তৎকৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তের নিম্নোক্ত ঊনত্রিংশটী গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্যবাক্য, প্রিয়ম্বদ (যিনি অপরাধী জনের প্রতিও সান্ত্বনা বাক্য বলেন), বাবদূক (বাগ্মী), সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ (শিল্পবিলাস নিপুণ-সুরসিক), চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকালসুপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষু, শুচি (পাবন ও শুদ্ধ), বশী (জিতেন্দ্রিয়), স্থির, দান্ত (সহিষ্ণু), ক্ষমাশীল, গম্ভীর (যাঁহার অভিপ্রায় দুর্ব্বোধ), ধৃতিমান (ধৈর্য্য শীল), সম (পক্ষপাত শূন্য), বদান্য (দানবীর), ধার্ম্মিক (যিনি ধর্ম্ম যাজন করান), শূর (উৎসাহী এবং বিচক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বী), করুণ (পরদুঃখকাতর), মান্যমানকৃৎ (গুরু ব্রাহ্মণবৃদ্ধাদি পূজক), দক্ষিণ (সুশীল ও কোমল চরিত্র), বিনয়ী এবং হ্রীমান (লজ্জাশীল)।

"যে সত্য বাক্য ইত্যাদ্যা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ।
প্রোক্তা কৃষ্ণেঽস্য ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ॥"

আজকাল কিন্তু আমাদের মত শাস্ত্রানভিজ্ঞ অথচ শাস্ত্রজ্ঞখ্যাতিপ্রিয় লোকের নিকট ভক্তের চতুরতা, ভক্তের বাগ্মীতা, ভক্তের বিলাস নিপুণতা ও রসিকতা, ভক্তের উৎসাহপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বীতা অথবা ভক্তের লজ্জাশীলতা প্রভৃতি তাঁহাদের ভক্তিমত্তার প্রতিকূল এবং হেয় নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার কারণ, আমরা আপনা আপনি বড় হইতে চাহি, কিন্তু পারিনা, অথচ বড় হইবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিনা এই জন্য চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী উন্নত জনগণের উন্নতিকে খর্ব্ব প্রতীয়মান করিবার দুরাশায় এই প্রকার ঘৃণ্য বিচার নীতি অবলম্বন করিয়া থাকি। তাহার ফলে করুণার প্রতিমূর্ত্তি ভক্তবৃন্দ সংসারে সুলভ হইয়াও আমাদের নিকট দুর্লভ হইয়া থাকেন।

সংসারে ভক্ত যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের মত নীরস, যুক্তি মাত্র অবলম্বনকারী জনের নিকট এতদিন শ্রীভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবিশ্বাসের গভীর অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া থাকিত। আমাদের চক্ষু অভিমান রোগাক্রান্ত হইয়া আছে, এ চক্ষে শ্রীভগবানকে চেনা যায় না। তাই মহাজনগণ আমাদের মত দৃষ্টিহীন রোগাক্রান্ত লোকের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন—

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন।"

বৈষ্ণব সেবন বা ভক্ত সেবাই উক্ত রোগ প্রশমনের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥—

এই যে ভক্তির ছয়টি গুণ, ইহা ভক্তে নিত্য প্রকাশমান। ভক্ত জীবের পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা জনিত ক্লেশ নষ্ট করেন, তাহাদের প্রীতি, অনুরাগ সদ্গুণ ও সুখ বিধান করিয়া থাকেন, এবং সেবানন্দ আস্বাদন করাইয়া তাহাদের মোক্ষতৃষ্ণা নাশ করিয়া দেন। ভক্ত সুদুর্ল্লভ ধন, পূর্ণ পরানন্দময় এবং নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ যুক্ত।

ভক্ত, এই সংসারের কেহ না হইয়াও সংসারের সর্ব্বস্ব ধন রূপে সংসারের মধ্যেই বিচরণ করিয়া থাকেন। সুখাশায় সারাজগত ভ্রমণ করিয়াও নিরাশ হৃদয়ে যখন শ্রান্তজীব জগতের দুঃখময় সুখের মোহময় মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিতে যায়, তখন একমাত্র ভক্তই বাহু প্রসারিত করিয়া আপনার প্রেমময় বক্ষে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্বনা দান করেন। সংসারে প্রকৃত সুখ একমাত্র ভক্তের ভাণ্ডারেই আছে। সুতরাং সংসারে ভক্তই প্রকৃত ধনী। ভক্তের হৃদয় এত প্রসারিত যে, সংসারের কোন নিয়মে তাহার পরিসরের পরিমাণ হয় না। ক্ষুদ্র বৃহৎ, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, অধিকারী অনধিকারী, ভাল মন্দ, এ সকলের কোন বিচার ভক্তের প্রেমময় বক্ষে স্থান পায় না। এই জন্য ভক্ত হৃদয়কেই শ্রীভগবানের বিশ্রাম মন্দির বলা হইয়া থাকে। আমরা আমাদের হৃদয়ের লঘুত্ব দিয়া ভক্তহৃদয়ের গুরুত্বের পরিমাণ করিতে যাইলে নিশ্চয়ই বিফল হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইব, এবং তাহাতেও যদি আমরা আমাদের অজ্ঞতা বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে দুরাশা-তাড়িত দ্রাক্ষা-লুব্ধ শৃগালের ন্যায় ভক্তহৃদয়ের নিন্দাবাদে আপনার ব্যথিত অন্তরের ব্যথা দূর

করিতে প্রয়াস পাইব। সাধারণে এই ভাবেই ভক্ত পরীক্ষিত এবং আদৃত হইয়াও, জীবের প্রতি তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাবশতঃ তাঁহারা লাঞ্ছনার বিনিময়ে আনন্দ দান করিতে এই সংসারে বিচরণ করেন। ভাষায় এমন শব্দ খুঁজিয়া পাই না, যদ্বারা জীবের এমন বন্ধু করুণাময় ভক্তের মহিমা সম্যক প্রকাশিত হইতে পারে।

ভক্তই ভক্তের মহিমা বুঝেন, আমরা বুঝিনা। আর, ভক্ত মহিমা জগজ্জনকে বুঝাইবার জন্য ধড়া, চূড়া, হাসি, বাঁশী বৃন্দাবনের বন মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া এই বঙ্গের কেন্দ্র ভূমে সুরধুনীকূলে দীনভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ছুটিয়া আসিতে হইয়াছিল। আজিও সে ক্রন্দনের সুর দেশের পল্লীতে পল্লীতে ছুটিতেছে! কিন্তু হায়, তবু আমরা ভক্তকে পূজা করিতে শিখিলাম না! যে যত বড়, সে তত ছোট, অভিমান তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তই হইয়া থাকে। তাই ভক্ত আজ জীবের দ্বারস্থ এবং শ্রীভগবান ভক্তের দ্বারস্থ। কিন্তু তৌল করিবার কালে যে বস্তু নিম্নগামী হয় সে-ই গুরুতর, এবং যে উপরে উঠে সে-ই লঘুতর, এই নীতি ক্রমে জগতের নিকট ভক্তই গুরু, ভক্তেরই গুরুত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

আবার, শ্রীভগবান আনন্দময় হইয়াও, তাঁহার সকল আনন্দের অধিকারী ভক্তকেই করিয়াছেন, তাই তিনি ভক্তাধীন। স্বয়ং ভগবান রূপে রাসরসাস্বাদন করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই—বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তাই তাঁহাকে ভক্ত সাজিতে হইয়াছিল—তৃপ্তি লাভের জন্য, বাঞ্ছাপূর্ত্তির জন্য, তাঁহাকেও ভক্তের অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। আপনাপেক্ষাও ভক্তের গুরুত্ব বাড়াইয়াছিলেন। তাই বলিতে হয়, ভক্তকে বাদ দিলে, ভগবান অপূর্ণ। কিন্তু ভক্ত তাঁহাকে আপনার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া, আমাদের চক্ষে, আপনা আপনি নিত্য পূর্ণ!

ভক্ত! বিশ্ববন্ধু ভক্ত! আমরা তোমার পূজা জানিনা বটে, কিন্তু তুমি যে অহৈতুক কৃপাসিন্ধু! তাই ভরসা আছে, আমরা তোমার শরণ গ্রহণ না করিলেও, তুমি নিজগুণে আমাদিগকে তোমার চরণতলে আশ্রয় দিয়া আমাদের জীবন সার্থক করিয়া দিবে। ভক্তি তোমাদের প্রাণ, এই ভক্তিহীনকে —এই জীবন্মৃতকে তোমাদের কৃপাকণা দানে সঞ্জীবিত করিয়া দাও! ভক্ত মহিমা অনন্ত, ভক্তগুণ-গাথার শেষ নাই। তথাপি বারান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। জয় ভক্তের জয়!